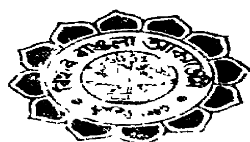
বাঙলা ও বাঙালী

বাঙলা ও বাঙালী

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



বিহার বাঙলা আকাডেমি
বুদ্ধ মার্গ, পাটনা ৮০০ ০০১

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৯০

প্রকাশক
নির্দেশক, বিহার বাঙলা আকাডেমি
বুদ্ধ মার্গ, পাটনা ৮০০ ০০১, বিহার

প্রচ্ছদ
দীপক গোস্বামী

পরিবেশক
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩

মুদ্রক
শ্যামলকুমার সাউ
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা ৬

বিহারে বাঙলা ভাষার
সেবকদের উদ্দেশে
নিবেদিত

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকার বিহারের অধিবাসী ও সর্বভারতীয় কর্মী হওয়ায়, তাঁর রচনায় বাঙালীয়ানার যে বৃহত্তর রূপটি ফুটে উঠেছে, তা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়েই এই সংকলনের প্রকাশ। এই গ্রন্থ প্রকাশকালে অন্য একটি গ্রন্থের জন্য তাঁকে 'আনন্দ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের রচনাগুলিতেও প্রশংসনীয় যোগ্যতার প্রতিফলন রয়েছে বলে সেগুলিকে আমরা সানন্দে পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ, গান্ধীজীর গঠনকর্ম, সত্যাগ্রহের কথা, বিপ্লবী বন্ধুর প্রতি, জিন্না, পাকিস্তান : নতুন ভাবনা।

অনুবাদ-গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধীর : আমার ধ্যানের ভারত, ছাত্রদের প্রতি, সত্যাগ্রহ, আমার ধর্ম, সংযম বনাম স্বেচ্ছাচার, পল্লী পুনর্গঠন, শিক্ষা, আমার জীবনকাহিনী।

আলবার্ট আইনস্টাইনের : জীবন-জিজ্ঞাসা

আলডুস হাকসলের : বিজ্ঞান স্বাধীনতা ও শান্তি, এপ অ্যাণ্ড এসেন্স।

কিশোরলাল মশরুওয়ালার : গান্ধী ও মার্কস।

সম্পাদিত গ্রন্থ

মহাত্মা গান্ধীর : MY NON-VIOLENCE

আলবার্ট আইনস্টাইনের : MY VIEWS

গান্ধী পরিক্রমা ইত্যাদি।

অবতরণিকা

বিহারে আমার জন্ম। আর কর্মসূত্রে একরকম সর্বভারতীয়। তবু যে-কোন আত্মসচেতন বাঙালীর মত বাঙলা ও বাঙালীর সঙ্গে সম্বন্ধিত প্রশ্নসমূহ আযৌবন আমাকেও ভাবিত করেছে। বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার এই প্রবন্ধগুলি বাঙলা ও বাঙালীদের নিয়ে আমার সেই চিন্তা-ভাবনার ফসল। স্বভাবতই সেজন্য প্রবন্ধগুলিতে সমসাময়িকতার ছাপ আছে। পরিসংখ্যান কোন কোন স্থলে সর্বাধুনিক নয়। এসবের সংস্কার করতে গেলে অনেকগুলি প্রবন্ধকেই নূতন করে লিখতে হত। সেই অসম্ভব কার্যে ব্রতী না হয়ে যেখানে নিতান্ত আবশ্যক সেখানে কিছু টীকা-ভাষ্য যোগ করা হয়েছে একালের পাঠকদের সুবিধার জন্য।

এরপর বাঙলা প্রসঙ্গ। বাল্যকালে শুনেছি বঙ্গভূমি বলতে আসাম ও বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে বিশাল ভূখণ্ড এর আওতায় ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ হবার নামে বহু বঙ্গভাষী এলাকাকে বাঙলার বাইরে রেখে দেওয়া হল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বঙ্গভঙ্গ তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। আজ তাই স্বভাবতই প্রশ্ন—বঙ্গভূমির আয়তন কতটুকু? কারণ, কারও কারও মতে এর উপরই তার বাসিন্দা বাঙালীর অভিধা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক সত্য হলেও খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ অথবা তার বাসিন্দাদের পরিধিতেই আমার আলোচনা-বৃত্তকে সীমিত রাখা উচিত মনে করিনি। আমার বাঙলা ও বাঙালী আজকের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে—যদি আধ্যাত্মিক শব্দটা এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি—তার আধ্যাত্মিক সত্তাকে স্পর্শ করে। এতটা স্বাধীনতা নেওয়া উচিত হয়েছে কিনা তা সুধী পাঠক বিচার করবেন।

অতঃপর আনন্দ-কৃত্য। আমার পরমাত্মীয় বিহারের বাঙলা আকাডেমির ডঃ গুরুচরণ সামন্ত মহাশয় উৎসাহী হয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় এ গ্রন্থ প্রকাশ না করলে রচনাগুলি হয়ত সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই চিরসমাধি লাভ করত। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রকাশের যাবতীয় কৃতিত্ব তাঁর ও বিহারের বাঙলা আকাডেমির। দীর্ঘকালের প্রীতিভাজন বন্ধু এবং বর্তমানে আত্মীয় প্রখ্যাত

প্রকাশন প্রতিষ্ঠান 'মিত্র ও ঘোষ'-এর শ্রীযুক্ত সবিতেন্দ্রনাথ রায় তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের শতবিধ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বই-এর প্রুফ দেখে দিয়ে এবং প্রয়োজনে পরিমার্জন করে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। এঁদের কারও সঙ্গেই আমার ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাবার মত লৌকিকতার সম্পর্ক নয় বলে ঋণ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। পরম শ্রদ্ধাভাজন অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর মুক্ত মন ও মননশীলতার জন্য যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই কেবল আমার আদর্শ নন, দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার এই রচনা-সংকলনের ভূমিকা লিখে তিনি শুধু এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমাকেও গৌরবান্বিত করেছেন। এই অবকাশে আবার তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

ইতিহাস-চক্রের অমোঘ আবর্তনে যুগে যুগে বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন ঘটেছে ঠিকই। তবু আমার বিশ্বাস, সব পরিবর্তন উত্থান-পতনের উর্ধ্বে বাঙলা ও বাঙালীর একটা শাশ্বত রূপ আছে। সমালোচনার আশঙ্কা থাকলেও সবিনয়ে নিবেদন করি—এ রূপ দেশ-কাল নিরপেক্ষ। বাঙলা ও বাঙালীর সেই চিরায়ত রূপের অন্ততঃ এক ঝলক উপলব্ধি করতে এবং তাকে তার ইতিহাসনির্দিষ্ট পরিণতিতে নিয়ে যেতে আজকের বাঙালীকে এ রচনাগুলি যদি কিছুমাত্র সাহায্য করে, তবে আমার লেখনী সার্থক হয়েছে মনে করব।

চারু-নীড়, কামডহরি
গড়িয়া, কলিকাতা ৭০০ ০৮৪

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

ছয় শতক ধরে ফারসী ছিল বাংলাদেশের রাজভাষা। তার বদলে ইংরেজী রাজভাষা হওয়ায় ও আরো আগে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় বাঙালী মুসলমানরা রাজকর্মে পেছিয়ে পড়ে, বাঙালী হিন্দুরা এগিয়ে যায়। অপর পক্ষে বাঙালী মুসলমানরা সংখ্যাগুরু আর বাঙালী হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এক শতাব্দীর ভিতরেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা ভারবৈষম্য দেখা দেয়। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো উপায়ই কারো জানা ছিল না। এমন সময় ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন প্রস্তাব করেন বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হোক।

কলকাতার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রধানরা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান মিলে বাঙালীরা 'নেশন' হিসাবে এক ও অবিভাজ্য। বাসভূমিকে দ্বিধাবিভক্ত করলে দেশকেও দ্বিখণ্ডিত করা হয়। সেটা অন্যায়। ঢাকার নবাব পরিবারের মধ্যেও দ্বিমত দেখা যায়। ঢাকা অঞ্চলের কয়েকজন মুসলিম নেতা একটি ইস্তাহারে লেখেন, মুসলমানদের যদিও কতকগুলি স্বতন্ত্র দাবি আছে তা হলেও তারা স্বতন্ত্র নেশন নয়, হিন্দু মুসলমান মিলে একই নেশন। তখনো মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহু অবাঙালী মুসলমান ঢাকার নবাববাড়ীতে বসে শিক্ষা সম্মেলনের পরে রাতারাতি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম লীগের অন্যতম দাবি হয় আইনসভার জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন। দাবিটা সারা ভারতের মুসলমানদের তরফ থেকে। বাঙালী মুসলমানদের তরফ থেকে নয়। কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে তাদেরও সেটা মেনে নিতে হয়।

স্বতন্ত্র নির্বাচনের বীজ থেকে জন্মায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি। সেটার মূলেও অবাঙালী মুসলমান। বাঙালী মুসলমানরা পাকিস্তানের কথা ভাবতেই পারেনি। তবে তাদের অগ্রগণ্য নেতা ফজলুল হক সাহেব লাহোরে গিয়ে অবাঙালী মুসলমানদের পাল্লায় পড়েন। তাঁকে বোঝানো হয় যে ইংরেজরা চলে গেলে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিকে নিয়ে গোটা কয়েক স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হবে, তাদের

একটি বাংলাদেশ। লাহোরে পাকিস্তান নামকরণ হয়নি। হক সাহেব যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি একটিমাত্র পাকিস্তানের জন্যে নয়। ভাষায় বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জিন্না প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতাদের চাতুরীতে বহুবচন হয়ে দাঁড়ায় একবচন। পাকিস্তান হলে একটাই হবে, সারা বাংলাদেশ তার অঙ্গ।

হিন্দুদের এতে তীব্র আপত্তি। আধিপত্য করবে তো অবাঙালী মুসলমান। পাকিস্তান না হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বাংলাদেশ হলে শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতারা সায় দিতেন। তবে তাঁদের প্রধান শর্ত সংবিধানের ভিত্তি হবে যৌথ নির্বাচন। অর্থাৎ ফিরে যেতে হবে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে বাঙালী হিন্দু মুসলমান যখন এক নেশন বলে নিজেদের ভাবত ও যখন আইনসভার জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু বাঙালী মুসলিম লীগ নেতাদের যৌথ নির্বাচনে সায় ছিল না। বাংলাদেশ আবার ভেঙে যায়। ভারত ও পাকিস্তান হয় দুই নেশন। পাকিস্তান থেকে বহু হিন্দু ভারতে পালিয়ে আসে, ভারত থেকে বহু মুসলমান পালিয়ে যায় পাকিস্তানে। পাশপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তন পূর্বক এই দুই স্রোত রোধ করতে হয়।

ইতিহাস সেইখানেই শেষ হয়ে যায় না। উর্দু বনাম বাংলার প্রশ্নে বাঙালী ও অবাঙালী মুসলমান দুই স্বতন্ত্র নেশনে বিভক্ত হয়। বাঙালী মুসলমানদের রাষ্ট্রের নাম রাখা হয় বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ এর বাইরে থাকায় এটা হয় কার্যত পূর্ববঙ্গ, সমগ্র বঙ্গ নয়। কিন্তু পাশপোর্ট ও ভিসা বলবৎ থাকে। ভারত বাংলাদেশ ভেদবুদ্ধি কার্যত হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধির খাত দিয়ে বহমান। তাদের আত্মীয়তায় সেই যে ছেদ পড়েছিল সে ছেদ এখনো বিদ্যমান। তবে ওপারের হিন্দুর সঙ্গে এপারের হিন্দুর কোনো ফারাক নেই। ওপারের মুসলমানের সঙ্গেও এপারের মুসলমানেরও কোনো তফাত নেই। ব্যক্তিগত স্তরে আত্মীয়তা যেমনকে তেমন।

আমরা যারা একদা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতুম তারা এখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি নিয়তির হাতে। কেই বা ভাবতে পেরেছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর চার সহযোদ্ধা প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা নিহত হবেন? একটু একটু করে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে দ্বিতীয় এক পাকিস্তান? বঙ্গভাষী পাকিস্তান? ইতিমধ্যে ইসলাম হয়েছে তার রাষ্ট্রধর্ম। এর পরের পদক্ষেপ রাষ্ট্র হবে ইসলামী রাষ্ট্র। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বা জিম্মি। কবে আবার ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরে আসবে তা কেউ গণনা করে বলতে পারে না। তবে

আমরা যারা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে সাতশো বছর ধরে পরিচিত তারা ওদের সবাইকে অবিশ্বাস করতে পারিনে। ওরা ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নয়। মৌলবাদ প্রতিহত হবে যখন বাংলাদেশে রেনেসাঁস হবে। ইতিমধ্যেই তার সূচনা লক্ষিত। ওপারের বাংলা সাহিত্যে তার বহু নিদর্শন।

ওপারের বুদ্ধিজীবীদের উপর আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ। তাঁরা এখন আর পশ্চাৎপদ নন। বরং কোনো কোনো বিষয়ে অগ্রগামী। আর এক পুরুষ কি দু'পুরুষ বাদে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোত বোধ হয় ওপারেই প্রবাহিত হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে বাংলাভাষীদের অধিকাংশই স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করে আর বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের অধিকাংশই ধর্মে মুসলমান। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমরা যারা এপারে আছি তাদের আরো মডার্ন তথা আরো সেকুলার হতে হবে। সম্ভব হলে সেই সঙ্গে গান্ধীপন্থী। তা না হলে সত্যিকারের মার্কসপন্থী। কালীপূজা আর দুর্গাপূজায় যাদের অনীহা।

পুরাতন অভ্যাস সহজে যায় না। এখনো আমরা বাঙালী বলতে বুঝি বাঙালী হিন্দু। বাঙালীর সুখদুঃখ বলতে বুঝি বাঙালী হিন্দুর সুখদুঃখ। বাঙালীর ভবিষ্যৎ বলতে বুঝি বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ। যেন বাঙালী আর হিন্দু সমার্থক। জাতীয় সঙ্গীতগুলি সেই মর্মে রচিত। 'বন্দেমাতরম্' গানও। ওপারে ওরা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' আর দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে' ছাড়া আর যা গ্রহণ করেছে তা নজরুল ইসলামের জাতীয় সঙ্গীত। নেশনকে এক করে ন্যাশনাল অ্যানথেম। কোথায় সেই গান যা বাঙালী হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গাইতে পারে? সবাই মানে দুই পারের সবাই, সতেরো কোটি বাংলাভাষী।

বাংলাদেশের দুই কোটি হিন্দু যদি ওপার থেকে এপারে চলে আসে তা হলে পশ্চিমবঙ্গে তাদের জায়গা হবে না। তাদের যেতে হবে বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে। তাদের ধর্ম অটুট থাকবে, কিন্তু ভাষা বদলে যাবে। তাদের আর বাঙালী বলে চিনতে পারা যাবে না। পৃথিবীর বাংলাভাষীর সংখ্যা দুই কোটি কমে যাবে। বাংলাভাষীর সংখ্যা কমলে বাংলা সাহিত্যের হবে অপূরণীয় ক্ষতি। অপর পক্ষে ভারত থেকে দুই কোটি মুসলমান যদি বাংলাদেশে যায় তা হলে ওপারের বাংলাভাষী মুসলমানদের সঙ্গে উর্দুভাষী মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। যেমন লেগেছিল ১৯৭১ সালে। লোকবিনিময়ের ফলে বাংলাদেশ আর বাঙালীদের দেশ থাকবে না। তার নাম

বদলে দিতে হবে। আবার সেই পূর্ব পাকিস্তান! বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এপারে ওপারে দুই পারেই বাংলাভাষীর সহ-অবস্থানের উপরে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এ সত্য সকলে মেনে নেননি। তাই সংখ্যালঘুরা কোনো দেশেই নিরাপদ বোধ করে না। ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতেও আন্তরিক নয়। বাংলাদেশ ভারতের সামিল হবে না। পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের সামিল হবে না। তা সত্ত্বেও বাংলা ও বাঙালী মনেপ্রাণে এক হবে। এটাই আদর্শ।

শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ প্রকাশ করছেন বিহারের বাংলা আকাদেমি। বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বিহারে বাঙালী হিন্দু মুসলমান সংখ্যালঘু। কিষনগঞ্জের মুসলমানরাও বাঙালী। ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রণী হয়ে বাঙালীরা বিহারের প্রশাসনে অধিকতর তথা উচ্চতর স্থান অধিকার করেছিল। এর আরো এক কারণ ছিল কলকাতা থেকে বিহারের শাসন। বিহার ওড়িশা পৃথক হয়ে যাবার পর থেকে অবাঙালীদের অগ্রাধিকার শুরু হয়। ইংরেজী শিক্ষা তাদের বিকাশ ত্বরান্বিত করে। স্বাধীনতার পর থেকে হিন্দীর জয়জয়কার। হিন্দী শিক্ষায় যারা অগ্রণী এখন তাদেরই আধিপত্য। বাঙালীর ছেলেমেয়েরা যদি বাংলা ভুলে যায় তা হলে সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। চাকরি বাকরি পাবার দৌড়ে হিন্দীই সহায়ক। বাংলা নয়। বিহারে বাঙালীরা ছিল, আছে ও থাকবে। কিন্তু তাদের সংস্কৃতির কী হাল হবে তা কেউ জানে না। বিহার সরকার বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। সরকারী আনুকূল্য বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষায় দুর্বল বাঙালী সন্তানরা পেছনে পড়ে থাকবে। নিয়তি!

শ্রী শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারের বাঙালী। বিহার ও বিহারীর প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ও প্রীতিমান। সেতুবন্ধনের কাজ তাঁর মতো লোকের দ্বারাই সম্ভব। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত গান্ধীপন্থী। বিহারে গান্ধীজীর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'বাংলাদেশে'ও কতক গান্ধীপন্থী কর্মী এখনো জীবিত ও সক্রিয়। তিনি 'বাংলাদেশে' গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগরক্ষা করেছেন। তাঁর কাছে পাঠক যা পাবেন আর কারো কাছে তা পাবেন না। তাঁর এই গ্রন্থ বাঙালীর আত্মজ্ঞান বর্ধন করবে।

১৭ ডিসেম্বর
১৯৮৯

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচী

বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন

বাঙলা, বাঙ্গালা বা বঙ্গদেশের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকে পাওয়া যায়। তবে এরও পূর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচীন বঙ্গের এক জাতি পুণ্ড্রদের উল্লেখ আছে দস্যু নামে। সুতরাং বঙ্গদেশ ও বাঙালীর ইতিহাস নিঃসন্দেহে আরও প্রাচীন, যদিও তার কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। যাই হোক, ঐতরেয় আরণ্যকে বলা হয়েছে: "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ"। এখানে বগধ ও চেরপাদ জাতীয় লোকেদের সঙ্গে বঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষী বা পক্ষীজাতীয় বলা হয়েছে। স্পষ্টতঃ ঐ আরণ্যকের রচনাকারী বৈদিক ঋষি হয় অজ্ঞতার জন্য অথবা অবজ্ঞা সহকারে তদনীন্তন বাংলার অধিবাসী অনার্যদের সম্বন্ধে এ জাতীয় উক্তি করেছিলেন। বুদ্ধ-পরবর্তী বোধায়নের ধর্মসূত্রেও এর উল্লেখ আছে এবং এই দেশে সে সময়ে আর্য ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত ছিল না বলে ধর্মসূত্রে বঙ্গদেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পরবর্তী অন্যান্য কাব্য, পুরাণ ও স্মৃতি ইত্যাদিতেও বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে।

তবে বঙ্গদেশ বলতে আজকে আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে একদা পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত রাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম বিহার ও ওড়িশার ঐ রাজ্যের সংলগ্ন অংশ নিয়ে যে বৃহত্তর বঙ্গের (ত্রিপুরাকেও এর অন্তর্গত করা অন্যায় হবে না) ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আদি বঙ্গ বা বঙ্গালের আয়তন কিন্তু এত বড় ছিল না। আদি বঙ্গ ও বঙ্গাল ছিল ভাগীরথীর পূর্ব দিকে দুটি ক্ষুদ্রায়তন রাজ্য যা আজ 'বাংলাদেশে'র অঙ্গীভূত। সমগ্র বাঙলায় এরকম বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল এবং এগুলির নাম হল পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, সমতট, কামরূপ, বঙ্গ, বঙ্গাল, হরিকেল ইত্যাদি। এই নামগুলির অধিকাংশই এক একটি জাতির সঙ্গে যুক্ত, জাতির নাম থেকে দেশের নামকরণ সুপ্রচলিত প্রথা। প্রশাসনিক দিক থেকে এইসব রাজ্য পরস্পর পৃথক হলেও এই সমস্ত রাজ্যের

সমবায়ে যে বৃহত্তর বঙ্গের ভাবমূর্তি—তার ভৌগোলিক সীমা ছিল উত্তরে হিমালয় এবং হিমালয়ধৃত নেপাল, সিকিম, ও ভূটান রাজ্য; উত্তর পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ ও উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারভাঙ্গা বা দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর সমান্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্ব দিকে গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া-ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণীর কোল ধরে দক্ষিণের সমুদ্র পর্যন্ত; পশ্চিমে রাজমহল সাঁওতাল পরগণা-ছোটনাগপুর-মালভূম-ধলভূম-কেওঞ্ঝর-ময়ূরভঞ্জের শৈল ও অরণ্যময় মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

পুণ্ড্র গৌড় রাঢ় ও বঙ্গ ইত্যাদি এইসব প্রতিবেশী জনপদের অধিবাসীরা স্বাভাবিক বিরোধ-সংঘাত ও মিলন-বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের কাছাকাছি আসেন এবং পণ্ডিতেরা মনে করেন যে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে বাঙালী বলে একটি বিশিষ্ট জাতির সৃষ্টি হয় এইভাবে সমন্বয় প্রক্রিয়ার দ্বারা। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়ের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন শশাঙ্ক এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ—মালদহ মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করে একেবারে উৎকল পর্যন্ত সর্বপ্রথম এক রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভ করে। ক্রমশঃ রাঢ়ের মত প্রাচীন জনপদও যেন গৌড় নামের মধ্যে বিলীন হয়। পাল (৭৫০-১১৬২ খ্রীঃ) ও সেন রাজাদের (১০৯৫-১২৬০ খ্রীঃ) আদর্শ ছিল গৌড়েশ্বর নামে পরিচিত হওয়া। অবশ্য বঙ্গ তখনও স্বতন্ত্র নাম ও সত্তা নিয়ে বিরাজিত। তারপর ১২০০ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী আক্রমণ এবং পাঠান আমলে প্রথম সুবা বঙ্গাল নামে বৃহত্তর বঙ্গের ভাবমূর্তির প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক স্বীকৃতিলাভ।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, " 'বঙ্গাল' শব্দে ফারসী প্রত্যয় 'অহ্' বা 'আ' যোগে দেশের ফারসী নাম 'বঙ্গালহ্, বাঙ্গালা', তাহা হইতে মধ্য যুগের বঙ্গভাষায় 'বাঙ্গালা', আধুনিক 'বাঙ্গলা, বাঙ্‌লা'।" (বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ।৵০)। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন: "আবুল ফজল তাঁহার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা-বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ (সংস্কৃত আলি, পূর্ববঙ্গীয় আইল) যুক্ত হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৩৪)। মোগল যুগের পাশ্চাত্ত্য বণিক ও পর্যটক ইত্যাদি এদেশকে বলত Bengala বা বেঙ্গালা। সেইসব যুগে বিদেশীদের দ্বারা অঙ্কিত মানচিত্রেও এই নাম পাওয়া যায়।

॥ ২ ॥

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে আর্যরক্তের গরিমা বাঙালীর শোভা পায় না। কারণ নৃতত্ত্ব-বিচারে বাঙালীর ভিতর আর্য জাতির প্রভাব নেই বললেই চলে।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ঐতিহাসিক কালে মোটামুটি চারটি নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালীর উদ্ভব। এর মধ্যে প্রথমটি হল উচ্চ দেহ ও উঁচু মাথাওয়ালা উত্তর ভারতীয় আর্য (North Indian Aryan Longheads) জাতি যারা ভারতে আগত আদি আর্যদের বংশধর। উত্তর ভারত এবং পঞ্জাব রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এরকম দীর্ঘশির মানুষের সাক্ষাৎ বেশী মেলে না, অল্প-স্বল্প পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল লম্বা ও নীচু মাথাযুক্ত দক্ষিণ ভারতীয় বা দ্রাবিড়-মুণ্ডা গোষ্ঠীর। বঙ্গদেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই জাতীয় মস্তকের আকৃতি বিশুদ্ধ ভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ গোল মাথাওয়ালা একটি জাতি (Alpine Shortheads)। বঙ্গদেশে এই জাতীয় লোকের প্রাচুর্যই বেশী—বিশেষ করে ভদ্র সমাজে। সাধারণ বাঙালী গোল মাথাযুক্ত, উত্তর ভারতীয়দের মত লম্বা মাথাওয়ালা নয়। এই জাতীয় মানুষদের অস্তিত্ব সিন্ধু, গুজরাত, মধ্যভারত, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশেও পাওয়া যায়। চতুর্থ হল মঙ্গোলীয় গোলমাথাযুক্ত গোষ্ঠী। এদের নাক চাপা, গালের হাড় উঁচু ও দাড়ি-গোঁফ কম। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ভিতর এই উপাদান অধিক মাত্রায় মেলে।

এই চতুর্বিধ নরগোষ্ঠী ছাড়াও অল্প পরিমাণে নিগ্রোবটু বা ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো (Negrito) অথবা নিগ্রোরূপ (Negroid) রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে বাঙালীদের মধ্যে। তার উপর দ্বাদশ শতাব্দীর তুর্কীবিজয়ের পর থেকে কিছু পরিমাণ তুর্কী, আরব, পাঠান ও মোগলের সঙ্গে বাঙালীর বৈবাহিক সম্পর্ক ঘটেছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মগ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতিদের রক্ত সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালীদের মধ্যে—বিশেষ করে সমুদ্র ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, ফরাসী-ইংরেজদের আগমনের পরবর্তী কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসরে অল্প কিছু মাত্রায় তাদের রক্তও মিশ্রিত হয়েছে বাঙালীর দেহে। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহু নরগোষ্ঠী ও জাতির সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ের ফলে গড়ে উঠেছে বর্তমানের এই বাঙালী জাতি।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন: "নরতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার জনসমষ্টি

মোটামুটি দীর্ঘমুণ্ড, প্রশস্তনাস আদি অস্ট্রেলিয় বা 'কোলিড্' ; দীর্ঘমুণ্ড, দীর্ঘ ও মধ্যোন্নতনাস মিশর-এশীয় বা 'মেলানিড্,' এবং বিশেষভাবে গোলমুণ্ড উন্নত-নাস অ্যালপাইন বা 'পূর্ব-ব্রাকিড্', এই তিনজনের সমন্বয়ে গঠিত। নিগ্রোবটু রক্তেরও স্বল্প প্রভাব উপস্থিত, কিন্তু তাহা সমাজের খুব নিম্নস্তরে এবং সঙ্কীর্ণ স্থানগুলির মধ্যে আবদ্ধ। মোঙ্গোলীয় রক্তের কিছুটা প্রভাবও আছে, কিন্তু তাহাও উত্তর ও পূর্বদিকে সঙ্কীর্ণ স্থানগুলির সীমা অতিক্রম করে নাই। আদি-নর্ডিক বা খাটি 'ইণ্ডিড্' রক্তপ্রবাহও অনস্বীকার্য, কিন্তু সে ধারা শীর্ণ ও ক্ষীণ।" (পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৪৮)

এই কারণে বাঙালী উচ্চবর্ণের নর-নারীর সঙ্গে নৃতত্ত্বের দিক থেকে উত্তর ভারতের অনুরূপ বর্ণের নর-নারীদের সঙ্গে যতটুকু মিল, তার থেকে অনেক বেশী মিল বাঙলার তথাকথিত নিম্নবর্ণের সঙ্গে। নৃতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্যের সঙ্গে নমঃশূদ্র নবশাখ ইত্যাদির বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এর থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আর্যীকৃত অনার্যরাই বঙ্গদেশের আর্যসভ্যতার স্তম্ভ।

সম্ভবতঃ মৌর্য অথবা গুপ্ত সম্রাটেরা প্রথম বঙ্গদেশ জয় করে এদেশে আর্য-সভ্যতার ব্যাপক প্রবর্তন করেন। তার পূর্বে পুরোহিত, শ্রমণ, পরিব্রাজক, বণিক অথবা প্রতিবেশী মগধ-মিথিলা অঞ্চল থেকে বৈবাহিক সূত্রে ক্ষীণ ধারায় বঙ্গদেশে আর্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ অসম্ভব নয়। প্রাক্-আর্য যুগে এ অঞ্চলে দ্রাবিড় ও কোল নরগোষ্ঠীর বাস ছিল এবং তাদের নিজস্ব ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা, রীতি-নীতি সবই ছিল। কোলেরা প্রায় সমগ্র দেশটি জুড়ে ছিল, দ্রাবিড়রা ছিল বেশীর ভাগ পশ্চিমবঙ্গে আর মঙ্গোলরা ছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে—পণ্ডিতদের এই রকম অনুমান। বঙ্গদেশের আদি অনার্য ভাষাও এই তিনটি নরগোষ্ঠীর নিজস্ব অবদান। এগুলি হল কোল, দ্রাবিড় ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভোট-চীনা ভাষা।

॥ ৩ ॥

বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি অন্যতম মূল উপাদান হল তার সাহিত্য এবং যে বাঙলা ভাষাকে অবলম্বন করে এই সাহিত্য গড়ে উঠেছে তা আর্য ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অবদান। আধুনিক বাঙলা ভাষা মূলতঃ আর্য

ভাষা·গাষ্ঠীর উত্তরপুরুষ, যদিও প্রাচীন বাঙলার কোল দ্রাবিড় ও ভোট-চীনা ভাষার কোন কোন স্থানীয় ও দেশজ শব্দও এতে বজায় রয়েছে।

আধুনিক বাঙলা ভাষার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যায় যে এর আদি উৎস প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বেকার (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ) বৈদিক সংস্কৃতের কথ্য রূপভেদ। লোকমুখে ও স্থানীয় ভাষার প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ নাগাদ এর থেকে আদি যুগের প্রাচ্য প্রাকৃতের জন্ম হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে ২০০ খ্রীস্টাব্দে মাগধী প্রাকৃত ও ৭০০ খ্রীস্টাব্দে মাগধী অপভ্রংশের উদ্ভব। এই মাগধী অপভ্রংশ থেকে আনুমানিক ১১০০ খ্রীস্টাব্দে প্রাচীন বাঙলা ভাষার সৃষ্টি যা মধ্যযুগের (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ) বাঙলার একটি ধাপ পার হয়ে আধুনিক বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

আধুনিক বাঙলা ভাষার মূল উপাদান ভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তিত রূপ হওয়া সত্ত্বেও এতে যেমন বহু প্রাচীন অনার্য বাঙলা শব্দ মিশে গেছে তেমনি প্রাচীন ভারতে পারসীক ও গ্রীক অভিযানের জন্য সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মাধ্যমে বাঙলা ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীন পারসীক ও গ্রীক শব্দও স্থানলাভ করে। তবে বিদেশী শব্দের সর্বাধিক অনুপ্রবেশ ঘটে বঙ্গদেশে তুর্কী বিজয় ও তারপর ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মোগল রাজত্বের ফলে। তুর্কেরা ঘরে যে তুর্কী বলতেন তার কিছু কিছু শব্দ তো বাঙলা ভাষায় এলই কিন্তু তার থেকেও বেশী এল ফার্সী শব্দ। কারণ তুর্কদের সাহিত্য ও রাজকার্যের ভাষা ছিল ফার্সী। আবার ফার্সী ভাষা আরবীতেও ভরপুর বলে ফার্সীর মাধ্যমে আরবীও বাঙলা ভাষায় স্থান পেল। বাঙলা ভাষায় এই কারণে আড়াই হাজারেরও বেশী ফার্সী শব্দ আছে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে পর্তুগীজ বণিক ও জলদস্যুদের প্রভাবে পর্তুগীজ শব্দ বাঙলায় স্থান পায়। একশতেরও বেশী পর্তুগীজ শব্দ এইভাবে বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এছাড়া ফরাসী ও ওলন্দাজদের প্রভাবে কিছু কিছু সেইসব পাশ্চাত্ত্য ভাষার শব্দও বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যে পশ্চিমী ভাষা বাঙলা ভাষার উপর সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাব বিস্তার করে তা হল ইংরেজি এবং ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি এর প্রবল প্রভাব রয়েছে। এর কারণ হল এই যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই বঙ্গ-দেশ ও বাঙালী আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং আধুনিক

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শন অনুশীলনে ইংরেজি ভাষাই বাঙালীর প্রধান সহায়। সুতরাং অজস্র ইংরেজি শব্দ বাঙালীর লিখিত ভাষায় এবং আরও বেশী শব্দ কথ্য ভাষায় স্থান পেয়েছে। ইংরেজির এই প্রভাব বাঙলা ভাষার উপর ভবিষ্যতেও থাকবে।

সাম্প্রতিক কালে হিন্দি ভাষারও কিছুটা প্রভাব বঙ্গভাষার উপর পড়েছে। বিশেষ করে বিহার ও উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা বাঙালীদের ভাষায় হিন্দির কথ্য শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। কালক্রমে তাঁদের লিখিত বাঙলার উপরও এর ছাপ পড়তে পারে। বাঙলা ও হিন্দি উভয়েরই আদি মূল সংস্কৃত। তবে বর্তমানে যে হিন্দির প্রভাব বাঙলা ভাষার উপর পড়েছে তা বাঙলারই মত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত থেকে খড়িবোলি বা হিন্দিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে সংস্কৃত থেকে পৃথক এর এক স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান। আর সব জীবন্ত ভাষার মত বাঙলাও বহতা নদী। তাই এর গতিপথে নানা ভাষার স্রোতস্বতী থেকে পুষ্ট হওয়াই এর প্রাণবত্তার নিদর্শন।

বাঙলা লিপির জন্ম ব্রাহ্মী লিপির 'কুটিল' (খ্রীস্টীয় সপ্তম শতক) রূপ-ভেদ থেকে। তবে আদি বাঙলা লিপির বহু পরিবর্তনের ফল আধুনিক বঙ্গভাষার অক্ষরসমূহ।

বাঙলা ভাষার সবাপেক্ষা প্রাচীন যে লিখিত রূপ বা বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা হল 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। ১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে এর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। বাঙলার এই আদি লিখিত রূপ বা সাহিত্যের নিদর্শন মোটামুটি খ্রীস্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-এর মধ্যে রচনা বলে পণ্ডিতদের ধারণা। এর পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক। পণ্ডিতদের মতে এর রচনাকাল ১৪০০ থেকে ১৪৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। বড়ু চণ্ডীদাসের দুই এক শত বছর পূর্বেও ময়ূরভট্ট, কাণা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত প্রমুখ কবি বাঙলা ভাষায় কবিতা রচনা করলেও বা গান বাঁধলেও তাঁদের সাহিত্যকৃতির কোন নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের পর কৃত্তিবাস, বিজয় গুপ্ত, মালাধর বসু ও শ্রীকর নন্দী প্রমুখ কবির রচনার নিদর্শন আজ অল্পাধিক পাওয়া যায়। এঁরা সবাই ছিলেন ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেকার কবি। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী কালে লিখিত বাঙলা পুঁথির কোন অভাব অবশ্য নেই।

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম যুগে গদ্য-রচনার একান্ত অভাব, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ব্যতীত গদ্যের ব্যবহার লিখিত সাহিত্যে ছিল না। সমস্ত সাহিত্যই আবার পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি সহজ ছন্দে রচিত। দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে অল্প কয়েকটি বিষয়ই স্থান পেয়েছিল। প্রধানতঃ ধর্ম ও প্রেম বিষয়ক গান, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ ও স্থানীয় দেব-দেবীদের নিয়ে রচিত কাব্য-কাহিনী এবং এছাড়া কিঞ্চিৎ মাত্রায় জীবন-চরিত, বংশাবলী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্র প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের উপজীব্য ছিল। ধর্ম, মঙ্গলকাব্য, বারমাস্যা ইত্যাদিও এই যুগের সাহিত্যের প্রতিনিধি। বাঙলা সাহিত্যের এই গতানুগতিকতা দূর হয় চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে। তিনি ও তাঁর পার্ষদবর্গ সেকালের বঙ্গদেশের অবরুদ্ধ মানসিকতাতে নূতন ধ্যান-ধারণার প্রবল বন্যা প্রবাহ সৃষ্টি করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বাঙলা সাহিত্যে জীবনচরিত, দার্শনিক আলোচনা ও দেশ-বিদেশের কাহিনী ইত্যাদি মননশীল রচনার প্রাদুর্ভাব ঘটে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য এইভাবে ক্রমশঃ আধুনিক মননশীলতার বাহন হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

চৈতন্য মহাপ্রভু দ্বারা অনুপ্রাণিত বৈষ্ণবদাস (অথবা গোকুলানন্দ সেন) কর্তৃক সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' এবং বৃন্দাবনের সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী ও গোপাল ভট্ট প্রমুখের প্রয়াসে যেসব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাও বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এছাড়া 'ভক্তমালে'র কৃষ্ণদাস বাবাজী কৃত অনুবাদ এবং চট্টগ্রামের আলাওল কৃত 'পদ্মাবতী' কাব্যের অনুবাদও বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও বর্মীভাষী রাজার সভায় দৌলত কাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহম্মদ খাঁ ও আবদুল নবী প্রমুখ যেসব মুসলমান কবি ছিলেন, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে তাঁদের অবদানও যথেষ্ট। এছাড়া বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী রচিত 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ, যদিও সপ্তদশ শতকের প্রথমে কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতই বঙ্গভাষায় সমধিক প্রচলিত। 'পদ্মপুরাণ', 'ময়নামতীর গান' ও পূর্ববঙ্গের গাথাসমূহ (মৈমনসিংহ গীতিকা) ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য-ভূমি কর্ষণের উল্লেখযোগ্য ফসল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য বঙ্গদেশের জনজীবনের শান্তি ব্যাহত হয় বলে সাহিত্যের খুব একটা সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে

বঙ্গদেশ থেকে দিল্লীর মোগল বাদশাহের কর্তৃত্ব লোপ পায় এবং স্বাধীন নবাবেরাও দেশ শাসনে যোগ্যতার পরিচয় দিতে অক্ষম হন। তার উপর বর্গীর হাঙ্গামা ও অবশেষে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা। এর তের বৎসর পর বঙ্গের ভয়ঙ্কর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই শতাব্দীতে অল্প কয়েকজন কবি বিখ্যাত হন—রামপ্রসাদ সেন (শ্যামা-সঙ্গীত), ভারতচন্দ্র রায় (অন্নদামঙ্গল), এবং জয়নারায়ণ ঘোষাল (পদ্মপুরাণের কাশীখণ্ডের কাব্যানুবাদ) এঁদের মধ্যে প্রধান। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাতও এই শতাব্দীতে। ১৭৪৩ খ্রীঃ লিসবন নগরে পর্তুগীজ পাদ্রী আসসুম্প্‌সাঁও সর্বপ্রথম রোমান অক্ষরে বাঙলা পুস্তক মুদ্রণ করেন। এটি ছিল একটি ব্যাকরণ ও পর্তুগীজ-বাঙলা শব্দকোষ। বাঙলা হরফ প্রথম মুদ্রিত হয় হাল্‌হেড-এর ব্যাকরণে। ('এ গ্রামার অফ বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ', ১৭৭৮)। ইংরেজদের চেষ্টায় হুগলী থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এরপর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় পাদ্রীদের প্রয়াসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যাপকভাবে বাঙলা লিপিতে মুদ্রণ কার্য আরম্ভ হয়।

উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ করে এর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙলা ও বাঙালীর আধুনিক যুগে উত্তরণের প্রথম চরণ। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও তার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন এবং বিশেষ করে যুক্তিবাদের প্রবল প্রবাহ এদেশের অন্ততঃ উপরের স্তরে প্রবাহিত হওয়ায় বাঙলায় রেনেসাঁস বা নবযুগের প্রবর্তন হয় এই শতাব্দীতে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যও এই সময় থেকে অজস্র ও বহুবিচিত্র পত্র-পুষ্প ফল সম্ভারে শোভিত হয়ে ওঠে। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সমাজ সংস্কারক এবং লেখক রাজা রামমোহন রায়, যাঁর ভিতর বৈদিক ধর্ম, ইসলাম এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও ধ্যান-ধারণার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল। এছাড়া কেরি, মার্শমান ও ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অবদানও অদ্বিতীয়। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের আদি পুরুষ হিসাবে এই প্রসঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রথম যুগের বাঙলা গদ্য সংস্কৃত-বহুল হওয়ায় ক্লিষ্ট ছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র ও বিশেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াসে তা প্রসাদগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেবল পণ্ডিত বা বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌পাল ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাঙলার এযুগের দিক্‌পাল যুগন্ধর পুরুষ। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন তাঁর এক অদ্বিতীয় কীর্তি। সতীদাহ প্রথা নিবারণের পর বিধবা-বিবাহ ও নারী-শিক্ষার

প্রবর্তনের দ্বারা বাঙালীর অর্ধেক—তার নারীসমাজ আত্মস্থ হবার পথ তাঁর প্রয়াসে খুঁজে গেল। সেযুগের বিশিষ্ট কবি হিসাবে এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নামও স্মরণীয়।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করে মাইকেল মধুসূদন বাঙলা কাব্যের দিগন্তকে সুদূরপ্রসারী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বাঙলা উপন্যাস ও কথাসাহিত্যেরই জনক নন, যুক্তিবাদী মননশীলতারও একজন পথিকৃৎ। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখ বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক। ধর্ম ও সমাজ-চিন্তার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ (বঙ্গসাহিত্যেও তাঁর অবদান অতুলনীয়), কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙলা ও বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের একটি যুগচিহ্ন। বাঙলা ও বাঙালীর সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, যার দ্বারা তিনি বাঙালীকে সমৃদ্ধ করেছেন, তার মূল্যায়ন করার অবকাশ নেই। তেমনি স্থানাভাব তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী কবি সাহিত্যিক ও অন্যান্য মনীষীদের সম্বন্ধে আলোচনা করার। তবে নজরুল ও শরৎচন্দ্র—এই দুটি নামের উল্লেখ না করলেই নয়, বাঙালীর উপর তাঁদের গভীর প্রভাবের জন্য।

॥ ৪ ॥

ইংরেজের শাসনের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ও ভাবজগতে আমরা সমৃদ্ধ হলেও বিদেশী শাসনের বন্ধন বাঙালীচিত্তকে পীড়িত করেছে—বিশেষ করে বাঙলার নবযুগের সূত্রপাত থেকে। বাঙালীর আত্মাভিমান পরশাসনের চাপে পীড়িত হয়ে তাকে বিদ্রোহী হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাঙালীর আত্মশাসনের আকৃতি প্রথমে রূপ নিয়েছে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী ও বয়কটকে কেন্দ্র করে। এই যুগে জমে ওঠা অবরুদ্ধ আবেগ অতঃপর অভিব্যক্ত হয়েছে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি ও বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের

মাধ্যমে। ইতিমধ্যে ভারতীয় বোধেরও ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং বহু ভাষা ধর্ম ও নানাবিধ আচার-বিচারে বিভক্ত বিরাট এক দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পক্ষে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির গোপন বা সশস্ত্র বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা স্বভাবতই অপ্রতুল সিদ্ধ হয়েছে। অতঃপর ভারত-ভাগ্য-বিধাতার নির্দেশে দেশের রাজনৈতিক গগনে প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের ভেরী বাজিয়ে অহিংস অসহযোগী গান্ধীর আবির্ভাব। বঙ্গের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূল প্রবাহ তাই সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ছেড়ে গান্ধীর প্রকাশ্য গণবিদ্রোহের পন্থাকে গ্রহণ করে। পরশাসন-বন্ধনকে ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যের বনিয়াদ গড়ার জন্য গান্ধী স্বাধীনতা-আন্দোলনের পাশাপাশি গঠনকর্মের কর্মসূচি উপস্থাপিত করেন। বঙ্গদেশের চিত্ত ও কর্মজগৎকে তাও প্রভাবিত করে। গান্ধী-ভাবধারার সমান্তরাল এবং কখনও কখনও এর প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ধারাও স্বাধীনতা-আন্দোলন প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে পরিলক্ষিত হয় এবং নেতাজী সুভাষ ছিলেন এর উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

বঙ্গদেশে ইসলামের আগমনের সূচনা থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনার যে ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল প্রকাশ্যে তা বিঘ্নিত হওয়া আরম্ভ করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকেই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও তজ্জনিত সুযোগ-সুবিধায় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর বাঙালী মুসলমান সমাজের একাংশ ইংরেজের সঙ্গে অসহ-যোগিতায় অনিচ্ছুক ছিলেন। ক্রমশঃ প্রতিনিধিত্বশীল শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন তাঁদের বাঙালীর বদলে মুসলিম স্বার্থের প্রবক্তা করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি একে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগায়। বাঙালী হিন্দুর একাংশের রাজ-নৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ফজলুল হক্ ও তাঁর সমভাবাপন্ন খাঁটি বাঙালীর হাত মজবুত করার বদলে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে পুষ্ট হতে সাহায্য করে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় জর্জর বাঙালী হোসেন শহীদ সুরাবর্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর 'সার্বভৌম বঙ্গের' বদলে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাময়িকভাবে বঙ্গদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিজয় ঘোষিত হয়। উভয় বঙ্গের বাঙালী এর প্রভাব এখনও সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে মার্কসবাদ বঙ্গদেশে কুণ্ঠিত চরণে প্রবেশ করলেও স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে মানবমুক্তি ও সাম্যের উপায় স্বরূপ এই মতবাদ ও বিশেষ করে রুশ-চীনের উদাহরণ রাজনৈতিক দিক থেকে এযুগের বাঙালীর হৃদয়ে

দোলা দেয়। অতি সাম্প্রতিক কালে আবার মাও-সে-তুং ও চে গুয়েভারার মতবাদ অর্থাৎ শ্রেণী-সংগ্রাম ও সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে আর্থিক ও রাজনৈতিক শোষণ বন্ধ করার পদ্ধতি বাঙলার যুবমানসের একাংশকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। তবে সত্তরের দশকের সেই রাজনৈতিক উন্মাদনা বর্তমানে আশাভঙ্গের শিকার এবং এর বড় একটা কারণ হল এই আদর্শবাদকে রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করতে না পারা।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা ধরে বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাসের এই যে বিবর্তন, এর প্রেরক-শক্তি কি ? ক্রান্তদর্শী কবি এর জবাব দিয়েছেন—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" 'ভারততীর্থ' সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া কবিগুরুর দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল আমাদের এই বঙ্গদেশ ও বাঙালী জাতি গড়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শকহূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

এবং

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিত তার বিচিত্র সুর।"

প্রত্যুতঃ শুধু বঙ্গদেশ অথবা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাই নয়, তাবৎ দেশ ও সমগ্র জগতের সকল জাতি ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারাই এই "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে"—অর্থাৎ সমন্বয়ের নীতি-নির্ভর।

সমন্বয়ের অর্থ বহিরাগত কোন জাতি, ভাষা, সাহিত্য বা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ নয়। ভিন্ন সংস্কৃতি, ভাবধারা ও মূল্যবোধ তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপ করে যখন কোন দেশের জীবন ও মানসিকতার অঙ্গীভূত হয়ে দেশের সংস্কৃতি, ভাবধারা ও মূল্যবোধকে অধিকতর সমৃদ্ধ এক নূতন রূপ দেয় তখনই তাকে বলে সমন্বয়। সমন্বয় বলতে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ বোঝায় না—অতীতের ভিত্তিভূমির উপর নূতনকে গ্রহণ করার নামই সমন্বয়। সমন্বয়ের ফলে দেশজ অথবা বহিরাগত ভাবধারা—কোনটিই আর পূর্বতন রূপে থাকে না, উভয়ের সংমিশ্রণে এক অধিকতর সমৃদ্ধ নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হয়।

এর মূল দেশের মাটিতে হলেও ভিন্ন দেশের সার-জল গ্রহণে এর কোন কুণ্ঠা থাকে না, এইভাবে সমন্বয়ের প্রক্রিয়া নিত্য নবীন সংস্কৃতির ফুল ফুটিয়ে থাকে।

অতীতে বাঙলা ও বাঙালীর বাহ্য ও মনোজগতের ইতিহাস এইভাবে বিবর্তিত হয়েছে এবং আত্মবিলোপন যদি বাঙালীর উদ্দেশ্য না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ধারাকেও উৎকেন্দ্রিক বা বর্জনধর্মী নয়, একাধারে কেন্দ্রাভিগ ও গ্রহণশীল হতে হবে।

বাঙালীর সংস্কৃতি

আমি বললাম, আর সব দিক মার খেলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী আজও অদ্বিতীয়।

বন্ধু বললো, কথাটা শুনতে ভাল ; কিন্তু তোমার বক্তব্য স্বীকার করে নেবার আগে দুটো বিষয়ের একটু স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। প্রথমতঃ বাঙালী বলতে কাদের বোঝায় এবং দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতির অর্থ কি ?

মুখে একটু অনুকম্পার হাসি ফুটিয়ে আমি বললাম, বাঙালী কথাটিরও ব্যাখ্যা করতে হবে ? কেন, তুমি আমি—আমরা সবাই বাঙালী।

বন্ধু বললো, বাঙলাদেশে যে কয়েক লক্ষ ভিন্ন প্রদেশবাসী একাদিক্রমে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করছেন তাঁদের যদি তোমার হিসাব থেকে বাদও দাও তাহলেও বাঙলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা যে কয়েক লক্ষ নেপালী ও ভূটানী রয়েছেন, এঁদের তুমি বাঙালী বলে ধরবে ? এঁদের সংস্কৃতিকে বাঙালী সংস্কৃতি মনে করে তার জন্য গর্ব অনুভব করবে ?

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে গেলাম। তারপর বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম, না, তা কি করে ধরব ?

এর পর বন্ধু বললো, তাহলে বাঙলার বাসিন্দা কয়েক লক্ষ রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোক যাঁদের উত্তরবঙ্গের আদিম বাসিন্দা বলা যায় অথবা বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা ও তার আশেপাশে যে লাখ কয়েক সাঁওতাল আছেন তাঁরা তোমার বাঙালীর হিসাবে পড়েন কিনা বলতে পার ? একটা কথা, এঁদের কেবল মাথা-গুনতিতে বাঙালী বলে স্বীকার করে নিলেই হবে না, এঁদের সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে গর্ব বোধ করার মত মানসিকতা তোমার আছে কিনা সেইটাই এ ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন। খেয়াল রেখো, বাঙলাদেশে এই সব উপজাতীয়দের মোট সংখ্যা পনের লক্ষের বেশী।

আমি বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলাম। অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর গম্ভীরভাবে বললাম, না—না।

বন্ধু বললো, জানতাম তুমি 'না' বলবে। আচ্ছা, এবার বল বাঙলাদেশের বাসিন্দা বাঙলাভাষী হাড়ি বাগদি ডোম বাউরি মুচি মেথর ইত্যাদি তপশীলভুক্ত

জাতির লোকদের সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য। রাজবংশী অথবা সাঁওতাল উপজাতীয়দের মত এঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ নয়—সমগ্র বাঙালী সমাজের একটা মোটা অংশ, শতকরা প্রায় সতের ভাগ হলেন এইসব তপশীলী জাতিভুক্ত সম্প্রদায়েরা। মাথা-গুনতিতে অথবা অন্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করার সময় এঁদের বাঙালী বলে স্বীকার করলেও, সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের তুমি বাঙালী বলবে, না এঁদের আচার-ব্যবহার, সঙ্গীতশিল্প ইত্যাদিকে বাঙালীর গর্বের বস্তু বলে মনে করবে ?

আমি এবার ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললাম, বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য। তোমার কাছে লুকব না। হ্যাঁ, বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের সংস্কৃতিকেই আমি বাঙালীর সংস্কৃতি বলেছি। এতে লজ্জা বা সঙ্কোচের কি আছে ? বাদবাকি অন্যান্য সম্প্রদায় এই উচ্চ'র সংস্কৃতির অনুবর্তী হবে।

প্রাথমিক বিহ্বলতার পর এবার আমার কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়ের স্বর ফুটে উঠেছে।

বন্ধু বললেন, ধীরে বন্ধু, ধীরে। শুধু এই নয়। পঁয়ষট্টি লক্ষ বাঙালী মুসলমান, আড়াই লক্ষ বাঙালী খ্রীস্টান ও বাঙালী বৌদ্ধরাও বাঙালীর সংস্কৃতির বিচারের সময় আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে থাকে না। তা ছাড়া বাংলাদেশের অগণিত চাষী ('চাষাভুষো') এবং শ্রমিকও ('কুলি মজুর' বা 'কুলি কাবাড়ি') সংস্কৃতি-বিচারে এখনও ব্রাত্য। আর মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি বলে আমরা যেটুকু বিনয় প্রকাশ করছি প্রকৃত প্রস্তাবে তাও অলীক। কারণ যে সংস্কৃতির গর্ব আমরা করি তা মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি নয়—এ আসলে সমাজের উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি। বাঁড়ুজ্জে মুখুজ্জে এবং ঘোষ বোস মিত্র ইত্যাদি ইংরেজি শিক্ষিত হুতোম কথিত বাবুদের কালচার এ। আর্থিক কারণে এইসব রোদজল ও ধুলোকাদার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলা সম্প্রদায়ের অনেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হয়ে পড়লেও সামাজিক কাঠামোর শীর্ষবিন্দুতে এঁদের অবস্থান এবং তাই তথাকথিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি বস্তুতঃ বাঙালীদের এক মুষ্টিমেয় সংখ্যক ধোপদুরস্ত পোশাকধারী পরের শ্রমে জীবন নির্বাহকারী 'ভদ্রলোক'দের কালচার।

আমি বললাম, এই তো তোমার দোষ। রাজনীতি কপচাতে শুরু করলে এবার।

বন্ধু বললো, ঘাট হয়েছে। পেলব রায় আর দোদুল দে-দের কাছে সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা করা অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা, যেতে দাও ও প্রসঙ্গ। এবার বল দেখি সংস্কৃতি বলতে তুমি কি বোঝ ?

কেন, শিক্ষা—

আমি একদমে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝপথে আমাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, শিক্ষার কথাই প্রথমে ধরা যাক। জান তো বাঙলাদেশে শতকরা উনত্রিশ জন অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ জন-গণনা বিভাগের কর্তাদের হিসাবে শিক্ষিত। এই শিক্ষিতরা সবাই যদি সংস্কৃতিসম্পন্ন হন তাহলে যাঁরা 'শিক্ষিত' নন, তাঁরা সংস্কৃতিবিহীন—একথা তুমি স্বীকার করবে?

না না, তা কেন হবে?

'শিক্ষা'র প্রসার যে সংস্কৃতির নিদর্শন নয়, তার আর একটা নমুনা দিই। কাল বাসে যখন আসছিলাম আমাদের সহযাত্রী ছিলেন এক শিখ ভদ্রলোক। চোখে দেখে আর নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। বেশ ফিটফাট পোশাক-পরা এবং নিঃসন্দেহে 'শিক্ষিত' দুই বাঙালী তরুণ সেই ভিড়ের মধ্যে ভদ্রলোককে ব্যঙ্গ করার জন্য 'বাঁধাকপি', 'সিঙাড়া' বলে তাঁর শ্রুতিগোচর স্বরে চেঁচাচ্ছিল। এমনকি কয়েক স্টপেজ পরে তরুণ দুটি বাস থেকে নেমে গিয়েও ভদ্রলোককে রেহাই দিল না। বাস ছাড়ার পরও আমরা তাদের ওই অসভ্য চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। 'শিক্ষিত' বাঙালীর অপর প্রদেশবাসীর প্রতি তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি—খোট্টা, ছাতু, উড়ে, ম্যাড়া, তেঁতুল ইত্যাদি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। অপরকে হেয় করার এই নিন্দনীয় বৃত্তি কি সংস্কৃতিসম্পন্নের কাজ?

আমি স্বীকার করলাম যে এসব সংস্কৃতির লক্ষণ নয়। তবে তারপরই বললাম, কিন্তু শিল্প সাহিত্য চারুকলা সঙ্গীত ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো বাঙালীর প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে। অন্ততঃ এইসব সুকুমারবৃত্তির অনুশীলনের জন্য তো বাঙালীকে সংস্কৃতিসম্পন্ন বলে মেনে নিতে হবে।

বন্ধু বললো, এসব সংস্কৃতির অপরিহার্য নিদর্শন নয়, বড় বেশী হলে সংস্কৃতির বাহ্যপ্রকাশ মাত্র। কারণ একজন প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী ঝগড়াটে স্বভাবের হতে পারেন, সাহিত্যিকের পক্ষে ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট হওয়া অসম্ভব নয়, উচ্চ-শ্রেণীর সঙ্গীতবিশারদও হয়তো সামান্য স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলতে পারেন। চিত্রশিল্প, সাহিত্য রচনা অথবা সঙ্গীতের টেকনিক আয়ত্ত করলেই তাকে সংস্কৃতিসম্পন্ন বলতে হবে—এর কোন অর্থ নেই। আর তা ছাড়া এইসব সুকুমারকলার অনুশীলনই যদি কেবল সংস্কৃতির পরিচায়ক হয় তাহলে জন-সাধারণের যে সামান্য ভগ্নাংশ এসবের অনুশীলন করেন তাঁদের বাদ দিয়ে আর সকলকেই সংস্কৃতিবিহীন আখ্যা দিতে হয়।

আমি এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, মহা মুশকিল তোমাকে নিয়ে। সব সময়েই তুমি উলটো-পালটা কথা বলবে। আচ্ছা বেশ, সংস্কৃতির আমার দেওয়া ব্যাখ্যা যখন তোমার পছন্দ নয় তখন সংস্কৃতি বলতে তুমি কি বোঝ শুনি এবার। অভিধানে সংস্কৃতি শব্দটা যখন আছে তখন এর বাস্তব অস্তিত্বও নিশ্চয় রয়েছে।

অভিধানের কথাই যখন তুললে তখন বলি শোন। বড় বড় অভিধান আর এনসাইক্লোপিডিয়া ছেড়ে হাতের কাছের অক্সফোর্ডের সংক্ষেপিত অভিধানের মত নেওয়া যাক। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে বর্তমান আলোচনার পটভূমিকায় সংস্কৃতি বা কালচারের অর্থ হল মনের অনুশীলন দ্বারা লভ্য জ্ঞান ও বৃত্তি। আমাদের রাজশেখরবাবুও 'চলন্তিকা'য় বলেছেন যে সংস্কৃতি হল শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প কলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ। সংস্কৃতির সর্বজন-মান্য সংজ্ঞার্থ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পূর্বোক্ত পরিভাষার আধারে একথা বলা যায় যে সংস্কৃতি হল জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট মানসিকতা—দৃষ্টিভঙ্গী। শিল্প সাহিত্য চারুকলা সঙ্গীত ইত্যাদি এর বহুর মধ্যে কয়েকটি প্রকাশের মাধ্যম। মূল কথা হল ওই বিশিষ্ট মানসিকতা।

আমি প্রশ্ন করলাম, এই মানসিকতার ভিত্তি কি?

বন্ধু বললো, ভাল প্রশ্ন করেছ। এর ভিত্তি হল মানবীয় মূল্যবোধ। দয়া মায়া মমতা করুণা প্রেম প্রীতি বন্ধুত্ব সহানুভূতি শ্রদ্ধা ভক্তি উপাসনা ধর্মনিষ্ঠা নীতিনিষ্ঠা আদর্শনিষ্ঠা পরার্থপরতা দেশাত্মবোধ ও আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি সঙ্কীর্ণ অহং-এর উর্ধ্বে ওঠার যেসব বৃত্তি মানুষকে পশু থেকে ভিন্ন করেছে তার নাম মানবীয় মূল্যবোধ। নিজের ও সমাজ-জীবনে এইসব বৃত্তির উত্তরোত্তর বিকাশের নামই সংস্কৃতি চর্চা।

আমার সংশয় কিন্তু গেল না। আমি বললাম, তাহলে বাঙালীর সংস্কৃতি—

বন্ধু বললেন, কথাটা একটু রূঢ় শোনালেও সত্য যে বাঙালীর সংস্কৃতি বলে কোন কিছু নেই। বাঙালীর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—তার পৃথক সংস্কৃতি নেই। সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র একটিই সংস্কৃতি আছে, আর তার নাম মানবীয় সংস্কৃতি।

বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তর

রচনায় 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা আছে। রাজশেখরবাবু চলন্তিকায় এর অর্থ দিয়েছেন: "শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পকলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture।" সূত্রাকারে বললেও রাজশেখরবাবু সংস্কৃতি শব্দটির বহু ব্যাপক অর্থ দিয়েছেন। আমরা এখানে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত অর্থে—জীবনের প্রতি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থে শব্দটির ব্যবহার করব।

"শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ রুচি ও নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ' এবং আমরা যাকে জীবনের প্রতি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বলেছি, একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তা সমঅর্থদ্যোতক এবং তাই একথা বললে অন্যায় হবে না যে, রাজশেখরবাবু প্রদত্ত 'সংস্কৃতি'-র পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় আমাদের এই ভাষ্য অন্তর্নিহিত।

জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গীর বাহ্য অভিব্যক্তির বহুবিধ মাধ্যম আছে। সাহিত্য সঙ্গীত চারুকলা অভিনয় থেকে আরম্ভ করে আচার-ব্যবহার ও দর্শন পর্যন্ত অনেক কিছু এর আওতায় পড়ে। আমরা কিন্তু আলোচনার স্বল্প-পরিসরের জন্য আমাদের বীক্ষণকে সংস্কৃতির দুটি মাত্র বহিরঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব, যদিচ সংস্কৃতির অপরাপর ক্ষেত্রেও বাঙালী-সংস্কৃতির রূপান্তর সমপরিমাণে দৃষ্টিগোচর।

সংস্কৃতির একটি লঘু নিদর্শন হল পোশাক। অথচ এই পোশাক মানুষের মানসিক প্রবণতার বাহ্য অভিব্যক্তিও বটে এবং বলাই বাহুল্য, মানসিক প্রবণতা সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট উপাদান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে বিভিন্ন কারণে বাঙালী পুরুষদের মধ্যে ইউরোপীয় পোশাকের প্রাধান্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে শহর কেন, এমনকি সুদূর গ্রামাঞ্চলের পুরুষদের মধ্যেও প্যাণ্ট শার্ট বা হাওয়াইয়ান শার্টের প্রচলন হয়েছে। এ বাঙালীর সনাতন পোশাক ধুতি পাঞ্জাবীর চেয়ে সস্তা এবং দৌড়ঝাঁপের কাজের উপযুক্ত ইত্যাদি অনেক কুযুক্তি এর সমর্থনে উপস্থাপিত করা হয়, যদিচ অধিকাংশ ফুলপ্যাণ্ট ব্যবহার-কারী যেসব কর্ড টেরিলিন ইত্যাদির প্যাণ্ট ব্যবহার করেন তার দাম ধুতির চেয়ে অনেক বেশী এবং শহরের পথেঘাটে এখনও বহু ধুতি পাঞ্জাবী পরা চটপটে

মানুষ দেখা যায়। যাই হোক, প্যান্ট শার্টের পক্ষে এইসব ওকালতী যদিও বা কান-সওয়া হয়ে আসছে তাহলেও ইউরোপ আমেরিকা থেকে যে বো এবং টাইকে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে, স্বাধীনতার পর নূতন করে সাহেব হবার নেশায় মশগুল অপরাপর প্রদেশবাসী সহ বাঙালীদের ভিতর তার প্রচলনের সপক্ষে কোন যুক্তি শোনা যাচ্ছে না। এর ব্যবহার নিছক সাহেব হবার মোহে। পুরুষের পোশাকের পরিবর্তনের এখানেই শেষ নয়। এর সর্বশেষ অবদান হচ্ছে ড্রেন পাইপ প্যান্ট অথবা বেল-বট এবং ছুঁচলো জুতো। পশ্চিমের যেসব টেডি বয়, রকার অথবা হিপিদের কাছ থেকে আমরা এসব ধার করেছি তারা সংস্কৃতি-জগতের কোন্ নিম্নস্তরের মানুষ তা বোধ হয় আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

যাই হোক যে মানসিকতা আমাদের সনাতন পোশাক ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরতে অনুপ্রাণিত করছে এবং যে কারণে এই বিদেশী পোশাক আমাদের কর্মক্ষেত্র থেকে সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে চড়াও হচ্ছে তার নাম হল সাহেব হবার ইচ্ছা। এ ইচ্ছা ভাল কি মন্দ, উচিত না অনুচিত— সে প্রশ্ন এখানে তোলা হচ্ছে না। এখানে শুধু এইটুকু বুঝলেই যথেষ্ট যে সাহেব হবার এই মানসিকতা এসে বাঙালী মানসিকতার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে।

নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রেও এই একই মানসিকতার পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, এতদতিরিক্ত আরও কিছু লক্ষ্য করা যায়। এই আরও কিছুটি হল যৌন সচেতনতা। ব্লাউজের হাতা ও বুক পিঠে নির্মমভাবে কাঁচি চালিয়ে এবং এর উপর সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব জায়গায় সেলাই দিয়ে দেহের প্রতিটি রেখাকে পথ-চারীদের নয়নগোচর করে মুহুর্মুহু স্খলিত বসনাঞ্চল কনুই-এর ভাঁজে কোন রকমে লাগিয়ে রেখে লাস্যময়ী ভঙ্গিমায় যে বিনোদিনীরা পথ চলেন, সজ্ঞানে হোক অথবা অবচেতন মনে তাঁরা তাঁদের যৌবনশোভা প্রদর্শনাভিলাষিণী। নিঃসন্দেহে যে মানসিকতার কারণে ঈষৎ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে শান্ত সৌম্য চলনে আজ থেকে পনের বিশ বছর পূর্বে বাঙলাদেশের পথেঘাটে বঙ্গললনারা পথ চলতেন আজকের পূর্বোক্ত ধরণে বিচরণকারিণী মহিলাদের মানসিকতা তার থেকে পৃথক।

সংস্কৃতির অপর যে নিদর্শনটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি একটু গুরু পর্যায়ের। এ হল আমাদের পূজা পার্বণ। আজ থেকে মাত্র পনের-কুড়ি বছর পূর্বে দুর্গা লক্ষ্মী বা সরস্বতী পূজা ইত্যাদির সময় পূজার আয়োজনকারী ব্যবস্থাপক ও ভক্তদের মধ্যে একটা সৌম্য ভক্তিভাব—একটা seriousness পরিলক্ষিত হত। স্নান করে উপবাসী থেকে কাচা কাপড় পরে ফুল, বিল্বপত্র,

দূর্বা ইত্যাদি পূজার উপকরণ সংগ্রহ, অনুরূপ সংযম সহকারে পূজার নৈবেদ্য ও ভোগ সাজান, পাদুকা খুলে রেখে পূজামণ্ডপে ওঠা, উপবাসী থেকে অঞ্জলি দেওয়া ও শুদ্ধাচারে প্রসাদ চরণামৃত বা পূজার ফুল নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ছিল বাঙালীর পূজানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। দেবী প্রতিমা বিসর্জনের অনুষ্ঠানে আপামর জনসাধারণ যোগ দিলেও তার মধ্যে আপনজনের কাছ থেকে বৎসর-কালের জন্য বিচ্ছেদজনিত একটা অকৃত্রিম শোকভাবের পরিচয় পাওয়া যেত। আজ কিন্তু বাঙালীর পূজানুষ্ঠানে—বিশেষ করে সর্বজনীন পূজার ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিষ্ঠা ও শুচিতা এক রকম অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর বিসর্জনের অনুষ্ঠান? তার কথা না তোলাই ভাল। ট্রাকের উপর দেবী প্রতিমার সম্মুখে তাসা সহযোগে টুইস্ট কিংবা রক অ্যাণ্ড রোল নৃত্যরত কয়েকজন কিশোর বা যুবক এবং তাদের ঘিরে উদ্দাম উল্লাসে চীৎকারকারী আরও কিছু কিশোর ও যুবক—এইভাবে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রারই আজকাল প্রাবল্য।

সংস্কৃতির রূপান্তর যুগে যুগে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রাণ-স্পন্দনের লক্ষণ। কিন্তু যে পরিবর্তন মানবীয় গুণ ও মূল্যবোধের অপহ্নব ঘটায় সে পরিবর্তনের নাম অধোগতি। পোশাকের ক্ষেত্রে সাহেবিয়ানা ও যৌনতার প্রাবল্য এবং পূজা পার্বণের ক্ষেত্রে সংযম শুচিতা ও নিষ্ঠার পরিবর্তে উদ্দণ্ডতার আবির্ভাব নিঃসন্দেহে বাঙালী-সংস্কৃতির অধোগতির পরিচায়ক। বাঙালী-সংস্কৃতির এই রূপান্তরের প্রতি অবহিত হবার দিন এসেছে।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সভাপতির ভাষণ শেষ হতেই মঞ্চের উপর যবনিকা পড়ল এবং তারপরই মাইক্রোফোনে ঘোষিত হল, এবার পনের মিনিটের জন্য বিরতি এবং তারপরই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

আমি আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অন্যতম। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে বন্ধু তাই প্রশ্ন করলেন, এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে! তবে এতক্ষণ যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বক্তৃতা শুনছিলাম তা কি অসংস্কৃতিমূলক না কি?

আমি ছোট্ট একটি ধমক দিয়ে বললাম, ঐ তো তোমার দোষ। সব কিছুই তুমি বাঁকা চোখে দেখ!

তিনি বললেন, রাগ কোরো না। এর পরবর্তী কার্যক্রমকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলার কারণ আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি বললাম, কেন—রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্য-নাট্যের অভিনয় হবে, তা ছাড়া গান ও নাচের কার্যক্রম আছে। এসব সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নয়?

বন্ধু বললেন, এর জবাব না এবং হ্যাঁ—দুই-ই।

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললাম, রাখ তোমার হেঁয়ালী।

বন্ধু বললেন, অভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি স্বয়ং সংস্কৃতির নিদর্শন নয়। তবে হ্যাঁ, সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের চিন্তাভাবনা ও হৃদয়বৃত্তির অভিব্যক্তি হতে পারে এসব।

আমি বললাম, কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বল।

বন্ধু বলতে লাগলেন, আমার বক্তব্য হল এই যে অভিনয়-কলা, নৃত্য বা সঙ্গীতে পারদর্শী অথবা তার রসগ্রাহী ব্যক্তি যে সংস্কৃতিসম্পন্ন হবেনই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ জাতীয় ব্যক্তি স্বার্থপর, কুটিল এবং ঝগড়াটে হতে পারেন এবং তাহলে ঐসব চারুকলার টেকনিকে অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ বলা যাবে না। আসল প্রশ্ন হল মানুষটি—তাঁর মন কতটা কর্ষিত, এরই উপর নির্ভর করে সংস্কৃতি। কেবল চিৎপ্রকর্ষণমূলক বৃত্তির টেক-নিকে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট নয়।

আমি বললাম, বড় নূতন ঠেকছে কথাটা।

বন্ধু বললেন, হোক না নূতন, সত্য কি না তাই বিচার করে দেখ। আর তাছাড়া আর একটা কথা আছে।

কি ?

অভিনয়-কলা, নৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতির একমাত্র বহিঃপ্রকাশ নয়। সংস্কৃতির বহুবিধ বহিঃপ্রকাশের মধ্যে কয়েকটি। যদি রাগ না কর তাহলে বলব সংস্কৃতির ফলিত রূপের মধ্যে সবচেয়ে প্রাকৃত, সবচেয়ে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এগুলি।

আমি বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, আজ তোমাকে হেঁয়ালীর ভূতে পেয়েছে নাকি হে ? দেখি, তোমার ভাণ্ডারে আর কোন্ রহস্য সংগুপ্ত রয়েছে ?

বন্ধু বললেন, অভিনয়-কলা, নৃত্য ও সঙ্গীত ছাড়া সংস্কৃতির অপর একটি বাহ্য অভিব্যক্তি হল সাহিত্য-চর্চা। তবে এও অভিনয়-কলা ইত্যাদির সমগোত্রীয়— অর্থাৎ প্রাকৃত পর্যায়ের জিনিস। জীবন-শিল্পী হল এর চেয়েও উঁচু দরের জিনিস।

সেটা আবার কি ?

সংস্কৃতির অর্থ যদি আমাদের সঙ্কীর্ণ সত্তা অর্থাৎ পশুপ্রবৃত্তির উর্ধ্বে ওঠার নিদর্শন হয় তাহলে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে যে যুবকটি চলন্ত বাসের সামনে থেকে ছোট্ট মেয়েটিকে সরিয়ে আনল বা যে কিশোরটি অচেনা অন্ধ লোকটির হাত ধরে তাকে যানবাহনবহুল রাস্তা পার করে দিল তাদের এবং তাদের মত আর সবাইকে জীবন-শিল্পের সাধক বলতে হবে। শুধু তাই নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন বা তিলে তিলে আত্মোৎসর্গ করেছেন অথবা এখনও জাতিকে নূতন করে বাঁচার মন্ত্র দেবার জন্য সুদূর পল্লীতে পড়ে রয়েছেন—সর্ববিধ পদের মোহ বর্জন করে গ্রামের সেবা করছেন, সংস্কৃতি বিচারে তাঁরা প্রথম শ্রেণীতে আসন পাবার যোগ্য। যে সন্ন্যাসী, যে সাধক বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিনিচয়ের উর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস করছেন তাঁর স্থান তো আরও উপরে।

তোমার কথায় যুক্তি যে নেই তা নয়, আমি বললাম।

বন্ধু বললেন, অথচ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভিনয়, নৃত্য ও গীত ছাড়া আর কোন কিছুরই স্থান নেই। এই ঝুটা সংস্কৃতির ভূত আমাদের এমন পেয়ে বসেছে যে ভারত সরকারও বিদেশে যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল পাঠান তাতে কেবল নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়েরই ছড়াছড়ি। অথচ আমরা ভুলে

যাই যে এই শতাব্দীতে বিদেশে যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করেছেন তাঁরা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ ও মানবসেবক গান্ধী। সুতরাং এ জাতীয় কার্যক্রমকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না বলে মনোরঞ্জনের কার্যক্রম আখ্যা দিলে তাতে সত্যের মর্যাদা অধিকতর রক্ষিত হয় না কি?

তা হয় অবশ্য, তবে তাতে কিন্তু অনুষ্ঠানের মর্যাদা অনেক কমে যায়। খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে আমি জবাব দিলাম।

বন্ধু বললেন, তা গিয়েও যদি আমরা সত্যকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন হই তাতে দেশের কল্যাণ হবে না কি? তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে এই তথাকথিত 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার ফলে আমাদের জীবনের অন্য অনেক মূল্যবান দিক বন্ধ্যা থেকে যাচ্ছে। মানুষের জীবনে অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য ইত্যাদি সুকুমার কলার স্থান আছে কিন্তু এগুলিই সব নয়। জাতিকে বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সমাজশাস্ত্র ও রাজনীতি ইত্যাদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জানতে হবে। এছাড়া শরীর চর্চা করতে হবে, সমাজসেবায় নামতে হবে এবং স্বদেশ ও সমগ্র বিশ্বমানবের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করতে হবে। এসব বাদ দিয়ে কেবল তথাকথিত সংস্কৃতির চর্চা করলে জাতির ভবিষ্যৎ কি বলতে পার?

যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?

কথা নেই বার্তা নেই কিছু ইট-পাটকেল এবং বোমা-পটকা পড়ল এবং তারপর দু-একখানি বাস বা ট্রাম আগুনে পুড়ল—কলকাতার নাগরিক জীবনে এতে আমরা এক রকম অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটা অনেকটা জাপানের ভূমিকম্পের মত! যে কোন সময় বাসুকি মাথা নাড়া দিতে পারেন এবং দশ বিশ পঞ্চাশটি ঘর ভেঙে পড়বে ও কিছু নর-নারী হতাহত হবে। এর কোন প্রতিকার নেই, নেই প্রতিবিধান। কলকাতা তথা বাঙলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় ইট-পাটকেল ও পটকা ছুঁড়ে এবং আরও একটু বেশী মাত্রায় হলে ট্রাম বাস জ্বালিয়ে তাঁদের যৌবনোচিত অতিরিক্ত উদ্যমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন এটা যেন আমাদের গা সওয়া হয়ে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনায় মনে একটু চিন্তার দোলা লাগছে।

পর পর বেশ কয়েকবার একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রে কালকে যাঁরা গ্রাজুয়েট হবেন তাঁরা যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করলেন তা দেখে হতচকিত হতে হল। কয়েক দিন পর যাঁরা ডাক্তার হবেন, যাঁদের ধীরস্থির বুদ্ধি, বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে শত শত নর-নারীর বাঁচা মরা, তাঁরা (এর মধ্যে মহিলাও কয়েকজন ছিলেন) বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে ঘিরে যে ট্যাঙ্গো, হুলাহুপ, রক অ্যাণ্ড রোল ও টুইস্ট নাচের কসরৎ দেখালেন তার তুলনা মেলা ভার। বলতে ভুলে গেছি এই নৃত্য ছিল সঙ্গীত সংবলিত এবং সেই সঙ্গীতে খিস্তি খেউড় এমন বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল যে সেকালের রাম বসু অথবা গোপাল উড়ে ইত্যাদির মত পেশাদার কাঁচা ভাষার সঙ্গীতের গায়কেরাও একালের অ্যামেচারদের ভাষা শুনলে হার মানতেন। এবং বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন এসবই প্রযুক্ত হয়েছিল তাঁদের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন পূর্বেকার আরও দুটি ঘটনার কথা মনে আসছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-দেশের নবজাগরণের অগ্রনায়কদের সৃষ্টির কেন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত এক কলেজের ছাত্ররা তাঁদের অধ্যক্ষকে যেভাবে দীর্ঘকাল ঘেরাও করে রাখলেন ও যেভাবে তাঁকে দীর্ঘ সময় নির্জলা একাদশী পালনে বাধ্য করলেন তার তুলনাই বা কোথায়? এবং কলেজের বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত বিজ্ঞানের লেবরেটারীটি যেভাবে

অংশতঃ ধ্বংস হল তার তুলনা চলে একমাত্র অন্নপূর্ণার ছিন্নমস্তা হবার সঙ্গে। ঐ কলেজেরই হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে তাঁর পুত্রবৎ ছাত্ররা যে আচরণ করলেন (জল ও বিদ্যুতের সরবরাহ বন্ধ করা এবং বাজারহাট বন্ধ করে দেওয়াও এর মধ্যে পড়ে) এবং শুধু তাই নয় গুরুর 'অপরাধে' গুরুপত্নীকে পর্যন্ত যেভাবে দিনের পর দিন কটূকাটব্য শুনতে হল তারই বা তুলনা কোথায়? ইদানিং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্কুল-কলেজে দক্ষযজ্ঞ, মনীষীদের মূর্তি ভাঙা বা অন্যভাবে তার অবমাননা এবং তাঁদের রচিত মহৎ গ্রন্থাবলীর বহ্ন্যুৎসব। রাজনৈতিক মতে না মিললে সহপাঠী ছাত্রদের ছুরি, বোমা ও বন্দুকের শিকার বানানর মত চরম নৃশংস ঘটনাবলীও ঘটছে। ফিরিস্তি আর বাড়িয়ে লাভ নেই—কারণ তালিকা মহাভারতের আকার নেবে।

এরা চিকিৎসার অতীত তাই দুষ্টক্ষতের মত অস্ত্রোপচারের দ্বারা এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে—হতাশার মুহূর্তে ক্ষোভে একথা বললেও এ মনোভাবে যে কোন যুক্তি নেই, একটু চিন্তা করলেই তা বোঝা যাবে। এরা আমার আপনার সবার বাড়িতে আছে। একালে বিশেষ করে নাগরিক জীবনে এমন কোন পরিবার নেই যেখানে এই উৎকেন্দ্রিকতার ছোঁয়া লাগেনি। বর্জন করা যে কেবল কোন সমাধান নয় তাই নয়, বর্জনের প্রক্রিয়ার কারণ নিতে গেলে তা হবে কম্বলের লোম বাছার মত। শুধু বাঙলাদেশেই এ ব্যাপার ঘটছে না। What Bengal thinks today India thinks to-morrow —এই মহাজনবাক্যকে নিয়তির পরিহাসের মত ব্যঙ্গ করেই যেন ভারতবর্ষের সর্বত্র এই অশান্ত যৌবন বিক্ষুব্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষই বা কেন—এই সেদিন ফ্রান্সে কি হল? যুগোশ্লাভিয়ার ছাত্ররা কি কাণ্ডটা করল? আর ইংলণ্ডের বিটল, মড আর রকার এবং আমেরিকার হিপিরাও কি এই বিদ্রোহী যৌবনের অশান্ত প্রতিকৃতি নয়? এমনকি সোভিয়েট রাশিয়ার মত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত আজ্ঞাতন্ত্রের সমাজেও যে অযৌক্তিক বিদ্রোহ ও ভাঙনের গানের সুরের ছোঁয়া লেগেছে প্রায়শই তার সংবাদ পাওয়া যায়।

বিদ্রোহ বা বেহিসাবীপনা স্বয়ং কোন নিন্দার বিষয় নয়—বিশেষ করে তরুণ ও যুবক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনা তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা তরুণের ধর্ম এবং তাই বাঞ্ছনীয়ও বটে। তাকলামাকান মরুভূমি পার হতে, অথবা দক্ষিণ মেরুর আবিষ্কারের সময় কিংবা আজকের দিনে স্পুটনিক বা গ্রহান্তরে যাবার রকেটে ওঠায় যে মনোবৃত্তি কাজ করে তা এই

যৌবনের বেহিসাবীপনাই। আপন প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে দেশমাতৃকার বন্ধনমোচন করার যে আগ্রহ অথবা ইউরোপ-আমেরিকার সুখের জীবন ছেড়ে আফ্রিকার ঘন অরণ্যে সম্পূর্ণ অনাত্মীয় অপরিচিত কালা আদমীদের সেবার জন্য থেকে যাওয়ার পিছনে যে মনোবৃত্তি বিদ্যমান তাও এই যৌবনের বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনা সঞ্জাত। এমনকি এসব মহৎ অভিব্যক্তি ছাড়াও যৌবনের বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনার গতানুগতিক জীবন ও সংসারেও একটি ভূমিকা আছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তরুণ-তরুণীর জীবনে রোমান্স ও প্রেমরূপে এর আবির্ভাব ঘটে। মানব-জীবনকে রূপ রস গন্ধে সমৃদ্ধ করার পক্ষে এই প্রেম ও রোমান্সের ভূমিকাও অদ্বিতীয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র অহংকে বিস্মরণপ্রয়াসী ও বৃহত্তর মানবতার সেবাভিমুখী করার দুঃসাহসিকতাই হোক, অথবা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ছোট্ট পরিধিটিকে বর্ণাঢ্য সুষমায় ভরে দেবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রোমান্স বা প্রেমই হোক—উভয় জাতীয় বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনারই একটা গঠনমূলক ও শিল্পসম্মত ভূমিকা আছে। কিন্তু পূর্বে যে মারাত্মক ছিন্নমস্তাবৃত্তিসুলভ বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে আত্মহননের ধ্বংসাত্মক এবং স্থূল কদর্যতার ভূমিকা ছাড়া তো অপর কিছু নেই, এবং নেই বলেই এই বিদ্রোহ ও বেহিসাবীপনা শক্তির নিছক অপচয় ও মানব-সভ্যতা বা সংস্কৃতি এর দ্বারা লাভবান তো হয়ই না বরং এর অন্তর্নিহিত স্থূলতা ও কদর্যতার জন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধোগতি ঘটে।

সমাজের কল্যাণকামীদের ভিতর এ বিষয়ে নিশ্চয় দ্বিমতের অবকাশ নেই যে যৌবনের এ জাতীয় বিদ্রোহ ও অপচয় অবাঞ্ছনীয় এবং তাই এর প্রতিবিধানও আবশ্যক। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন্ পথে ? একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে আরও অনেক উপায়ের শরণ নিলেও এক্ষেত্রে প্রধান উপায় হল যুব সম্প্রদায়কে আদর্শবাদে দীক্ষিত করা। প্রশ্ন উঠবে—আদর্শবাদে দীক্ষিত করার দলের তো অভাব নেই, প্রত্যুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তো তাবৎ রাজনৈতিক দলের আখড়া স্বরূপ। কিন্তু আদর্শবাদ বলতে এখানে কোন রাজনৈতিক দলবিশেষের ক্ষমতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য সাধন অথবা আর্থিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ সাধনের কথা বলা হচ্ছে না। আদর্শবাদ এখানে altruism বা নিঃস্বার্থ পরোপকারের অর্থে ব্যবহৃত, যার বলে মানুষ ক্ষুদ্র অহং-এর ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবতার সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে।

যে কোন সভ্যতা বা জাতির স্বর্ণযুগ হল সেই কাল যে কালে সেই সভ্যতা বা জাতি ক্ষুদ্র অহং-এর গণ্ডি ভেঙে সমগ্র মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগের প্রয়াস করে। দূরের উদাহরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিজেদের এই বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতির ইতিহাসের দিকে যদি দৃকপাত করি তাহলে দেখতে পাব যে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য থেকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙলা ও বাঙালীর যে স্বর্ণযুগ ছিল তার মূলকথা হল একই আদর্শবাদ বা altruism-এর প্রেরণা। শিক্ষা ও জ্ঞান নিজের মধ্যে গ্রহণ, তার আত্তীকরণ ও অবশেষে তার বিকীরণ, ধর্ম সেবা ও শিল্পের সম্প্রসারণ—এই ছিল এই কালের বাণী। রামমোহন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ইত্যাদি ধর্ম ও লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিদ্যাসাগর ভূদেব ইত্যাদি শিক্ষার ক্ষেত্রে, মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবদান সৃষ্টি করেছেন তা সেই উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শবাদের ভূমিকারই ফসল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সশস্ত্র এবং অহিংস—উভয় ধরণের আন্দোলনের প্রক্রিয়াতেই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত বাঙলা যে অদ্বিতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার মূলেও ছিল এই আদর্শবাদনিষ্ঠা—যার মূল কথা হল ক্ষুদ্র অহংকে বিস্মৃত হয়ে বৃহত্তর মানবসমাজের সেবা ও কল্যাণ সাধনার মধ্যে নিজ চরিতার্থতা খোঁজা। এও ছিল এক ধরণের যৌবনের বিদ্রোহ বা বেহিসাবীপনা—কিন্তু পৃথক জাতের। এর বৈশিষ্ট্য হল গঠনমূলক—সর্জনাত্মক। যৌবনের বিদ্রোহকে আদর্শবাদের দীক্ষা দিয়ে এইভাবে গঠনমূলক খাতে প্রবাহিত করতে না পারলে বাঙলা ও বাঙালীর কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই—এই মন্ত্র অধ্যাত্মবাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মত সমাজ ও প্রাত্যাহিক জীবনের সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্য।

বাঙালীর স্বাদেশিকতা

চায়ের পেয়ালায় তৃপ্তিসূচক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে আমি বললাম, বাঙালীর স্বদেশপ্রেম যে অদ্বিতীয় এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেই দেখ সিরাজ মীরকাশিম মীরমদন মোহনলাল নন্দকুমার···।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বন্ধু বললেন, মীরজাফর জগৎশেঠ উমিচাঁদ রায়দুর্লভ···।

আমি কটমট করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললাম, স্বদেশী আমলেও বাঙালী ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছে। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী থেকে আরম্ভ করে বিনয় বাদল দীনেশ পর্যন্ত বাঙালীর স্বদেশপ্রেমের জলন্ত নিদর্শন।

বন্ধু বললেন, নরেন গোঁসাই এবং আরও যেসব অ্যাপ্রুভার ও ইনফর্মারের দল বিপ্লবীদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি বল?

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, অসহযোগ আন্দোলন ও তার পরবর্তী যুগেও দেখ দেশবন্ধু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, তারপর সুভাষ ও তাঁদের অনুগামী আরও কত হাজার হাজার নরনারী।

বন্ধু বললেন, এর সঙ্গে সঙ্গে দেখ সেইসব শত শত রায় সাহেব, রায় বাহাদুর, হাজার হাজার বৃটিশ রাজ্যের বশংবদ বাঙালীকে। একটু হেসে বন্ধু যোগ করলেন, এঁদের অনেকেই স্বনামধন্য; কিন্তু তাঁদের নাম করে বিপদে পড়তে চাই না। কারণ পনেরই আগস্ট ১৯৪৭ সনের পরে এদের অনেকে গায়ে খদ্দর চড়িয়ে প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী হয়ে গেছেন।

আমি ক্ষুব্ধভাবে বললাম, আচ্ছা তোমার এই নেতিবাচক মনোবৃত্তি কি কোন দিনই বদলাবে না?

বন্ধু বললেন, কি করব বল—অন্ধ আশাবাদী হতে পারছি না যে। কিন্তু আমি নৈরাশ্যবাদীও নই—বাস্তববাদী হবার চেষ্টা করছি বলে সত্যকে খুঁটিয়ে বোঝার প্রয়াস করছি।

আমি বললাম, এ প্রসঙ্গে তোমার পজিটিভ বক্তব্যটা কি?

বন্ধু জবাব দিলেন, আর সব প্রদেশবাসীর মতই বাঙালীর ভিতর পাশাপাশি স্বদেশপ্রেম ও স্বার্থপরতা রয়েছে। এ বিষয়ে বাঙালীর স্থান আর কারও উপরে

বা নীচে নয়। এছাড়া আর একটি কথা। মুষ্টিমেয় জনকয়েক নেতা ও কর্মীর ভিতর জলন্ত স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন দেখা গেলেও অধিকাংশ বাঙালী এ বিষয়ে নির্বিকার। অর্থাৎ তাঁরা না স্বদেশপ্রেমী, না দেশদ্রোহী।

বিস্মিত কণ্ঠে আমি বললাম, বলছ কি তুমি? এই যে এক একটা আন্দোলনে এত বাঙালী যোগ দেয় তার কি ব্যাখ্যা আছে তোমার কাছে!

বন্ধু বললেন, দেখ, স্বাধীনতার আন্দোলন যখন একেবারে উত্তেজনার উত্তুঙ্গ শিখরে তখনও হাজার কয়েকের বেশী নরনারী এতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেয়নি। সমস্ত বাঙলাদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করলে এর আনুপাতিক হার কত হয়?

আমি বললাম, কিন্তু ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী বামপন্থীদের আন্দোলন সম্বন্ধে কি বক্তব্য তোমার? ট্রাম ভাড়া বাড়াবার বিরুদ্ধে এবং খাদ্য আন্দোলনে এক কলকাতাতেই তো হাজার হাজার বাঙালী নরনারী যোগ দিয়ে নির্যাতন ভোগ করেন। একে তুমি ম্যাস আপসার্জ বা ব্যাপক জন আন্দোলন বলবে না?

বন্ধু বললেন, মাপ কর ভাই—তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। রাগ না করলে বলি ওসব হুজুক। যাদের ঐসব আন্দোলনে দেখেছি তাদেরই আবার রাজকাপুর ও নার্গিসের দর্শন পাবার জন্য এসপ্ল্যানেডে যানবাহন চলাচল বন্ধ করতে দেখেছি। অথবা ফুটবল ও ক্রিকেটের ময়দানে কুরুক্ষেত্রের নায়ক তাঁরাই। ঐসব আন্দোলনের তথাকথিত গণ সমর্থন যদি হুজুক না হত তাহলে আন্দোলন থেমে যাবার পর ঐসব নরনারীকে দেশের শতবিধ সমস্যার যে কোন একটির সমাধানের জন্য গঠনমূলক কিছু করতে দেখা যেত—যেমন দেখা যেত—যেমন দেখা দিয়েছিল গঠনমূলক কাজের প্রবাহ গান্ধীজী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের ফাঁকে ফাঁকে।

আমি চিন্তান্বিতভাবে বললাম, তা অবশ্য বলা যায়।

বন্ধু বললেন, তা যদি না হত তাহলে সামান্য ছুতোনাতায় কলকাতার পথে-ঘাটে ট্রামবাস পুড়ত না আর অন্যান্য জনসাধারণের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হত না।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, এসব গুণ্ডাদের কাজ। সৎ নাগরিকদের এর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই।

বন্ধু বললেন, মেনে নিলাম এ কথা। কিন্তু মুষ্টিমেয় গুণ্ডাই কি লক্ষ লক্ষ

সৎ নাগরিকের ভাগ্য-বিধাতা হবে—সৎ নাগরিকরা কি এ জাতীয় গুণ্ডাবাজীর প্রতিরোধ করবে না ? আর এ নিষ্ক্রিয়তা কি স্বদেশপ্রেমের দ্যোতক ?

আমি স্বীকার করলাম যে বন্ধুর বক্তব্যে সত্য আছে।

বন্ধু বললেন, কোটি কোটি জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় আর মাত্র মুষ্টিমেয় নেতা ও কর্মী স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ—এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয় এবং এ পরিস্থিতিতে কিছুতেই বলা চলে না যে জাতি হিসেবে আমরা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জনসাধারণ স্বাদেশিকতার কোন্ প্রত্যক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে ?

বন্ধু বললেন, এক নয় অনেক কর্মসূচি হাতে নেওয়া যেতে পারে। একটু চিন্তা করলেই এসব কার্যক্রম চোখে পড়বে। তবে আমি কেবল একটি কর্মসূচির প্রতিই ইঙ্গিত করব—স্বদেশী জিনিস কেনা। খেয়াল করেছ স্বাধীনতার পর বিদেশী জিনিসে বাজার কেমনভাবে ছেয়ে গেছে ? কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন থেকে আরম্ভ করে সাবান, তেল, মাজন পর্যন্ত প্রতিটি নিত্যব্যবহার্য জিনিস আমরা চোখ বুঁজে কিনি বলেই না বিদেশী জিনিসের এত ছড়াছড়ি।

আমি বললাম, অনেক বিদেশী জিনিস ভাল।

বন্ধু বললেন, এটা বহুলাংশ মনের ভ্রম। আর ধর যদি ভাল হয়ও তা না নিয়ে একটু খারাপ হলেও দেশী জিনিস কেনার নামই তো স্বাদেশিকতা। কোন কষ্ট স্বীকার না করে স্বদেশপ্রেমী হওয়া যায় নাকি ?

আমি বললাম, কিন্তু যাই বল আজকের দিনে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করা সম্বন্ধে এতটা গোঁড়ামি আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে খাপ খায় না।

বন্ধু বললেন, জাতীয়তার ভিত্তির উপরেই তো সুস্থ ও সরল আন্তর্জাতিকতা গড়ে ওঠে। জাতীয়তার সম্বন্ধবিহীন আন্তর্জাতিকতা রঙিন বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু না, এরকম অ্যাবস্ট্রাক্ট উদাহরণ না দিয়ে একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিই। আন্তর্জাতিকতার অন্যতম ধ্বজাধারক সোভিয়েট রাশিয়ায় এখনও উচ্চমানের বহুবিধ ভোগ্য উপকরণ তৈরী হয় না—জুতা ইত্যাদি কোন কোন জিনিসের মান ভারতবর্ষের মত শিল্পে অনগ্রসর দেশের চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের। তবু ভারতবর্ষের মত সে দেশে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদেশী ভোগ্যপণ্য যেতে পারে না। রাশিয়া ও চীন যদি অপেক্ষাকৃত বেশী দামী ও নিম্ন মানের হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করাকে ধর্ম হিসাবে নিয়ে থাকতে পারে, তাহলে আমাদের স্বদেশী ব্রতের জন্য লজ্জিত হবার কারণ নেই।

বাঙালী মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ

বাঙলার বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং ভারতের নবযুগের অন্যতম পথিকৃৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্মের ইতিহাস খুব বেশী প্রাচীন নয়। ভারতে ইংরেজের আগমনের পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল বলে মনে হয় না। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টির মূলে একাধিক কারণ কাজ করেছে। প্রথমতঃ বাঙলার জমিদারী প্রথার কথা ধরা যেতে পারে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর বাঙলার আর্থিক জীবনে এক নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল। এঁরা হচ্ছেন জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার ইত্যাদি নানাবিধ মধ্যস্বত্বভোগীর দল। ভূমিকর্ষণকারী কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দেবার ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এদের অবস্থিতি।

মধ্যবিত্তদের দ্বিতীয় ধারার সৃষ্টি হ'ল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বিভিন্ন নীলকর, চা-কর প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং হৌস ও কুঠির কার্যকলাপের সম্প্রসারণের ফলে। এইসব কার্য পরিচালনার জন্য বহুলসংখ্যক কেরানী, বাবু, মুৎসুদ্দি ইত্যাদির প্রয়োজন হ'ল। ফলে বাঙলার একটি বিশিষ্ট অংশ এইসব জীবিকা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিলেন এবং এঁদের ভিতর কেউ কেউ আবার চাকুরী দ্বারা অর্জিত অর্থ নিয়োগ করে জমিদারী ইত্যাদি কিনে প্রথমোক্ত মধ্যবিত্তের সংখ্যার স্ফীতি ঘটালেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ শক্তিশালী হওয়ায় বৃটিশ রাজত্বের পত্তন হ'ল। এর প্রধান কেন্দ্র তখন ছিল বাঙলাদেশ। কলকাতা সে সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ব্রিটিশ রাজদণ্ড পরিচালনা ও তার ভিত্তিমূল দৃঢ় করার জন্য বহুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী প্রয়োজন। সাধারণ শাসন বিভাগ ছাড়াও সামরিক বিভাগেও বাঙালীরা প্রবেশ করলেন। অবশ্য 'বেসামরিক' জাতিরূপে গণ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষ ফৌজী কার্যকলাপে বাঙালীরা অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করেননি; কিন্তু কমিসারিয়েট ও দেশরক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরোক্ষ (non-active) সমরবিভাগীয় চাকুরী নিয়ে বাঙালীরা বাঙলার বাইরে সুদূর পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইস্মাইল

খাঁ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এইভাবে ব্রিটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়াতলেও বেশ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাঙালী মধ্যবিত্তদের পুষ্টি ঘটল।

বাঙালী মধ্যবিত্তদের তদানীন্তন পরিস্ফীতি ও পরিব্যাপ্তিতে অতুলনীয় সহায়তা করল ইংরেজি শিক্ষা। মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ বাঙলার নবযুগ প্রবর্তকবৃন্দের দূরদৃষ্টি এবং উদ্যমের ফলে প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পরিণামে বাঙলার মানসলোকে রেনেসাঁর জন্ম হ'ল। এর সঙ্গে সঙ্গে এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের পরিপুষ্টিরও সহায়ক হ'ল। দেশের রাজা ইংরেজ এবং রাজকীয় কার্যকলাপ পরিচালনার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। অধিকাংশ বণিক ইংরেজ এবং তাই তাদের হৌস ও কুঠির কাজকর্মও ইংরেজিতে চলে। ইংলণ্ড থেকে কেরানী ও বাবুদের কাজের জন্য লোক নিয়ে আসা ব্যয়বহুল। তাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এতদ্দেশীয়দের চাহিদা সরকারী দপ্তরখানায়, বণিকদের কুঠি ও হৌসে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এর ফলে ইংরেজি শিক্ষারও প্রসার ঘটতে লাগল। দুপাতা ইংরেজি পড়লেই সাহেবদের কাছে চাকরী পাওয়া যায় এবং সে চাকরীর মাইনে যাই হোক না কেন, আয় প্রচুর। অতএব ইংরেজি শেখার জন্য হু হু করে স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেবল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং নবীন জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর্ষণই নয়, নিছক আর্থিক লাভের প্রেরণাও যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের মূলে কাজ কাজ করেছে—একথা বললে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ হবে না। প্রত্যুত উপরের মুষ্টিমেয় সুসংস্কৃত মনের অধিকারীদের কথা বাদ দিলে সর্বসাধারণের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মূলে যে এই আর্থিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে একদিকে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী কর্মচারী এবং কুঠিয়াল সাহেবের বাবুরূপে বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং অন্যদিকে শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তাঁরাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তনকে স্ফীতকায় করতে লাগলেন। দেশে ইংরেজি আইনকানুন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদির সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা প্রণালীর জন্য ডাক্তাররাও মধ্যবিত্ত সমাজের এক বড় অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বাঙালী মধ্যবিত্তদের বৃত্তিগত প্রকারভেদ সত্ত্বেও একটি জায়গায় এদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরিত্র-ধর্ম অভিন্ন। মধ্যবিত্তদের

কেউই প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সম্পদ উৎপাদন করেন না। সামাজিক সম্পদ উৎপাদনকারী কৃষক ও শ্রমিকবর্গ দ্বারা উৎপন্ন শ্রমের একাংশ ব্যবস্থাপক বা দালালরূপে গ্রহণ করেই তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একদা তাই এইসব বৃত্তিকে নদীর এক কূল ভেঙে অপর কূল গড়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সংখ্যায় অতীব অল্প বলে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা ইত্যাদি বৃত্তির কথা উল্লেখ না করলেও এঁদের চরিত্র ধর্মও পূর্ণ মাত্রায় মধ্যবিত্ত।

॥ ২ ॥

জন্মের পর থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল পর্যন্ত সময় বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বর্ণযুগ বলা যায়। এই সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্তদের বিজয়রথ ভারতের কোণে কোণে জয়পতাকা উড়িয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিত্ব অবিসম্বাদী ছিল। রাজনীতি এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রেও এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রত্যুত একদা এই শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের জন্যই শোনা গিয়েছিল, "বাঙালী আজ যা চিন্তা করে সমগ্র ভারত আগামী কাল তাই ভাবে।" বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে চরম বিকশিত রূপ, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অভিমতকে কোন মতেই স্তোকবাক্য আখ্যা দেওয়া যায় না।

কিন্তু বিগত তিন চার দশক থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের গৌরব-রবি পশ্চিম গগন-মুখী হতে আরম্ভ করে। প্রথমে এটা চোখে না ঠেকলেও আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে বাঙালী মধ্যবিত্তদের ক্ষয়িষ্ণু রূপ স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর। এই মারাত্মক ক্ষয়কে আর অস্বীকার করার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে যাঁদেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরাই আজ স্বীকার করবেন যে বাঙলার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার ন্যূনতম পুষ্টিকর আহার্য পায় না, তারা প্রায় অর্ধাশনে দিনাতিপাত করছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিগত কয়েক দশকে বাঙালী মধ্যবিত্তদের উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। সব-ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকে, একথা মেনে নিয়ে উপরের উক্তি করা হচ্ছে। রাজনীতির আসরে যে বাঙালী আর ভারতের পথিকৃৎ নেই—এ কথা অন্ধ

বাঙালী-ভক্তকেও আজ মানতে হয় এবং সমাজসেবার ক্ষেত্রেও যে বাঙালী মধ্যবিত্তদের গর্ব করার কোন কারণ নেই, তা আজ আর কারও অজানা নেই। মনে হয় এক কালের চরম প্রগতিশীল ও উন্নত বাঙালী মধ্যবিত্ত আজ যেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোনক্রমে আত্মরক্ষার জন্য কোণ খুঁজছে। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যেই কি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে? ইতিহাসে এমন বহু প্রগতিশীল সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়, যারা কালধর্মে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তদের বর্তমান জীর্ণ দশা কি সেই মহতী বিনষ্টির সূচনা?

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য—বাঙালী মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা হলেও তার পূর্বে বর্তমান ক্ষয়রোগের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করা। রোগের কারণ আবিষ্কৃত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে চিন্তা করা সহজসাধ্য হয়। বিগত তিন-চার দশকের ভিতর বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে, যার প্রভাব বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিকূল হয়েছে।

ভারত তথা বাঙলায় শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। এক-আধজন বাঙালী ধনী সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের বাহন এই ভারতীয় শিল্পবিপ্লবে পুঁজিপতিরূপে অংশগ্রহণ করলেও সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালী অভিজাত সমাজ বাংলার অর্থ-ব্যবস্থাকে সামন্তবাদের পরিবর্তে শ্রমশিল্প-আধারিত করার কোন সচেতন প্রচেষ্টা করেননি এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে বৃহত্তর বাঙালী জাতি এই শিল্পবিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অচেতন বা অজ্ঞ ছিল। আমি শ্রমশিল্পের কারণে উদ্ভূত শ্রমিক-সমাজের দানা বাঁধার ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করছি। নূতন নূতন কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষিত বাবুকর্মচারীদের পদের জন্য উমেদার হওয়া ছাড়া গায়ে খেটে মজুরী করার প্রতি বাঙালীদের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। অথচ যে-কোন আধুনিক শ্রমশিল্প বা ব্যবসায়ে বাবুশ্রেণীর চাকুরিয়ার তুলনায় মজুরের প্রয়োজন বহুগুণ অধিক। তাই বাঙলাদেশ ভারতীয় শ্রমশিল্প ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলেও বাঙলার কলকারখানায় বাঙালী মজুরদের সংখ্যা নগণ্য বলা চলে। এর কারণ খুঁজতে গেলে ইংরেজি শিক্ষার দায়িত্ব অনেকটা এসে পড়ে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্য হ্রাসের সূত্রপাত হল। কলকাতায় রাজধানী থাকার ফলে এতদিন বাঙালীরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অংশেরও অতিরিক্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা এই ক্ষেত্রে পেয়ে আসছিলেন, এবার থেকে তার অবসানের সূচনা হল। কারণ অন্যান্য প্রদেশও এবার ন্যায়সঙ্গত-ভাবে ইংরেজ শাসনের প্রসাদের দাবী জানাতে লাগল। বর্তমান উত্তর-প্রদেশের অংশবিশেষ নিয়ে আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হল এবং দিল্লী রাজধানী হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা এক পৃথক প্রদেশরূপে বাঙলা থেকে আলাদা হয়ে গেল। ঐভাবে আসামও পরে এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পরিগণিত হল। অতএব স্বাভাবিকভাবে ঐসব প্রদেশের চাকরী ইত্যাদি সরকারী সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্য হ্রাস পেল। বাঙালী মধ্যবিত্তকে তাদের মধ্যবিত্ত-সুলভ পেশার জন্য মূলতঃ বাঙলার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। কারণ ক্রমশঃ ঐসব প্রদেশেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল এবং স্বভাবতই তাঁরা ক্ষমতাধিরূঢ় বাঙালীদের নিজেদের মাথা তোলার প্রধান অন্তরায়স্বরূপ দেখতে পেলেন। বাঙলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে তথাকথিত 'বাঙালী বিরোধিতার' একটি মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থার এই পটপরিবর্তন।

অবশেষে এল বঙ্গ-বিভাগ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশ ব্যবচ্ছেদের ফলে পুরাতন বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র এলাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হল এবং এই স্বল্প-পরিসর এলাকায় এল প্রায় বাহান্ন লক্ষ উদ্বাস্তু। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বাঙলাদেশে মহাত্মা রামমোহনের পর থেকে যে নবযুগের সূত্রপাত হয়, তার প্রধান ধারক ও বাহক ছিল বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়। নানা কারণে বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর তাই হিন্দুদেরই একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বাঙলা তথা ভারতের ব্যবচ্ছেদের পিছনে যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা কাজ করেছিল, তাকে প্রেরণা জোগাবার কাজে নব-জাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিরাট অবদান ছিল। যাই হোক বাঙলা বিভক্ত হল এবং পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব উদ্বাস্তু এলেন, এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। এঁরা মূলতঃ ছিলেন ভূমির উপর মধ্যস্বত্বভোগী অথবা মুসলমান ও নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের দ্বারা ভাগচাষ করিয়ে নিজেদের ভরণপোষণ নির্বাহ-কারী। যেসব চাষী উদ্বাস্তু হয়ে এলেন, শীঘ্র পুনর্বাসনের জন্য জমি ও কৃষির অন্যবিধ সুবিধা না পাওয়া ইত্যাদি সরকারী ত্রুটি, অনেক রাজনৈতিক দলের

প্ররোচনা এবং সর্বশেষে দীর্ঘদিন যাবৎ খয়রাতি সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকার পরিণামস্বরূপ কর্মবিমুখতার কারণে এঁরাও অনুৎপাদক পেশা গ্রহণ করলেন। লজেঞ্চুস, বিস্কুট বা আচার-মোরব্বা ট্রেনে ফেরী করা অথবা ফুটপাথে ছোটখাট দোকান করায় কোন জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে অখণ্ড বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ এলাকাকে আজ একরকম সমগ্র বাঙলার মধ্যবিত্তদের পালন-পোষণের ভার সইতে হচ্ছে।

জমিদারী উচ্ছেদ হবার ফলে পশ্চিম বাঙলার মধ্যবিত্তদের উপর আর এক আঘাত এসে পড়েছে। রাজস্ব-আদায় ক্রিয়ার মধ্যবর্তীরূপে যেসব মধ্যবিত্ত জমিদার বা ঐ জাতীয় লোক মধ্যস্বত্বভোগীরূপে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন, তাঁরা বৃত্তিচ্যুত হয়েছেন। সোজাসুজি বেনামী করে বা কোথাও কোথাও কো-অপারেটিভের ছদ্মাবরণে সিলিং অর্থাৎ ভূমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণের আইনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেও এ আর বেশীদিন চলবে না। ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দেবার ফলে জাগ্রত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এখন ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রযত্ন করবেন। দেশের অধিকাংশ ভোটার দরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা ক্রমশঃ এটা বুঝতে শিখছে যে এযাবৎ তারা বঞ্চিত ছিল। তাই তাদের স্বার্থ নিঃসন্দেহেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করবে। অনুরূপ কারণের জন্যই ভাগচাষী আইন ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্ত স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে।

ইংরেজি শিক্ষার কথা সর্বশেষে উল্লেখ করলেও মধ্যবিত্তদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এর দায়িত্ব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চারুচর্চামূলক (academic)। সুতরাং এই শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী পেশা হিসাবে মধ্যবিত্তের বৃত্তি ছাড়া অন্য যে-কোন রকম কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে এই ধরণের পেশার একটা সীমা আছে। অর্থাৎ এ পেশায় যথেচ্ছ কর্মক্ষম নরনারীকে কর্মে নিয়োগ করা যায় না। তাই একদা যে ইংরেজি শিক্ষা মধ্যবিত্তদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে তা-ই তার শ্রীহীনতার কারণ হল। একদিকে যেমন মধ্যবিত্তসুলভ জীবিকার সমৃদ্ধ অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি চাকরী দ্বারা বাবুদের অল্পায়াসে স্বচ্ছল জীবনযাপন ও ইংরেজি-শিক্ষিত মনে শ্রম ও শ্রমিকদের প্রতি ঘৃণা বাঙলার কৃষক ও মজুর সমাজের ভিতর ভদ্রলোক হয়ে মাটি-কাদার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাজ করার উপায়স্বরূপ ইংরেজি

শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তদের আনুপাতিক হার বেড়েই চলেছে।

এক শতাব্দীরও অধিক পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার পর থেকে বাঙলাদেশে প্রচণ্ড গতিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। স্বাধীনতার পর একাধিক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বাঙলাদেশে বর্তমানে বোধ হয় এমন কোন মহকুমা নেই যেখানে একটি কলেজ নেই এবং প্রতিটি থানায় একাধিক উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এক কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতী পোস্ট গ্রাজুয়েট থেকে আরম্ভ করে স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যন্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হন। এ ছাড়া অন্ততঃ এর দেড়গুণ বেশী ছাত্র-ছাত্রী এইসব পরীক্ষায় ফেল করেন অর্থাৎ প্রতি বৎসর এই কয়েকলক্ষ যুবক-যুবতী মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ডতম সমস্যা—শিক্ষিত বেকারদের বিশাল বাহিনীর পরিপুষ্টি সাধন করেন। একথা নিশ্চয় বলাই বাহুল্য যে শিক্ষিত বেকারের আদমশুমারীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ১৯৫৮ সালের ২৯শে নভেম্বর বাঙলার বিধানসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী জানান যে পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে মোট বেকারের সংখ্যা ১১ লক্ষ। এর ভিতর এক-মাত্র কলকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে মধ্যবিত্ত বেকার ২,৪৯,৯০০ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বেকার ২,১৫,১০০ জন। গ্রামাঞ্চলের পূর্ণ ও আংশিক বেকারদের সংখ্যা সরকারের দপ্তরে নেই। আর শ্রমমন্ত্রী প্রদত্ত পরিসংখ্যানও নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ। কারণ সরকারের কাছে একমাত্র এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যাঁরা চাকরীর জন্য নাম লিখিয়েছেন, খুব সম্ভব তাঁদেরই হিসাব রয়েছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো নেই, এমন বহু বেকারও বাঙলাদেশে রয়েছেন। বেকার সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের আর একটি তথ্যের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একমাত্র সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করার পরও পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে বেকারের সংখ্যা যথাপূর্বং রয়ে যাবে একথা পরিকল্পনা প্রণেতাগণ সখেদে স্বীকার করেছেন। নিত্য-বর্ধমান জনসংখ্যাকে এর জন্য তাঁরা দায়ী করলেও এ স্বীকৃতিতে সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। যাই হোক বর্তমানের এই বহু লক্ষ বেকারের সঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় বা পৌনে দুই লক্ষ মধ্যবিত্ত চারিত্র-ধর্ম বিশিষ্ট শিক্ষিত বেকারদের জন্য মধ্যবিত্তসুলভ কর্মের সংস্থান করা বর্তমান সরকার তো দূরের

কথা, যে-কোন সরকারের সাধ্যাতীত। পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় কল-কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত কর্ম-নিয়োগ ক্ষমতা এবং সরকারের শক্তি যোগ করলেও প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রেখে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ এ জাতীয় অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিলেও কোন কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনৈতিক দলসমূহের এরকম অসম্ভব প্রতিশ্রুতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন না।

ক্রমবর্ধমান স্কুল-কলেজের দ্বারা শিক্ষিতের অতি-উৎপাদন হবার ফলে আর একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে যেমন অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তসুলভ চাকুরীর সংখ্যার তুলনায় কর্মপ্রার্থী মধ্যবিত্তের সংখ্যা বহুগুণ অধিক, অন্যদিকে তেমনি মজুরদের তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরিয়াদের বেতনহার বৃদ্ধির পরিমাণও কম। এর সঙ্গে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম যুক্ত হবার ফলে মধ্যবিত্তদের অবস্থা জাঁতিকলে পিষ্ট মূষিকের মত। মধ্যবিত্তদের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিভাষায় যাকে 'বার্গেনিং পাওয়ার' বলে, মধ্যবিত্তদের ভিতর তার স্বাভাবিক স্বল্পতা এসেছে। একটি কর্মখালি হলে মালিক পক্ষ যদি হাজার দরখাস্ত পান, তাহলে কীসের জন্য ঐ পদপ্রার্থীর বেতন বৃদ্ধি করতে যাবেন? অর্থাৎ যখন মধ্যবিত্তদের সংখ্যা কম ছিল, তাঁরা কৃষক ও শ্রমিকদের কাঁধে বসে যা পেতেন তাতে সচ্ছলভাবে চলে গেলেও এখন ভাগীদার অনেক হওয়ায় কারও আর পেট চলছে না।

॥ ৩ ॥

মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে এইবার বিবেচনা করে দেখা যাক যে গত তিন চার দশক কালের মধ্যে উপরিউক্ত যেসব কারণের জন্য বাঙালী মধ্যবিত্তদের গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়া আরম্ভ করে, ভবিষ্যতে তার সমাধানের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? কারণ রোগের মূল যথাপূর্ব রয়ে গেলে রোগীর আরোগ্যলাভ করার সম্ভাবনা থাকে না।

কিছুদিন যাবৎ বাঙালী যুবকরা কিছু কিছু করে কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজ করা শুরু করলেও সমগ্র বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে এখনও নিজেদের শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত করার তেমন কোন সচেতন আগ্রহ দেখা

দেয়নি। এত আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বাঙলাদেশে অবাঙালী মজুরদের মোট সংখ্যা বা এমনকি আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কেবল কলকাতা, হাওড়া বা আসানসোলের মত শ্রমশিল্প কেন্দ্র এবং তার উপকণ্ঠ এলাকাই নয়, বাঙলার সুদূর পল্লী অঞ্চলেও অবাঙালী শ্রমিকরা ক্রমশঃ অধিকসংখ্যায় সমবেত হচ্ছেন। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ইত্যাদি বাঙলার পশ্চিম দিকস্থ জেলাসমূহে ধান রোপণ ও কাটার সময় বিহারের সংলগ্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক গিয়ে কাজ করে থাকেন। বস্তুতঃ বাঙলার ঐসব এলাকার কৃষিকর্ম এইসব বিহারাগত শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল—একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। রেল স্টেশন থেকে দশ-বার মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার একেবারে গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ডের রাস্তা তৈরীর কাজে শত শত মধ্যপ্রদেশীয় নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের কাজ করতে দেখেছি। স্মরণ রাখতে হবে যে এ কাজের ঠিকাদাররা বাঙালী হলেও তাঁরা অবাঙালী মজুর নিয়োগ করেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শোনা যাবে যে প্রথমতঃ বাঙালী মজুরের অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙালী মজুররা বেশী পারিশ্রমিক নিলেও কাজ করে অপেক্ষাকৃত কম। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ইদানীং বাঙালী মাঝি, মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত ইত্যাদির সংখ্যা হাতে গুণে বার করা যায়। এসব বৃত্তির অধিকাংশই এখন অবাঙালীর হাতে। রিক্সাচালকের পেশায় উদ্বাস্তুরা কিছু সংখ্যায় আত্মনিয়োগ করলেও পশ্চিম দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির মফস্বলের ছোট ছোট শহরেও এ কাজ মূলত অবাঙালীদের হাতে।

বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রমুখ বাঙলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সরকারী চাকরী বা লাইসেন্স, পারমিট, কনট্রাক্ট ইত্যাদি সরকারী প্রসাদপুষ্ট পেশায় বাঙালীদের প্রাধান্যলাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই। ঐসব প্রদেশের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তরা সর্বশক্তি প্রয়োগে এ প্রচেষ্টায় বাধা দেবেন; কারণ এর সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কিছুসংখ্যক চাকরী জনসংখ্যার অনুপাতে পেলেও বাঙালী মধ্যবিত্তদের বিপুল চাহিদার তুলনায় তা নগণ্য। বাঙালী ছাত্ররা যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না, এ তো সকলেই জানেন। আর পারলেও এতে কয়জনের সমস্যার সমাধান হবে?

অদূর ভবিষ্যতে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু মধ্যবিত্তরা সেখানে ফিরে

যেতে পারবেন, এরকম কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং পূর্ববঙ্গে যে কয়জন হিন্দু মধ্যবিত্ত আছেন, তাঁদের এদিকে চলে আসার আশঙ্কাই অধিক। আর কোন মতে মাটি কামড়ে থাকার কথা ভাবলেও সেখানে মধ্যবিত্তরূপে তাঁদের বাঁচায় পথ কোথায়? পূর্ববঙ্গ সরকারও ক্রমশঃ কৃষি থেকে মধ্যস্বত্ব বিলোপের ব্যবস্থা করছেন এবং এইসব আইনের প্রথম শিকার হবেন হিন্দু মধ্যবিত্তরা।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা আর পুনঃপ্রবর্তিত হবে না এবং ভাগচাষী ও জমিতে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্ম করে ফসল উৎপাদনকারী কৃষি শ্রমিক ইত্যাদিদের অধিকারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যে-কোন দলের সরকারকে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রগতিশীল আইনকানুন তৈরী করতে হবে।

পূর্বেই দেখান হয়েছে যে উৎপাদনমূলক শ্রমের সম্পর্ক-রহিত কেবল চারু-চর্চামূলক জ্ঞানাধারিত আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অতি-অনুশীলনের ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এ সংখ্যা হ্রাসের কোন উপায় নেই।

বাঙলার বৃহৎ ব্যবসায়-বাণিজ্য যে অবাঙালীদের করায়ত্ত—একথা সর্বজন-বিদিত। অদূর ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্যের কোন আশা নেই। মূলধন, অভিজ্ঞতা এবং সংগঠন শক্তির অভাব ও এক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থ শীঘ্র বাঙালীকে এখানে মাথা তুলতে দেবে না। ছোটখাট দোকান বা ব্যবসায়ের অবস্থাও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। শহরাঞ্চলের কথা বাদ দিলেও পল্লীবাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে এইসব ব্যবসায় ক্রমশঃ অবাঙালীদের কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে, তা চোখে পড়ছে।

তাহলে কঃ পন্থা? এইবার একটি নিষ্ঠুর সত্য উচ্চারণ করতে হবে। কথাটি যতই অপ্রিয় হোক এবং উটপাখির মত অলীক আশার বালুকাস্তূপে মুখ গুঁজে যথার্থ অবস্থাকে যতই আমরা অস্বীকার করার চেষ্টা করি না কেন, নগ্ন সত্য হচ্ছে এই যে মধ্যবিত্ত হিসাবে বাঙালী মধ্যবিত্তের সামনে কোন ভবিষ্যৎই নেই। অর্থনীতির বর্তমান রূপ বজায় থাকলে সংখ্যার অতিবৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্তদের জীবনরসের অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। উৎপাদক শ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক-মজুররা অধিকতর পরিমাণে শোষণের ভার সহ্য করতে অপারগ। আর উৎপাদকরা যদি মার্কসীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাহলে তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরিয়া

হয়ে অবশেষে ধনিকদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদেরও কাঁধ থেকে ফেলে দেবে। দ্বিতীয় পন্থাতেও মধ্যবিত্তদের নিষ্কৃতি নেই—শ্রেণীসংগ্রামের রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রবাহে তাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে। অর্থাৎ মহাকাল মধ্যবিত্ত বাঙালীর কপালে মৃত্যু-পরোয়ানা অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

কিন্তু কোন ভবিষ্যৎই নেই কি? আছে, তবে তা মধ্যবিত্ত হিসাবে নয়। মধ্যবিত্তদের শ্রমিক সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ গান্ধীজী যাকে শ্রেণী পরিবর্তন বলতেন, বাঁচতে হলে মধ্যবিত্তদের সামনে তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা আজ আর মুষ্টিমেয় আদর্শবাদ-পাগলদের অলস কল্পনার বিষয় নয়; কালের দাবী এ। আর সমাজে যদি একটিমাত্র শ্রেণী থাকে, তবে নিঃসন্দেহেই তা হবে উৎপাদকদের শ্রেণী। কারণ এই একটিমাত্র শ্রেণীরই অন্য-নিরপেক্ষভাবে জীবিত থাকার ক্ষমতা আছে। তাই মধ্যবিত্তদের সময় থাকতে প্রাচীরের লিখন পাঠ করে নিজেদের ভিতর যুগোপযোগী পরিবর্তন সংসাধন করতে হবে। মজুর হওয়া এখন আর কোন দয়াদাক্ষিণ্য দেখানর ব্যাপার নয়, নিছক জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই আজ মধ্যবিত্তদের শ্রমিক সমাজে বিলীন হতে হবে। প্রসিদ্ধ গান্ধীপন্থী মনীষী ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথায় বলতে গেলে, "মধ্যবিত্তদের সম্মুখে এবার কর্তব্য নির্ধারণের অন্তিম লগ্ন সমুপস্থিত। কাপড় চোপড় নোংরা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাঁরা যদি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে উৎপাদনমূলক শ্রম থেকে দূরে থাকেন, তবে যে ধোপ-দুরস্ত কাপড় বাঁচাবার জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, তাঁদের সে কাপড় তাঁদেরই শরীরের রক্তে লাল হয়ে যাবে। নিজের রক্তপাত করার চেয়ে মাটি কাদা মাখা নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য।"

গান্ধী-শিষ্য বিনোবাজী তাঁর ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন দ্বারা মধ্যবিত্তদের এক মহৎ উপকার সাধন করছেন। বর্তমান ভারতে কেবল বাঙালী মধ্যবিত্ত নয়, সমগ্র দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে বিনোবাজীর চেয়ে বড় সুহৃদ আর কেউ নেই, প্রেম ও শান্তির পথে তিনি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূদান, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান ও শ্রমদান ইত্যাদি কার্যক্রম দ্বারা একদিকে শ্রেণীসংঘর্ষমূলক হিংস্র আন্দোলনের সম্ভাবনা লোপ করে মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব

রক্ষা করার পথ করে দিচ্ছেন এবং অন্যদিকে মধ্যবিত্তদের ধীরে, ধীরে স্বীয় জীবন পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছেন। অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে মধ্যবিত্তদের পক্ষে এক ঝটকায় শ্রমিক হওয়া অসম্ভব। গ্রামদানের পথে কুড়ি ভাগের এক ভাগ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আনার কার্যক্রম থাকায় মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনপরিবর্তনের জন্য বেশ কিছুটা সুযোগ পাচ্ছে। ইতিহাস এর চেয়ে বেশী সুযোগ মধ্যবিত্তদের দেবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য মধ্যবিত্তদের স্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়েছিল, মজুর হয়ে তা কি বিসর্জন দিতে হবে? তা ছাড়া মধ্যবিত্তদের দ্বারা সংস্কৃতির চর্চা হবার ফলে মানব সভ্যতাও তো এক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। সবাই মজুর হলে সভ্যতার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হবে না কি? এর জবাবে বলা হবে যে গান্ধীজী কর্তৃক কল্পিত মজুর আজকের শ্রমিকদের মত বুদ্ধিচর্চার সম্পর্করহিত হবে, একথা ধরে নেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমজীবী নামক দুটি কৃত্রিম শ্রেণীর বিভাজন বিলুপ্ত করে বুদ্ধিযুক্ত শ্রমিকের এক শ্রেণী প্রবর্তন করা। আজকের শ্রেণীবিভাজনকে এই জন্য কৃত্রিম বলা হচ্ছে যে এ প্রথা প্রকৃতিধর্ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির এক অলঙ্ঘ্য নিয়মই হচ্ছে এই যে প্রকৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে স্বতঃই বর্জন করে। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী নামক দুই শ্রেণী যদি প্রকৃতির কাম্য হত, তাহলে প্রকৃতি এক দল মানুষকে কেবল মস্তিষ্ক দিয়ে এবং অপর দলকে পেশী দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাত। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তির মস্তিষ্ক ও পেশী থাকার অর্থই হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেরই উভয়বিধ বৃত্তির বিকাশ সাধন করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এই বৃত্তিদ্বয়ের বিকাশের পারস্পরিক হারে মানুষের ভিতর উনিশ-বিশের তারতম্য হতে পারে; কিন্তু দুটিকে একেবারে আলাদা করে দেওয়া প্রকৃতির ধর্ম নয়। বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ গান্ধীজী প্রকৃতির এই মূল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তাঁর নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা বা নঈ-তালিমের প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে অনেক জায়গায় গান্ধীজীর নাম দিয়ে যেসব বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলছে, তা দেখে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের বিরূপ সমালোচনা করলে চলবে না। এগুলি আদর্শের বিকৃতি। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল উৎপাদনমূলক কর্মের মাধ্যমে শিশুকে জ্ঞানদান করা এবং শিক্ষাকাল থেকেই সহযোগিতামূলক জীবন-চর্যার মাধ্যমে তাকে এক শোষণবিহীন অহিংস সমাজের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সরকার গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনার এই সামাজিক বিপ্লব সংসাধনের

আদর্শ গ্রহণ না করে কেবল তার বাহ্য কাঠামোকে স্বীকার করায় এই বিকৃতি দেখা দিয়েছে। ফলে সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চারুচর্চামূলক শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা—এতদুভয়ের কোন সদ্‌গুণই পায়নি, উভয়ের ত্রুটিই এর মধ্যে দানা বাঁধছে। গান্ধীজী চারুচর্চামূলক নিছক জ্ঞানানুশীলন এবং বৃত্তিমূলক 'কেজো' শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে মস্তিষ্ক ও পেশীর যুগপৎ সমান স্ফুরণের জন্য তিনি কর্মের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছিলেন। উপযুক্ত কল্পনাশক্তি ও নিষ্ঠাযুক্ত কর্মীর অভাবে এযাবৎ এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখযোগ্য প্রগতি হয়নি। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাহায্যে তাঁর নঈ-তালিমের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করার দ্বারা সুসংস্কৃত মানুষ গড়ার কর্তব্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করার ব্যাপারে মধ্যবিত্তরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

গান্ধীজী কথিত বিকেন্দ্রিত অর্থনীতিও মধ্যবিত্তদের পক্ষে খুবই অনুকূল হবে। প্রথমতঃ বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বর্তমান ভারতে একমাত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্পভিত্তিক অর্থব্যবস্থারই আছে। ভারতের মত দ্রুত বর্ধনশীল দেশে ভূমি ও পুঁজির মাথাপিছু পরিমাণ এত অল্প বলে অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা বা রাশিয়ার মত বৃহৎ যন্ত্রশিল্প আধারিত অর্থব্যবস্থা গড়া এখানে সম্ভব হবে না এবং সম্ভব হলেও তা সমীচীন হবে না। যাই হোক, বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থার মূলাধার কুটিরশিল্পে কাজ করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন। তাই মধ্যবিত্তদের জীবিকান্বেষণ এবং শ্রেণীপরিবর্তন—উভয় দৃষ্টি থেকেই বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি অত্যন্ত সহায়ক পরিগণিত হবে। কুটিরশিল্পের দ্বারা কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজির প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম বলে বহু মধ্যবিত্ত স্বনিযুক্ত (self-employed) কারিগর হিসাবে স্বাধীনভাবে উদরান্নের সংস্থান করতে পারবেন।

সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করলে গান্ধী-পন্থা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন আশা-ভরসার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। যুগোপযোগী মানসিক পরিবর্তন তাঁদের ভিতর এসেছে কি—এই প্রশ্নটি বাঙালী মধ্যবিত্তদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সামনে উত্থাপন করে বক্তব্যের ইতি করা হল।

বাঙলা, বাঙালী ও বিপ্লব

"তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে"—এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা এই পোড়া বঙ্গবাসী আজ যেন মর্মে মর্মে অনুভব করছেন। একবার নয়, কয়েকবারই তাঁরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে যুক্তফ্রন্ট তথা বামফ্রন্টকে জয়যুক্ত করেছিলেন এই আশা নিয়ে যে অন্ততঃ তাঁদের সমস্যাগুলির সমাধানের একটা মোটামুটি উপায় দেখা দেবে এবং একটি কাজচলা গোছের সৎ ও দক্ষ প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সে আশায় ছাই পড়েছে। তবে এর জন্য ক্ষোভ করে লাভ নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গে যে জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তার পরিণতি এর চেয়ে ভাল হবে আশাও করা যায় না। আমরা অবশ্য একথা বলছি না যে কোয়ালিশন চলতে পারে না। কোয়ালিশন সরকার সংসদীয় রাজনীতির অন্যতম স্বীকৃত সাধন এবং মোটামুটি সমভাবাপন্ন দল নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কোয়ালিশন চলছে ও ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু কয়েকটি দল মনে করে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতিতে জনগণের কল্যাণ সাধন করব, আর কয়েকটি দল মনে করে 'যুক্তফ্রন্ট সরকার, সংগ্রামের হাতিয়ার'—এ জাতীয় কোয়ালিশন বেশীদিন চলতে পারে না।

কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি হল জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সংখ্যাধিক্যের বলে লোকসভা বা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা যেসব কর্মসূচিকে জনকল্যাণকর বলে মনে করেন তার অনুকূল আইন রচনা করা এবং স্থায়ী প্রশাসন যন্ত্রের দ্বারা তার রূপায়ণ। এই স্থায়ী প্রশাসন যন্ত্র বা আমলাদের নিরপেক্ষ এবং জন-প্রতিনিধিদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা স্বীকৃত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের রূপায়ণ করতে হবে—সংসদীয় রীতির এটা একটা অপরিহার্য শর্ত। পক্ষান্তরে সরকারকে যাঁরা সংগ্রামের হাতিয়ার বা বিপ্লবের সাধন বলে মনে করেন তাঁদের কাছে প্রশাসন যন্ত্রের নিরপেক্ষতা এক বুর্জোয়া বিলাস যা বর্তমানে বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতিয়ার। আর লোক সভা বা বিধানসভায় (এবং এমনকি নিজেদেরই গড়া ফ্রন্টের মধ্যে) সংখ্যা গরিষ্ঠ হবার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা বা প্রয়াস চালানর মত সময় তাঁদের

নেই। তাছাড়া এ জাতীয় বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রে তাঁদের আস্থাও নেই। একমাত্র তাঁরাই ডায়লেকটিকসের সহায়তায় ইতিহাসের গতিপথ যথাযথ বুঝেছেন এবং একমাত্র তাঁরাই হলেন অনিবার্য ভবিতব্য—কমিউনিস্ট সমাজের অগ্রদূত বিপ্লবী। সুতরাং যে-কোন মূল্যে ও যে-কোন উপায়ে তাঁদের মত ও পথকে তাঁরা মূর্ত করবেনই। আর যাঁরা এর বিরোধিতা করবেন তাঁরা শ্রেণী-শত্রু, পুঁজিপতি ও জোতদারের দালাল, শোধনবাদী, অ্যাংলো-মার্কিন (এবং ক্ষেত্রবিশেষে সোভিয়েট) সাম্রাজ্যবাদের দালাল—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দুই বিপরীতধর্মী প্রবণতা নিছক কংগ্রেসবিরোধী মানসিকতারূপী কমজোর সাধারণ সূত্রকে অবলম্বন করে জোট বাঁধলে যা হয় পশ্চিমবঙ্গের দুই যুক্তফ্রন্ট তারই জ্বলন্ত নিদর্শন। বিশেষ যখন আজ দেখা যাচ্ছে যে আত্মকলহে জর্জর কংগ্রেসী জুজুর নখ-শিং-দাঁত ভোঁতা, নড়বড়ে। সুতরাং আজকের অবস্থার জন্য বোধ হয় বিশেষ হা-হুতাশ করার কারণ নেই।

॥ ২ ॥

তাহলে কি এই অবস্থাই চলবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার সাধ্য বর্তমান লেখকের নেই। কারণ তিনি জ্যোতিষী নন। তবে আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে এ অবস্থা চলা উচিত নয়—বঙ্গবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য চলা বাঞ্ছনীয় নয়।

তবে কি কংগ্রেসী শাসন ফিরে আসার কথা বলছি? আমি বললেও বিগত বিধানসভার দলীয় চেহারা যা ছিল তাতে তা সম্ভব হত না। আর নূতন করে কোন নির্বাচন হলেও কংগ্রেস আবার অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে বলে মনে হয় না। এর যেটুকু সম্ভাবনা ছিল দুই কংগ্রেসের জ্ঞাতি বিবাদে তা উবে গেছে এবং তা ছাড়া বাঙালী সমাজের প্রবল একাংশ বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ ও আশাহত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না যার দ্বারা শতকরা ন-দশটি অতিরিক্ত ভোট পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আদি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নব কংগ্রেসীরা যতই সমাজবাদী নীতির দোহাই দিন না কেন তাঁদের বহুসংখ্যক অনুগামীদের আচার-আচরণে সমাজবাদী মূল্যবোধের ছোঁয়া নেই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে কিছুটা হৈ-চৈ হলেও এই দলের কর্মসূচি অথবা তাকে রূপায়ণের পদ্ধতির ভিতর এমন কোন মৌলিকত্ব

নেই যা মূল কংগ্রেসের ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহী কংগ্রেসের সমাজবাদনিষ্ঠার ঘোষণার প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া যায় না। তাছাড়া কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও দল নিয়ে কংগ্রেস যদি কোনক্রমে ক্ষমতাসীন হয়ও তবু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে তাঁরা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যা করেছেন তার বেশী খুব একটা কিছু করতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করার কারণ নেই। সুতরাং সেই জোড়াতালির অবস্থাই চলবে।

তাহলে কি মিনি ফ্রন্টের সুপারিশ করা হচ্ছে? একদা কেরলের মত এখানেও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট এবং তাঁদের সহযাত্রীদের বাদ দিয়ে মিনি ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়া অসম্ভব নয়। আর কেরলের সে মিনি ফ্রন্ট সরকারের মত প্রশাসন চালাবার ব্যাপারে সিরিয়াস হলে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট বা যুক্তফ্রন্ট সরকারের চেয়ে দক্ষ ও অপেক্ষাকৃত অধিকতর জনকল্যাণ-সাধনকারী সরকার পশ্চিমবঙ্গেও চলতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাসমূহের মৌলিক সমাধান করার ক্ষমতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট বর্জিত সেই মিনি ফ্রন্ট সরকারের থাকবে বলে মনে হয় না।

এইখানে পশ্চিমবঙ্গের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত হওয়া উচিত হবে। বর্তমান লেখকের মতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম মৌলিক সমস্যা হল ক্ষুধা।

ক্ষুধার মূলে রয়েছে বেকারত্ব। কংগ্রেসী শাসনে বেকারত্ব দূর করার জন্য বৃহৎ যন্ত্রশিল্প এবং সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের অনুৎপাদক বিস্তৃতির উপর মিথ্যা ভরসা করা হয়েছিল। বামফ্রন্ট এর উপর আরও কয়েকটি মিথ্যা আশা যোগ করেছে। এর অন্যতম হল বেকারভাতা দেওয়া এবং এটাও নাকি নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সাহায্যরূপী মরীচিকার উপর। এই মরীচিকা স্বভাবতঃই অদৃশ্য হবে এবং তখন কেন্দ্রীয় সাহায্যের অভাবে বেকারভাতা প্রবর্তন না করতে পারার জন্য 'কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রে'র আবিষ্কার করে কেন্দ্রীয় সরকার দখলের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার রাজনৈতিক সুবিধা হয়তো বামফ্রন্টের কোন কোন দল পেতে পারে। কিন্তু তাতে বেকার বাঙালী যুবক-যুবতীদের পেটে একমুঠো অন্ন পড়ার কোন ব্যবস্থা হবে না। পশ্চিমবঙ্গে ছোটবড় সব কলকারখানায় নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা আট লক্ষের মত এবং স্বাধীনতার বাইশ-তেইশ বছরে শিল্পায়নের গতি বহুল পরিমাণে বাড়লেও এর দ্বারা কর্ম সংস্থান হয়েছে মাত্র আড়াই লক্ষ লোকের। ১৯৬৯ সালে বিধানসভায় শ্রমম

বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে রেজিস্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যাই পাঁচ লক্ষ এবং বেকারের আসল সংখ্যা অনেক বেশী। এই পরিসংখ্যানগুলি বিবেচনা করলেই বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের উপর পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ভরসা করা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হবে।

দ্বিতীয় প্রচলিত সমাধান-পন্থা হল টেস্ট রিলিফ বা গ্রাটুটাস রিলিফ এবং সরকারী বিভাগের বিস্তৃতিরূপী অনুৎপাদক পদ্ধতি। খয়রাতি সাহায্য দিয়ে বাঙালীকে ভিখারীর জাতে পরিণত করার নৈতিক সর্বনাশের কথা যদি আপাততঃ ভুলেও যাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বের অবস্থা বিবেচনা করে কোন সরকারের পক্ষেই এর জন্য ব্যয়-বরাদ্দ আর খুব বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়— বিশেষ করে সরকারী কর্মচারীরূপী বুলবুলি বাহিনীর তোয়াজ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব খাতে আমদানির একটা মোটা অংশই যখন ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। অনুৎপাদক সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং তাঁদের বেতন ও ভাতাবৃদ্ধিতে বামফ্রণ্টের কোন কোন দলের রাজনৈতিক স্বার্থ থাকতে পারে এবং আছেও। কিন্তু সমগ্র বাঙালী সমাজের তাঁরা এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং তাই জনসাধারণের অর্থে এই অনুৎপাদক শ্রেণীর ব্যাপ্তি ও পরিপুষ্টি নিরর্থক।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও পরবর্তীকালে বামফ্রণ্ট সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অলীক আশার মধ্যে ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভূমিকা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্ততঃ গ্রামাঞ্চলে এর ফলে প্রবল প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভূমিও পুনর্বণ্টন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এর দ্বারা সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এই আশার মূল্য কতটুকু? ধরে নেওয়া যাক যে পূর্বতন আমলে জমির সিলিং আইন ফাঁকি দিয়ে অনেক জমি বেনামী করা হয়েছিল। কিন্তু চরম আশাবাদীও একথা মনে করেন না যে মোট ছ লক্ষ একরের বেশী জমি এভাবে বেনামী করা হয়েছে। এর সঙ্গে পূর্বতন আমলে সরকারের ন্যস্ত দেড় লক্ষ একর জমির হিসাবও ধরা হল যা কংগ্রেসী সরকার ভূমিহীনদের বিতরণ করেননি নি বা করতে পারেননি। সুতরাং বর্তমান সিলিং আইনের দ্বারা মোট সাড়ে সাত থেকে আট লক্ষ একর জমি সরকার পেতে পারেন যা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে বা হবে। আরও ধরে নেওয়া গেল যে সিলিং-এর পরিমাণ মাথাপিছু না করে পরিবার-পিছু করা হল, এর পরিমাণ পঁচিশ একর থেকে কমিয়ে বিশ বা পনের একর করা হল এবং আইনের অন্যান্য ফাঁক ও ক্রটিও দূর করা হল। এর দ্বারা আরও দশ লক্ষ একর বেশী জমি সরকার ভূমিহীন-

দের মধ্যে বিতরণ করতে পারবেন বলে কোন চরমতম বামপন্থী কৃষক-আন্দোলনের নেতা মনে করেন না। সুতরাং চরমতম প্রগতিশীল ভূমি-সংস্কার আইন করে তাকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করলেও মোট সাড়ে সতের বা আঠার লক্ষ একরের বেশী জমি সরকার ভূমিহীনদের জন্য পাবেন না। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষী ও নামমাত্র জমির মালিক সহ ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। সুতরাং গড়ে আধ একরের কিছু বেশী জমি ভূমি-ক্ষুধায় জর্জর পরিবারেরা পেলে তাদের পেটের ক্ষুধা কতটা এবং কত দিন মিটবে তা সহজেই অনুমেয়।

॥ ৩ ॥

তাহলে বাঙালীর ক্ষুধা মেটাবার উপায় কি? অতীতে প্রাদেশিকতার নাম নিয়ে এবং বর্তমানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 'বিপ্লবী' জিগির তুলে পশ্চিমবঙ্গের সব সমস্যার জন্য কেন্দ্রকে দায়ী করা হয় ও মনে করা হয় কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে অবিচার করছে তার নিরসন হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কেন্দ্রের যাবতীয় নীতি ষোল আনা ন্যায়সঙ্গত, এমন কথা বলা হচ্ছে না। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যাঁদের যাতায়াত আছে এবং সেখানকার সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক কর্মী ইত্যাদিদের পরিচয় পাবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে তাঁরাই জানেন যে ভারতের সব কটি প্রদেশেই পশ্চিমবঙ্গের মত কেন্দ্রের প্রতি তার তথাকথিত অবিচার ও অত্যাচারের জন্য অল্পাধিক ক্ষোভ রয়েছে। এ অসন্তোষ কেবল পশ্চিমবঙ্গের একচেটিয়া নয়। এর থেকে একথা বোঝা যায় যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বাঙালীর সমস্যার বাস্তব কোন সুরাহা হবে না।

অবশ্য এমন কোন কোন চরমপন্থীও আছেন যাঁরা মনে করেন যে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের চা পাট কয়লা ইত্যাদির আয়ে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা যায়। কিন্তু প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছাড়াও নিছক আর্থিক দিক থেকেও এ পরিকল্পনা যে নিছক আত্মঘাতী উন্মাদের ব্যবস্থাপত্র, একথা যে-কোন যুক্তিশীল ব্যক্তি কিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই বুঝবেন। তাই এই সম্ভাবনার কথা বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে না।

সুতরাং ঘুরেফিরে আবার সেই প্রশ্ন—ততঃ কিম্?

বর্তমান লেখকের মতে বিপ্লব ছাড়া অন্য কোন প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়।

এইখানে 'বিপ্লব' বলতে কি বোঝাতে চাইছি তা খুলে না বললে ভুল বোঝার অবকাশ আছে। বিপ্লব বলতে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্বন্ধে পরিবর্তন আনার জন্য নকশালপন্থীরা বন্দুকের নলকেই শক্তির একমাত্র উৎস মনে করে যে সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের কথা বলেন তা বোঝানো হচ্ছে না। অথবা সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে যেসব মার্কসবাদী সংসদীয় পন্থা গ্রহণ করেছেন তাঁদের অন্তিম শরণ শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিও ইঙ্গিত করা হচ্ছে না। কিংবা উভয় কংগ্রেস, প্রজাসমাজবাদী অথবা সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদের মত গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের আইন ও প্রশাসন যন্ত্রের সাহায্যে সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার কথাও বলা হচ্ছে না। কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সর্বহারাদের শ্রেণীসংগ্রাম অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রদের ভোটের শক্তিতে তাঁদের কল্যাণের জন্য বিধিবিধান রচনা ইত্যাদি সবই—একটি লক্ষ্যসাধনের উপায় বা প্রক্রিয়া মাত্র—স্বয়ং এগুলি কোন লক্ষ্য নয়। বিপ্লব বলতে এখানে মূল লক্ষ্য এবং তার ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন বোঝানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ কোন্ মূল লক্ষ্য এবং ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন বা বিপ্লব চাই এবারে তার আলোচনা করা হবে।

একটু ধীরভাবে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে যে সাধ্যমত পশ্চিমবঙ্গে যতই শিল্পায়ন হোক না কেন—যতই বড় বড় কল কারখানা গড়ে উঠুক বাঙালীর বেকার সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। 'সাধ্যমত' শব্দটি দ্বারা এখানে একদিকে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি, কলকব্জা ও কারিগরী জ্ঞান পাওয়ার সম্ভাব্যতা এবং অন্যদিকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠার বা নূতন করে পুঁজি বিনিয়োগ করার উপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ইত্যাদি সব কিছু বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ এইসব বাস্তব সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতটা শিল্পায়ন সম্ভবপর। সুতরাং আগামী বিশ-ত্রিশ বা চল্লিশ বছর পর্যন্ত কৃষিই হবে আজকের মত বাঙালীর প্রধান উপজীবিকা। সুতরাং বাঙালীর কর্মশক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি, সংগঠনশক্তি ও পুঁজিরও অধিকাংশ কৃষিতে নিয়োগ করতে হবে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম—আ৷ একরেরও কম। রাশিয়া, আমেরিকা অথবা চীনের তুলনায় এ পরিমাণ

অবিশ্বাস্য রকমের কম এবং এমনকি ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের তুলনায়ও কম। অথচ জমির উপর চাপ বাড়ছে ছাড়া কমছে না। এই স্বল্প পরিমাণ জমিতে নিবিড় (intensive) চাষ করলেও শুধু এর উৎপাদনে কারও ভরণ-পোষণ চলা সম্ভব নয়। সুতরাং নিবিড় চাষের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীকে ফলের চাষ, পশু ও মৎস্যপালন ইত্যাদিও করতে হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিশিল্প-ভিত্তিক (agro-industrial) অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

স্বভাবতই সেইসব শিল্প এর আওতায় পড়বে যার কাঁচা মাল সাধারণতঃ গ্রামে উৎপন্ন হয় বা হতে পারে এবং যার দ্বারা উৎপন্ন পাকা মাল গ্রামেই ব্যবহৃত হয়। কাপড় তৈরী, ধান ভানা, তৈলবীজ পেষাই এবং বাঙলাদেশের বিশেষ গ্রামীণ কাঁচা মাল পাটের কোন কোন রকম জিনিস তৈরী ইত্যাদি এর আওতায় পড়বে। এর জন্য যে-কোন স্তরের যন্ত্রকৌশলের (technology) সহায়তা নেওয়া যেতে পারে—কেবল এইটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে গ্রামের কর্মপ্রার্থী কোন মানুষকে যেন শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্রকৌশলের জন্য বেকার না করা হয়।

এইসব শ্রমিক-প্রধান (labour intensive) মধ্যবর্তীকালীন যন্ত্রকৌশলের (intermediate technology) দ্বারা উৎপন্ন পণ্য স্বভাবতই এইসব ক্ষেত্রে প্রচলিত শ্রমসংক্ষেপকারী উচ্চতর যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে উৎপন্নপণ্যের সঙ্গে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। সুতরাং অধিকতম সংখ্যক বাঙালীর স্বার্থে এইসব শ্রমিক-প্রধান মধ্যবর্তীকালীন যন্ত্রকৌশলের সাহায্যে চালিত উৎপাদন-ব্যবস্থাকে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় আইনকানুন রচনা ও সংরক্ষণ করতে বাধ্য করতে হবে। অনেক স্থলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্ষেত্র বিভাজন করতে হবে অর্থাৎ যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় অধিকতম বাঙালীর স্বার্থ, তার বিরোধী উৎপাদন-ব্যবস্থা আইন করে বন্ধ করে দিতে হবে।

এই জাতীয় কৃষিশিল্প-ভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কৃষি প্রসঙ্গে যে-কথা বলা হয়েছে এখানেও তা প্রযোজ্য—বাঙালীর কর্মশক্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি সংগঠনশক্তি ইত্যাদির অধিকাংশ এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং স্বভাবতই বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিপ্লবসাধন করতে হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা অথবা দশ, এগারো কিংবা বারো বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা কিংবা বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও

বাড়ানো—এর নাম শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব নয়। এগুলি জোড়াতালির ব্যবস্থা। বাঙলা ও বাঙালীর শিক্ষাব্যবস্থার বিপ্লব হল—যে কৃষিশিল্প-ভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার বাঁচার পথ নিহিত, বাঙালীকে তার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। বাঙলাদেশে বছর কয়েক আগের হিসেবে দেখা গেছে, কেবল স্কুল ফাইন্যাল ও হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেয় দু লক্ষের উপর ছাত্রছাত্রী। সেই হিসেবেই যদি এর শতকরা চল্লিশ ভাগ উত্তীর্ণ হয় এবং যদি তার অর্ধেকও উচ্চ শিক্ষায় বা ঘরগৃহস্থালীর কাজে যায় তবে শুধু এই পর্যায়ে উত্তীর্ণ কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা খুব কম করে হবে বছরে চল্লিশ হাজার। এ ছাড়া গ্রাজুয়েট ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ইত্যাদি কর্মপ্রার্থীর সংখ্যাও কোন্ হাজার আট-দশ না হবে? বাঙলাদেশের অর্থব্যবস্থাকে চরমতম সমাজবাদী ছাঁচে ঢাললেও বছরে এই আটচল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার কর্মপ্রার্থীর জন্য বাবুদের কাজের (white-colour job) সংস্থান সম্ভবপর নয়। আর এই জাতীয় শিক্ষা সর্বব্যাপক বা এমনকি আরও কিঞ্চিৎ প্রসারিত হলে সমস্যা আরও কত গুণ বাড়বে তাও চিন্তনীয়।

অতএব বাঁচতে হলে বাঙালীকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবসাধন করতে হবে। অর্থাৎ এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে আজকের 'শিক্ষিত' যুবকদের মত গায়ে রোদ জল কাদা আগুনের আঁচ লাগানোতে অনীহা না থাকে। যাতে বাঙলার ভবিষ্যৎ অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিমান উৎপাদক হতে পারে তার যুব-সম্প্রদায়—এমন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। স্বভাবতই কেতাবী জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার সর্বস্তরে কৃষি ও শিল্প হবে শিক্ষার মাধ্যম যাতে শিক্ষা-শেষে হা চাকুরী হা চাকুরী করার পরিবর্তে অধিকাংশ বাঙালী যুবক যুবতী স্বাধীন (self-employed) কৃষক বা শ্রমিক অথবা দুই-ই হতে পারে।

বাঙালীর রাজনীতি ও সংস্কৃতি

পি. ডি. এফ. মন্ত্রীসভার সময়কার কথা। ট্রাম-বাস সে সময় যখন তখন বন্ধ হয়ে যেত (এবং এখনও যে হয় না তা নয়)। এমনি এক দিনে সন্ধ্যার সময় কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরছি। মাঝপথে বাস বন্ধ হয়ে যাবার জন্য মাইল আড়াই পথ হাঁটতে হচ্ছে। এমন সময় এক শোভাযাত্রার নিকটবর্তী হলাম।

কলকাতা শহর শোভাযাত্রার নগরী এবং বিশেষ করে সে সময় জনমতের বড় একটা অংশ প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত হওয়ার জন্য প্রতিবাদমুখর। তাই অসংখ্য শোভাযাত্রা বেরোয় যত্রতত্র। সেটিও ছিল সেই রকম এক শোভা-যাত্রা। একদল teen-aged অর্থাৎ বছর কুড়ির মধ্যে বয়সের বালক-বালিকা একটি সুপরিচিত বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের ফেস্টুন নিয়ে আকাশের দিকে ঘুঁষি পাকিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি। তাই মনোযোগ দিয়ে ওদের স্লোগান শুনলাম। তদানীন্তন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে গালাগালি দিচ্ছে ওরা এবং সে গালাগালি অভিধান বহির্ভূত অর্থাৎ অশ্লীল ভাষায়!

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে পি. ডি. এফ. মন্ত্রীসভার হাতে শাসনভার দেবার জন্য রাজ্যপাল ও সেই দলের নেতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া এবং প্রকাশ্যে প্রতিবাদের মাধ্যমে সেই ক্রোধকে ব্যক্ত করা আমি বুঝতে পারি। আর আমি এতটা গোঁড়া নই যে এই বয়সের ছেলে বা মেয়েদের মুখে দু দশটা অভিধান-বহির্ভূত শব্দ শুনতে পেলে অচৈতন্য হব। বয়সকালে নিজেদের মধ্যে আমরা ওরকম বলেছি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছেলে মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে ওসব শব্দ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু যা আমাকে হতবাক্ করল তা হচ্ছে ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের একত্র সম্মিলিতভাবে ঐসব শব্দ উচ্চারণ করা এবং তাও আবার প্রকাশ্য রাজপথে শত শত পথচারী নর-নারীর সমক্ষে।

জনৈক শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপককে পরে ঘটনাটির কথা জানিয়ে এর পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে তার উপর আলোকপাত করতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বললেন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য—"বিপ্লব" সাধনের হাতিয়ার

ওরা। শ্রদ্ধা সমীহ ইত্যাদি সদর্থক (positive) অথবা লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদি নেতিবাচক—এর যে-কোন শ্রেণীর মানসিকতার প্রভাব থাকলে যুবক-যুবতীরা আর বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারবে না। সুতরাং যাবতীয় পুরাতন মূল্যবোধ উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে ওদের বিপ্লবের উপযুক্ত নূতন যুগের নর-নারীতে পরিণত করার সচেতন প্রয়াস এ।

অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তব্যে নিঃসন্দেহে চিন্তার খোরাক আছে। সেই বিশেষ দল বা দলগুলির কাঙ্ক্ষিত "বিপ্লব" হবে কি হবে না এবং হলেও কবে হবে তা আমি জানি না। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল যদি এইভাবে ছেলে-মেয়েদের তাঁদের বিরোধীদের উদ্দেশে প্রকাশ্যে অশ্লীল উক্তি উচ্চারণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেন তাহলে নগদ লাভ হয় এইটুকুই যে ঐ জাতীয় আচরণ জলচল হয়ে পড়ে এবং যে বাঙালী সংস্কৃতির জন্য আমরা সঙ্গতভাবেই গৌরব বোধ করি, তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়।

আবার বুমেরাং-এর মত কখনও কখনও রাজনীতিতে গালাগালি প্রয়োগের এই প্রক্রিয়া নিজেদের উপরই ঘুরে আঘাত করে। "ক" নামক দল "খ" নামক দলকে মার্কিন বা পুঁজিপতির দালাল বললে, "খ"ও ছেড়ে কথা কইবে না—বলবে "ক" রুশ বা চীনের দালাল। ক্রমাগত এইভাবে প্রচার হতে থাকলে ক্রমশঃ সাধারণ মানুষ মনে করবে যে উভয় দলই কোন না কোন পক্ষের দালাল।

কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এর থেকেও মারাত্মক রূপ ধারণ করে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা যেসব গালাগালি প্রয়োগ করতেন কমিউনিস্ট দল দুই ভাগ হবার সময় থেকে অদ্যাবধি মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা মূল দলের গুরুদের উদ্দেশে সেইসব এবং তার চেয়েও বেশী অশোভন উক্তি প্রয়োগ করেছেন। তবে গুরুমারা বিদ্যায় এর থেকেও বড় কেরামতী দেখিয়েছেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট দল ত্যাগ করে যাঁরা নকশালপন্থী হয়েছেন তাঁরা। গুরু মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের প্রতি এইসব শিষ্য নকশালপন্থীরা যেসব ভাষা প্রয়োগ করছেন তা পৃথিবীর কোন্ সমাজে চলে কে জানে?

এবং এসবের সম্মিলিত পরিণাম হচ্ছে এই যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি খিস্তি-খেউড়ের আখড়া হচ্ছে। অর্থাৎ জনজীবনে অভব্যতা ও অশালীনতার আমদানী হওয়ায় সাংস্কৃতিক মান হচ্ছে অধোগামী। আধুনিক কালে রাজনীতিও সমাজের এক অপরিহার্য কৃত্য, জনজীবনের সঙ্গে এর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অপহ্নব ঘটলে সমগ্র সমাজে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির দ্বিতীয় প্রবণতা সমাজবিরোধী ও মস্তানদের প্রবল প্রভাব। প্রায় অধিকাংশ দলেই এইসব শ্রেণীর লোকেরা দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতার আসন তো নিয়েইছেন, কোথাও কোথাও প্রথম পর্যায়ের নেতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বা হতে যাচ্ছেন।

সমাজবিরোধী সব দেশে সব কালেই অল্পাধিক থাকে। কিন্তু বাঙলাদেশে এরা বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান, যখন যুদ্ধের দৌলতে নানাবিধ পিছনের দরজার পেশার প্রাবল্য ঘটে। যুদ্ধের শেষে এই শ্রেণী প্রায় বেকার হয়ে আসছিল এমন সময় ১৯৪৬ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এদের কেবল বিস্তৃতিই ঘটাল না, এই শ্রেণীকে একটা respectibiliy বা মর্যাদা দিল। আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ বাঙালী এদের শরণ নিল এবং ছুরি লাঠি ও যুদ্ধের দৌলতে পাওয়া বন্দুক স্টেনগান নিয়ে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিল এরা। কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুই দাম না দিযে পাওয়া যায় না। তাই এই নিরাপত্তার বিনিময়ে এইসব "পাড়ার ছেলেদের" পাড়ার নেতৃত্বের মর্যাদাও দিতে হল। পরবর্তীকালে পেট্রোল ও বোমা ইত্যাদিও এদের অস্ত্রাগারের শক্তিবৃদ্ধি করল এবং যুদ্ধকালীন পেশা ছাড়াও ওয়াগন ভাঙা থেকে শুরু করে চৌথ জিজিয়া মাথট ইত্যাদি আদায় করা এবং আরও শতবিধ অন্ধকারের রাজ্যের পেশা এদের রসদ জোগাতে থাকল।

এইসব "পাড়ার ছেলে" আরও বহু ছেলেকে তাদের গ্যাং-এর সঙ্গে নানা ভাবে যুক্ত করায় এবং এদের সহায়তায় নিজেদের ভোট জোগাড় করা ও শাসিয়ে অপরের ভোট ভাঙানো সহজ বলে প্রথমে নির্বাচনের সময় এবং তারপর সব সময়ই এরা প্রায় সব রাজনৈতিক দলেই ভিড়ে পড়ল। কি কংগ্রেস কি কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী দলসমূহ—সর্বত্র এদের মর্যাদা। এরা বিধান-সভার সদস্য হল এবং কংগ্রেস বামপন্থী নির্বিশেষে সব মন্ত্রীসভাতেও স্থান করে নিল।

এদের প্রভাবে কেবল পাড়ার আবহাওয়াই দূষিত হল না, সংসদীয় রাজ-নীতি এবং প্রশাসন যন্ত্রেও গ্লানির স্পর্শ লাগল। এদের কেউ সমাজবিরোধী কাজ করলেও বহু ক্ষেত্রে পুলিশ নিরুপায়। কারণ কোন না কোন দলের নেতার চাপে পুলিশকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে হয়, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অধো-গতির একটা বড় কারণই শুধু এইসব রাজনৈতিক দলের পক্ষপুটে আশ্রয়প্রাপ্ত

সমাজবিরোধীরা নয়,—এদের সামনে সরকার ও সমাজকে অসহায় দেখে সাধারণ বাঙালীর নৈতিক এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মানও নিম্নমুখী হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল গায়ের জোরের প্রবল প্রতাপ বা হিংসার প্রাবল্য। একটু কিছু হলেই ট্রাম বাস পোড়ানো বা বন্ধ করা এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। হরতাল ও বন্ধ এখানে লেগেই আছে এবং প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শাসানি না থাকলে এইসব তথাকথিত "সম্পূর্ণ সফল সর্বাত্মক ধর্মঘট ও হরতালের" কয়টিতে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় যোগ দিতেন তা জানার জন্য বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু এখানেই এর শেষ নয়। সম্প্রতি শ্রেণীসংগ্রামের নামে এর থেকেও মারাত্মক ঘটনাটি ঘটছে বাঙলার রাজনৈতিক জীবনে। লুকানো জমি বার করা, অত্যাচারী জোতদারকে অথবা পুঁজিপতির দালালকে শায়েস্তা করা ইত্যাদির নামে নরহত্যা সংঘটিত হচ্ছে। কার কতটা জমি বেআইনীভাবে লুকানো অথবা কোন্ জোতদার বা কারখানার ম্যানেজার কার উপর কতটা অত্যাচার করেছে তার বিচারক লুণ্ঠন- অগ্নিসংযোগ- ও হত্যা-কারী ব্যক্তিরাই! এইরকম অবস্থা যদি অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে জঙ্গলের যুগের পুনরাবির্ভাবের আর দেরী নেই। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ধকার যুগ নামলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তার ছোঁয়া লাগবে না—এমন কথা কেউ নিশ্চয় বলবেন না।

শ্রেণীসংগ্রামের নামে যেসব হিংসাত্মক কার্যকলাপকে রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে তার সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক পরিণাম সম্বন্ধে আরও কিছুটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ববেত্তারা এই জাতীয় হিংসাকে সাধারণ হিংসা থেকে পৃথক করে এর নাম দেন revolutionary বা বিপ্লবী হিংসা। কিন্তু যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন লাঠি ছুরি বন্দুক ও বোমার স্বধর্ম তাতে পাল্টায় না। এর মূল কথা হল: যুক্তির বলে নয়, আঘাত বা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে অস্ত্রপ্রয়োগকারীর বক্তব্য মানতে আর সবাইকে বাধ্য করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় জয়লাভ করে অস্ত্রপ্রয়োগকারীর মতবাদ নয়, তার অস্ত্র।

আর একটি কথা। "বিপ্লবী হিংসা"র তত্ত্ববেত্তা যত বড় আদর্শবাদীই হোন, অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে ও নরহত্যার কলায় কুশল না হলে তাঁর "বিপ্লবী হিংসা" কার্যকর হবে না। যে-কোন বিদ্যার মত অস্ত্রচালনাও শিখতে হয় এবং

নরহত্যা করতে হলে তার উপযুক্ত একটা মানসিকতা গড়ে তুলতে হয়। হঠাৎ কোন আদর্শবাদী অথবা বুদ্ধিজীবী অস্ত্র পেলেও তা মানুষের উপর প্রয়োগ করতে পারবেন না। সুতরাং এই "বিপ্লবী হিংসার" ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব নেবে অস্ত্র চালাবার টেকনিক বা কৌশল ও মানসিকতায় পারঙ্গম ব্যক্তিরা, স্বভাবতই সাধারণভাবে আদর্শবাদী ও বুদ্ধিজীবীদের এখানে কোন স্থান নেই। এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক নেতা হচ্ছে অস্ত্র চালানোর কৌশল ও মানসিকতায় দক্ষ সমাজবিরোধীরা।

তাছাড়া "আমরাই একমাত্র শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি সাচ্চা বিপ্লবী দল" ও "শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ারে আমাদেরই একচেটিয়া অধিকার"—একথা সবাই নির্বিচারে মেনে নিতে পারে না এবং নেয়ও না। সমাজে দুই বা ততোধিক "শোষিত শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি সাচ্চা বিপ্লবী" যে থাকতে পারে তার নিদর্শন হল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক দলসমূহ। শ্রেণীসংগ্রামের নীতি অনুসারে এইসব "শোষিত শ্রেণীর একমাত্র প্রতিনিধি সাচ্চা বিপ্লবী" দলগুলির পরস্পরকে বরদাস্ত করার কথা নয়। অতএব শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব ও তার পরিণাম স্বরূপ "শ্রেণী-শত্রুকে" খতম করার নীতি স্বীকার করলে বাংলা দেশে গৃহযুদ্ধ ছাড়া অপর কোন পন্থা যে নেই—এ কোন তাত্ত্বিক কথা নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির বর্তমান গতি-প্রকৃতির দিকে তাকালেই তা চোখে পড়বে।

রাজনীতিতে গায়ের জোর বা হিংসার প্রাবল্যের অপর একটি দিক হচ্ছে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোটি কোটি বাঙালীর ভীরু হয়ে পড়া—কোন কথা বা কাজ সত্য মনে হলেও তা বলা বা করার সাহস হারানো, কোন কথা বা কাজ অন্যায় মনে হলেও তার বিরুদ্ধে বলা বা রুখে দাঁড়াবার মনোবল খোয়ানো। জনৈক বন্ধু সেদিন তাঁর একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। বাসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হঠাৎ বিগত এক সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতা করেন এই বলে যে এতে ছোটখাট ব্যবসায়ী, দিনমজুর ইত্যাদির ক্ষতি হয়। ভদ্রলোকের কথা শুনে বাসেরই সহযাত্রী একদল যুবক তাঁর প্রতি নিতান্ত মারমুখী হয়ে ওঠেন। তাঁরা সেই সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থক ছিলেন। আমার বন্ধুটি বললেন যে তারপর সেই যুবকদল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের প্রতি এমন অভব্য ব্যবহার করলেন যে তাঁকে বাধ্য হয়ে গন্তব্যস্থলে পৌছাবার পূর্বেই বাস থেকে নেমে পড়তে হল এবং তার থেকেও চিন্তাজনক ব্যাপার হল এই যে

সেই অসহিষ্ণু মারমুখী যুবকদের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস কারও হল না। বন্ধুটি ক্ষোভ সহকারে স্বীকার করলেন যে সে সাহস তাঁরও হয়নি এবং তাঁর পাশে উপবিষ্ট অপর এক সহযাত্রীর দৃষ্টিতে ঘটনাটি নিন্দাজনক এই ছাপ দেখা সত্ত্বেও তিনিও তার প্রতিবাদ করে সেই আপন মত ব্যক্তকারী প্রৌঢ়ের বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার বা সম্মান রক্ষা করতে পারেননি। অথচ আমার সেই বন্ধুটি উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। নিঃসন্দেহে বাসে আরও অনেকে তাঁর মত বুদ্ধিজীবী ছিলেন। কিন্তু উদ্ধত অসহিষ্ণুতার কাছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এইভাবে লাঞ্ছিত হল এবং সাধারণ মানুষ ভয়ে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারলেন না। এটা অবশ্য একটা চরম উদাহরণ। তবে রাজনীতিতে ভয় ও সন্ত্রাসের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে বেশ চলছে এবং জোর করে দলবিশেষের জন্য "চাঁদা" নেওয়া, ধর্মঘট ও হরতালে যোগ দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি তো চলছেই, এর সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি সাধারণ বাঙালী যারা কোন দলেরই সক্রিয় সমর্থক নয় তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাও কুণ্ঠিত। যে রাজনীতি এইভাবে কোটি কোটি মানুষকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রাখে এবং তাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটতে দেয় না, সমন্বয়ের অববাহিকা বেয়ে পুষ্ট বাঙালীর সংস্কৃতির সঙ্গে তার কতটা মিল আছে তা সহজেই অনুমেয়। এই রাজনীতির পরিণামে বাঙালীর সভ্যতা-সংস্কৃতির যে অধোগতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সব বাঙালীর রুখে দাঁড়াবার সময় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের যুববিদ্রোহ

যুব বিদ্রোহ অবশ্যই কাম্য। কাম্য স্থিতাবস্থার অবসান ঘটিয়ে মানব-সমাজের প্রগতির জন্য। বৃদ্ধেরা (বয়সে নয়, মনের দিক থেকে) সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন চান না দৈহিক ও মানসিক জাড্য ও কায়েমী স্বার্থের জন্য। তাই স্বভাবতই যুবকদের (বয়সে নয়, মনের দিক থেকে) বিদ্রোহী হয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে মানব-সমাজকে তার বাঞ্ছিত, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের অভিমুখে কিছুটা এগিয়ে দিতে হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বুদ্ধ, সক্রেটিস, যীশু, মহম্মদ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও অথবা রাজনীতির ক্ষেত্রে ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, সান ইয়াৎ সেন, লেনিন, গান্ধী, মাও, কাস্ত্রো, চে গুয়েভারা ইত্যাদি এই যুব-বিদ্রোহের নিদর্শন। এঁদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ যুগে স্থিতাবস্থা-প্রেমীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে সফল বিদ্রোহের নায়ক হিসাবে এঁরা শুধু নিজ দেশ বা জাতি নয়—সমগ্র মানব-সমাজকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু গতি মাত্রেই মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারে। কারণ গতি দুই রকমের—প্রগতি ও অধোগতি। আজকের পশ্চিমবঙ্গে যে যুববিদ্রোহ (অথবা হয়ত যুববিক্ষোভ বলাই অধিকতর সঙ্গত) দেখছি, তা প্রগতিপন্থী না অধোগতিমূলক তা ভেবে দেখা উচিত। কারণ বিক্ষোভ মাত্রেই বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন নয়। আর বিপ্লবের অর্থ কেবল ভাঙা বা রক্তপাত নয়। তা যদি হত তবে অ্যাটিলা, চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শাহ, গজনীর মহম্মদ অথবা ইয়াহিয়া খানই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হ'তেন। পরিণামে যদি এক মহত্তর মূল্যবোধ ও মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে বিদ্রোহ বিপ্লবে পরিণত না হয়ে হয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বাহন।

॥ ২ ॥

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুববিদ্রোহের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক। একে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যদিও এ বিভাগ হয়ত খুব

একটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিভাগ দুটি হল—রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয়। শিক্ষাজগতের এই বিদ্রোহের মধ্যে সামাজিক ও আর্থিক বিদ্রোহের বীজও নিহিত। আর রাজনৈতিক বিদ্রোহের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিদ্রোহও ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত।

রাজনৈতিক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে যেসব যুবক কর্মরত তাঁদের বক্তব্য মোটামুটি নিম্নরূপ: বর্তমান আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখ-দুর্দশার মূলে রয়েছে মালিক ও বিত্তবান (এঁদের অনেকে এক্ষেত্রে বুর্জোয়া শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও এর প্রয়োগ আদৌ ইতিহাস বা যুক্তিসঙ্গত নয়) শ্রেণী কর্তৃক সর্বহারাদের শোষণ। এই শোষণ বন্ধ করার অন্য কোন পথ নেই বলে মালিক ও বিত্তবানদের হত্যা করে তাদের দ্বারা প্রভাবিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙেচুরে সর্বাগ্রে সর্বহারাদের প্রতিনিধি স্বরূপ বিদ্রোহীদের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করা প্রয়োজন। মোটামুটি এঁদের মার্কসবাদী বললে অন্যায় হবে না, যদিও মার্কসবাদের নানা ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অনুসরণ করেন এইসব বিদ্রোহী যুবকদের এক-একটি দল। আর শুধু মালিক ও বিত্তবানদের প্রতিই তাঁরা বিরূপ নন, বিদ্রোহী প্রতিটি যুবকদলের পারস্পরিক সম্বন্ধও মারমুখী। তবে খুঁটিনাটির (যথা কে সত্যকার বিপ্লবী, কারা বিপ্লবের সাথী হতে পারে ও কখন বিপ্লব শুরু করতে হবে এবং পার্লামেণ্টারী রাজনীতি বিপ্লবের সহায়ক না বিরোধী ইত্যাদির) ব্যাপারে নিজেদের যতই মতভেদ থাক না কেন, বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁদের ভিতর দ্বিমত নেই।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান যুববিদ্রোহের উপরোক্ত থিসিস বা ম্যানিফেস্টোতে (শব্দ দুটি যদি এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়) যেসব গুরুতর ত্রুটি রয়েছে তার প্রতি কিন্তু এইসব বিদ্রোহীদের নজর পড়ে না। প্রথমতঃ শোষণ কি কেবল বিত্তবানের অত্যাচারের ফল? শোষিত ব্যক্তি লোভ অথবা ভয়ের কারণে বিত্তবানের শোষণের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে কেবল বিত্তবানরা একক প্রয়াসে শোষণ করতে পারতেন না। তাই সর্বহারাদের ভিতর বিদ্রোহী-চেতনার সৃষ্টি করে তাকে স্থায়ী করার মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে আজকের বিত্তবানদের শোষণ বন্ধ হলেও সর্বহারাদের অজ্ঞানতা ও আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে আর কেউ তাদের শোষণ করবে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বিপ্লবপূর্ব শোষণকারীদের নিপাত করা সত্ত্বেও টেকনোক্রাট, বুরোক্রাট, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং এমনকি প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাও যে সাধারণ

মানুষ বা সর্বহারাদের এখনও শোষণ করছেন—আর্থিক, সামাজিক ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির দিক থেকে এই নূতন অভিজাতদের দল সাধারণ মানুষের থেকে উর্ধ্বে—এই সত্য ইজমের ঠুলি পরে অন্ধ ছাড়া খোলা বুদ্ধি ও দৃষ্টির যে-কোন ব্যক্তির নজরে পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ হত্যা ছাড়া কি শোষণ বন্ধ করার আর কোন পথই নেই? ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। অতি প্রাচীন কাল থেকে সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়বিচার পাবার জন্য মানুষ সাফল্য সহকারে অসহযোগের পন্থার শরণ নিয়ে আসছে। এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি সমধিক পরিচিত ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। খ্রীঃ পূঃ ২৬০ থেকে ২৪৪-এর মধ্যে রোমের সাধারণ মানুষ প্লেবিয়ানরা রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকারের জন্য অভিজাতদের বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ করেন। জেরুজালেমের ইহুদী সম্প্রদায় অনুরূপভাবে ৩৭-৪১ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট ক্যালিগুলার অত্যাচারের প্রতিরোধ করেন। ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের শ্বেতাঙ্গরা কোয়েকার নেতা উইলিয়াম পেনের নেতৃত্বে যুযুধান স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন তার ফলে পরবর্তী সত্তর বছর পর্যন্ত যতদিন বিধানসভায় কোয়েকারদের প্রাধান্য ছিল, ঐ রাজ্যে ইণ্ডিয়ান বা আর কারও সঙ্গে আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়নি। যদিও ঐ সময়ে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্যের প্রজারা রাজার অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এক সাফল্যজনক ব্যাপক অহিংস প্রতিরোধ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মাইকেল ডেভিটের নেতৃত্বে আয়ারল্যাণ্ডের কৃষকেরাও ইংরেজ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সফল নিরস্ত্র বিদ্রোহ ও কর বন্ধ আন্দোলন করেন। ফ্রান্সিস ডিকের নেতৃত্বে দীর্ঘ পনের বছরেরও অধিককাল অহিংস আন্দোলন চালিয়ে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান ফেডারেশনের পত্তন হয়। চার্টিস্ট আন্দোলনের সময় থেকে অদ্যাবধি বহু সফল ধর্মঘটের মাধ্যমে বহু দেশে বহু দাবী আদায় হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রাশিয়ার ধর্মঘটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায়দের স্বাধিকার ও ভারতে চম্পারণ, খেড়া ও বারদৌলি ইত্যাদিতে কৃষকদের প্রতি আর্থিক ন্যায়বিচারের জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত সফল সত্যাগ্রহ সমূহ সেদিনকার ঘটনা। গান্ধীজীর বিরূপতম সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে একক উপাদানটির কৃতিত্ব সর্বাধিক, তা হল অহিংস সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে দক্ষিণ আফ্রিকা,

ঘানা, সেনেগাল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো সম্প্রদায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অল্পাধিক সাফল্য সহকারে এই পন্থার প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নরওয়ে-ডেনমার্ক প্রমুখ দেশে জনসাধারণের যে ব্যাপক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে তাও ছিল নিরস্ত্র। বিশেষ করে রাশিয়া কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর থেকে তার প্রতিবাদে এবং বুদ্ধিজীবীদের পেশাগত স্বাধীনতার জন্য রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা যে আন্দোলন চলছে তাও নিরস্ত্র। অতি সাম্প্রতিককালে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্রী শোষণকারীদের বিরুদ্ধে এক অতীব সফল অসহযোগের নিদর্শন দেখা গেল। বাংলাদেশবাসীরা তাঁদের স্বাধিকার আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন। অতি আধুনিক সমরাস্ত্রের সামনে বাংলাদেশের সেই যৎসামান্য অস্ত্রনির্ভর আন্দোলন ক্রমে যে সফলতার পথে এগিয়ে গিয়েছিল তার মূলেও ছিল কোটি কোটি কৃষক-শ্রমিকের অসহযোগ। এই অসহযোগের জন্যই দীর্ঘকাল সেখানকার কলকারখানা, দপ্তর ও শিক্ষায়তন অচল হয়ে পড়ে, কোন অসামরিক (civil) প্রশাসন চালু হতে পারেনি সাত মাসের নিষ্ঠুরতম সামরিক অত্যাচার সত্ত্বেও।

ন্যায়বিচার লাভের অপর পন্থা হল সংসদীয় গণতন্ত্র, যেখানে বিধানসভায় এর জন্য আইন তৈরী হয় ও প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সেই আইন কার্যকর করা হয়। ভারতে এই পন্থা বিবিধ কারণে আশানুরূপ সুফল দেখাতে না পারলেও ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং বিশেষ করে স্ক্যানডিনেভিয়ান রাষ্ট্রসমূহ যে এই পন্থায় সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এ সত্য তর্কাতীত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে হত্যার রাজনীতি (শ্রেণীসংগ্রাম নাম দিয়ে যাকে একটা ভদ্র চেহারা এবং তাত্ত্বিক ও দার্শনিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে) কতটা বিপ্লবী? যে বিদ্রোহী যুবদল জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছুরি, লোহার রড, বোমা, পাইপগানের সহায়তায় রক্তস্রোত বওয়ান তাঁদের এই প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে যে অত্যুচ্চ মূল্য দিয়ে তাঁরা কি হাসিল করেছেন? পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পর্যায়ে ১৯৬৭ সাল থেকে খুনের রাজনীতি প্রবর্তিত হয়। সেই থেকে এযাবৎ কয়েক হাজার প্রাণের বিনিময়ে, কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে সমাজ-বিপ্লব কতটা এগিয়েছে? এই নরমেধ যজ্ঞে কয়জন শোষণকারী, চোরাকারবারী,

ভেজালদাতার দুষ্কার্যের প্রতিবিধান হয়েছে? এবং এর থেকে অনেক কম স্বেদ, অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে কি এর থেকে বেশী পাওয়া যায় না?

আর একটি কথা। যন্ত্রশিল্পের ব্যাপক প্রসার ও তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-ব্যাঙ্কিং-বীমা-জয়েন্ট স্টক কোম্পানী-ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির বিস্তৃতির ফলে বর্তমানে যে জটিল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে সাদা-কালোর মত শোষিত ও শোষক অথবা মালিক-বিত্তবান ও সর্বহারার তফাৎ করা কি সম্ভব? অন্য দেশ অথবা এই ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের কথাও যদি বাদ দিই, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কি পরিমাণ জমি এবং কত বড় কলকারখানা, দোকান অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর মালিকানা থাকলে পূর্বোক্ত অর্থে তাঁকে মালিক বলা হবে—এ বিষয়ে সর্বজনমান্য কোন মানদণ্ড আছে কি? কিংবা মাসিক আয় কত হলে তাঁকে বিত্তবান বলা হবে তারও কোন সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা নেই। তাছাড়া মাসিক দুই-আড়াইশ টাকা রোজগারকারী কোন দপ্তর অথবা কলকারখানার কর্মী শ্রমিক-কর্মচারী রূপে সর্বহারার শ্রেণীভুক্ত হয়ে আমাদের সহানুভূতির দাবিদার হবেন অথচ পনের-বিশ বিঘা জমির মালিক চাষীর নীট আয় ঐ টাকার বেশী না হ'লেও তিনি জোতদার অভিধায় ভূষিত হবেন শুধু এই জন্য যে চাষের জো বুঝে তাঁকে মাঝে মাঝে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি-শ্রমিকদের তাঁর ক্ষেতে নিয়োগ করতে হয়? অফিসের যে কেরানি বা শ্রমিক নিজের মাইনে বাড়াবার জন্য ও অন্যান্য সুবিধা পাবার জন্য প্রচণ্ড রকমের শ্রমিকদরদী, তাঁর বাড়ির ঝি-চাকর অথবা রিকশাওয়ালা কিংবা মুটে-মজুর এবং এমনকি জুতো পালিশের ছেলেটির সঙ্গেও তিনি কি মারাত্মক দরাদরি করেন ও যথাসম্ভব তাদের কম দিতে চান—এও তো বাস্তব সত্য। সুতরাং একই ব্যক্তি একাধারে শোষিত ও শোষক হওয়ায় তাঁর সুস্পষ্ট শ্রেণী-চরিত্র নির্ধারণ করা কি সম্ভবপর? সরকারী দপ্তরে যে কেরাণী অথবা চাপরাশীটি ঘুষ ছাড়া মুখ খোলেন না অথবা জনসাধারণের অর্থে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও কাজে ফাঁকি দিয়ে জনসাধারণের ক্ষতি করেন, তাঁর শ্রেণী-চরিত্র কি শোষিত না শোষণকারী? যে ছোট দোকান, কারখানা অথবা গ্যারেজের মালিক স্বয়ং গায়ে-গতরে খাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কর্মচারীও রাখেন তাঁদের কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে? জয়েন্ট স্টক কোম্পানীসমূহের দৌলতে শ্রমিক কর্মচারীদের অনেকেই ঐ জাতীয় কলকারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদারও হয়ে থাকেন। হিসাব করলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-

কর্মচারীর সংখ্যা বহু রাজ্যের চেয়ে বেশী হলেও শুদ্ধ মার্কসীয় পরিভাষায় যাঁদের শ্রমিক বা সর্বহারা বলা হয় (মার্কস-এঙ্গেলসের মতে "হাতে পায়ের শিকল ছাড়া যাদের হারাবার মত আর কিছু নেই" বলে বিপ্লবী হবেন) তাঁদের চেয়ে কিছু না কিছু জমি বা কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিকের সংখ্যা হয়ত অনেক বেশী হবে।

দ্বিতীয়তঃ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও বড় বড় করপোরেশন ইত্যাদির যুগে আর মালিকানা মানেই কর্তৃত্ব নয়। জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অংশীদারদের প্রভাব যে অতি সামান্য এবং ঐসব কোম্পানীর আসল কর্তা যে তাদের ম্যানেজিং এজেন্ট, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা ম্যানেজিং বোর্ড ইত্যাদি একথা এ-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। বড় বড় করপোরেশন-গুলির ক্ষেত্রেও একই কথা। তাতে অর্থলগ্নীকারী ব্যক্তিদের চেয়ে তার ডিরেক্টরবর্গ, ম্যানেজার, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব অনেক বেশী। মালিকানার এই নূতন ও ক্রমবর্ধমান পদ্ধতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থের কোন রকম ঝুঁকি না নিয়েও প্রবল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রয়োগ করা। তাই এইসব ক্ষেত্রে মালিক অর্থাৎ অর্থলগ্নীকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে শোষণের সমস্যার কোন সমাধান হবে কি, অথবা মালিকদের কোতল করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি?

আর একটি প্রশ্ন। কারা সত্যিকার সর্বহারা-দরদী ও কারা মালিক, পুঁজিপতি ও শোষক শ্রেণীর এজেন্ট? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করার পূর্বে এই প্রশ্নটির সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কথা যদি বাদও দেওয়া যায় শুধু মার্কস এঙ্গেলস্-লেনিনের অনুগামী বলে আত্মপরিচয়দানকারী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এ রাজ্যে এক ডজনের কম হবে না। এর মধ্যে থেকে এস. এস. পি. ও পি. এস. পি-এর মত সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামে অবিশ্বাসী কয়েকটি দলের কথা বাদ দিলেও জঙ্গী মার্কসবাদে অর্থাৎ মালিক ও বিত্তবানদের হত্যা করার রাজনীতিতে বিশ্বাসী দলের সংখ্যাও কম নয়। এবং এইসব দলের অনুগামীরা একমাত্র তাঁদের দলকেই আদি ও অকৃত্রিম সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি ও বাদবাকি তাবৎ জঙ্গী মার্কসবাদে বিশ্বাসী দলগুলিকে "প্রচ্ছন্ন বুর্জোয়া" ও "শোষক শ্রেণীর এজেন্ট" মনে করেন ও তদনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে Righteous indignation চালিত হয়ে আচরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিণাম কি? পরিণাম আজকের পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে কারও জীবন, জীবিকা অথবা স্বল্প সম্পত্তিরও নিরাপত্তা নেই, যেখানে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত ও চোখের সামনে নারী-বালক খুন হতে দেখলেও প্রতিবাদ করার সাহস নেই, যেখানে কলকারখানা, দপ্তর, হাট-বাজার রেল-বাস-ট্রাম চলাচল বিপর্যস্ত, যেখানকার অর্থনীতি অধোগামী, শ্রমিকেরা কর্মহীন বলে তাদের পরিবারে অনাহারজনিত হাহাকার। জঙ্গী মার্কসবাদীদের কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গের আজকের অবস্থাকে বিপ্লবের প্রথম চরণ বা প্রস্তুতিকাল বলে থাকেন। তাহলে আসল বিপ্লবের স্বরূপ কি? সাধারণ মানুষ যাকে নরক বলে কল্পনা করে তারই মত কিছু?

সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের নীতি অনুসারে কার্যরত কোন কোন দলও যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সর্বনাশা অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন, তার একটি সুস্থ নিদর্শন কিছুদিন আগের এক সংবাদপত্রে চোখে পড়ল। বীরভূম জেলায় কর্মরত একটি জঙ্গী মার্কসবাদী পার্টির তরফ থেকে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে সম্প্রতি ঐ জেলায় যে প্রবল অসামাজিক কার্য-কলাপের স্রোত বইছে শ্রেণীসংগ্রামে রত হলেও তাঁরা তার জন্য দায়ী নন। তাঁদের নাম করে সমাজবিরোধীরা এইসব খুন, লুঠ ও ছিনতাই ইত্যাদি করছে এবং তাঁরা তাই সুস্থ জনজীবনের পরিপন্থী এইসব দুষ্কর্মের প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণকে সক্রিয় হতে আবেদন জানিয়েছেন। বীরভূমের ঐ রাজনৈতিক দলটির বক্তব্য অত্যন্ত সাধু। কিন্তু ব্যাপারটি গোড়া কেটে আগায় জল দেবার মত। প্রথমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছুরি, বোমা, পিস্তলের প্রবর্তন করে জনসাধারণের সাহস ও নৈতিক বল ভেঙে দিয়ে তাঁদের আবার সাহসী হতে বলা হাস্যকর ব্যাপার। হিংসার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে নিতান্ত সাধু উদ্দেশ্যেও একবার এই পন্থার শরণ নিলে শেষ পর্যন্ত এক্ষেত্রে প্রভুত্ব করবে এই পন্থার অ্যামেচার অনুগামীরা নয়, এ শাস্ত্রের কুশলতম প্রয়োগকারী পেশাদার ছুরি, বোমা, পিস্তল ব্যবহারকারী বা সমাজ-বিরোধীরা।

সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবের ঔচিত্য সম্বন্ধে আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লবীদের নূতন করে চিন্তা করা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য সশস্ত্র বিপ্লব বলতে এক্ষেত্রে কেবল বোমা, পিস্তল বোঝাবে না। বিপ্লবীরা যেটা

উচিত বলে মনে করেন, যুক্তি দ্বারা নয় গায়ের জোরে বা চাপ দিয়ে তা আর সবাইকে মানতে বাধ্য করার তাবৎ প্রক্রিয়াই এর মধ্যে পড়ে। অপরের সভা ভাঙা, তাঁদের বক্তব্য বলতে না দেওয়া, ট্রাম-বাস পোড়ানো থেকে আরম্ভ করে ভিন্ন মতবাদের বই-পত্রিকায় আগুন দেওয়া ও বরেণ্য মনীষীদের প্রতিকৃতি ও মূর্তি নষ্ট করা ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে।

॥ ৩ ॥

এবার শিক্ষার ক্ষেত্রে যুববিদ্রোহের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাক। পরীক্ষার তারিখ স্থান অথবা প্রশ্নপত্র ইত্যাদি বদলের দাবীতে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমুখ কর্তৃপক্ষস্থানীয়কে ঘেরাও করে তাঁদের প্রকৃতির আহ্বানেও সাড়া দিতে না দেওয়া, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরীসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব কিছু মায় চেয়ার টেবিল, পাখা ভেঙেচুরে তছনছ করা, পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র ছেঁড়া ও কেড়ে নেওয়া, অবাধ টোকাটুকি ও ইনভিজিলেটরদের শাসিয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখা ইত্যাদি যেসব প্রক্রিয়ার শরণ এক্ষেত্রে নেওয়া হয় আমরা সবাই মোটামুটি তার সঙ্গে পরিচিত।

এইসব প্রক্রিয়ার পিছনে যে ফাঁকিবাজি, সুবিধাবাদ ও অন্যবিধ বিকৃতি বিদ্যমান তার কথা বর্জন করলে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদ্রোহীদের যে নীট বক্তব্য থাকে তা হল: বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষাব্যবস্থা নিরর্থক, কারণ আজকের যুব সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান চাহিদা—বেঁচে থাকার সমস্যার সমাধান করার শক্তি এর নেই। মনে হয় যে-কোন বিবেচক ব্যক্তিই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এই ত্রুটি স্বীকার করে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের সপক্ষে মত দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বিদ্রোহী যুবকেরা তাহলে জেনেশুনে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার জন্য হন্যে হয়ে ওঠেন কেন এবং কেনই বা তাঁরা এই শিক্ষা গ্রহণ করেন? এর জবাবে হয়ত বলা হবে যে যেহেতু অপর কোন শিক্ষাব্যবস্থা নেই তাই। কিন্তু নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করবেন কারা? বর্তমান সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার কর্ণধারেরা, যাঁদের এ ব্যবস্থায় কায়েমী স্বার্থ আছে তাঁরা? এরকম আশা করা কি বুদ্ধিবৃত্তির দেউলিয়াপনা ঘোষণা করা নয়?

অথচ বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে ১৯০৫ সনের স্বদেশী থেকে ১৯২১-৪৭-এর স্বাধীনতার আন্দোলন পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব হয়েছে এবং বিশ্বভারতী ও যাদবপুরের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন—যা আজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—ও অজস্র জাতীয় বিদ্যালয় তার প্রবর্তক হোতা ছিলেন প্রধানতঃ যুব সম্প্রদায়। এ প্রসঙ্গে তরুণ সুভাষচন্দ্রের অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ কেরিয়ারের মোহ বর্জন করে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার কথাও স্মরণীয় এবং এ কার্যে সুভাষচন্দ্রের মত আরও শত শত তরুণ অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু আজকের বিদ্রোহী যুব সমাজ কোথায় নূতন শিক্ষানীতির উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ করছেন? তাহলে কি এই সব তথাকথিত বিদ্রোহী যুবক আসলে প্রচলিত ব্যবস্থারই ধারক—শুধু নিজের সুবিধাটুকু করে নিতে চান?

এই প্রসঙ্গে কিউবায় চে গুয়েভারার একটি অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে। কিউবায় কাস্ত্রোর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর চে গুয়েভারার উপর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এই সময় একদল শহরের শিক্ষিতা চাকুরীজীবী মহিলা তাঁর সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। যতদূর মনে পড়ছে বিপ্লবী সরকারের কোন কোন প্রগতিশীল কর্মসূচীর জন্য বিদেশ থেকে আমদানী করা দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রেতা এইসব মহিলাদের রোজগার বন্ধ হয়েছিল। মহিলাদের বক্তব্য তাঁরাও বিপ্লবী এবং তাই বিপ্লবের অন্যতম নায়ককে তাঁদের সমস্যার সুরাহা করে দিতে হবে। চে তাঁদের বললেন যে তাঁদের সকলের জন্য কর্মসংস্থান করবেন তিনি। কিউবায় তখন চাষের ফসল তোলার মরশুম। সবাইকে সেই কাজে নিয়োগ করবেন। মহিলারা কিন্তু এই প্রস্তাবের কথা শুনেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। শহরের শিক্ষিতা আধুনিকারা চাষী হবেন? নৈব নৈব চ। সন্দেহ হয় আমাদের যুববিদ্রোহীদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবও এই জাতীয়। নচেৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাণ্ডব অথবা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা (এই ধিকৃত শিক্ষাই) প্রবর্তন এবং শিক্ষার "জাতীয়করণ" অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার চেয়েও আরও কিছুদূর তাঁদের কল্পনা যেত, যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থই বিপ্লবসাধন সম্ভবপর হয়।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষার মূল সমস্যা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা বোধহয় অন্যায় হবে না। শিক্ষার লক্ষ্য জীবন-সংগ্রামের জন্য মানুষকে তৈরী করা। জীবন-সংগ্রামের দুটি দিক। প্রথমটি জীবিকা সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি মানববিদ্যার

এলাকাভুক্ত, যার লক্ষ্য হল মানবীয় বৃত্তিসমূহের সম্যক বিকাশ। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মানবীয় বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধনের পাঠ্যক্রম থাকলেও জীবনচর্যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক না থাকায় মানবীয় বৃত্তির উৎকর্ষ বিধানের কোন সম্ভাবনা নেই। আর জীবিকা সংগ্রহের তো কোন আশাই নেই এই শিক্ষার মাধ্যমে। এই শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা কেরানি, ডাক্তার, উকিল ইত্যাদি 'হোয়াইট কালার জব' বা ধোপদুরস্ত বাবুদের পেশা ছাড়া অন্য কাজের অনুপযুক্ত। কিন্তু যে-কোন দেশের অর্থব্যবস্থার মত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতেও এজাতীয় চাকুরির সংখ্যা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এইজন্যই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা এত বেশী। এর উপর শতকরা মাত্র ২৯.৩ জন অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন হওয়াতেই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী হায়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেন। এঁদের তিন ভাগের এক ভাগ যদি এইসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তার আবার অর্ধেক যদি উচ্চ শিক্ষায় ও ঘর গৃহস্থালী বা অন্যান্য কাজে যান তাহলে বাকি অর্ধেক অর্থাৎ কম করে হলেও লক্ষাধিক শুধু স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীর জন্য বাবুদের পেশা চাই। আর কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিত বেকার প্রতি বছর কোন্ না ত্রিশ-চল্লিশ হাজার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যে জাতীয় পরিবর্তনই করা হোক না কেন এবং শাসন-ক্ষমতায় যত বাঘা বিপ্লবীই আসীন হোন না কেন বর্তমানের লক্ষাধিক শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে প্রতিবছর এই সংখ্যক নূতন বেকারের জন্য বাবুদের কাজ জোগাড় করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর পর এই শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন হলে অর্থাৎ সব ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে কী নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং, অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ্যা ও ডাক্তারী ইত্যাদি শিক্ষার সমস্যা দ্বিবিধ। অর্থব্যবস্থার সম্যক বিকাশের অভাব ও অন্যান্য কারণে এইসব শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যেও বেকার সমস্যা রয়েছে এবং এঁদের শিক্ষা মূলতঃ জীবিকামূলক বলে মানবীয় বৃত্তিসমূহের সম্যক বিকাশের অবকাশ নেই এইসব ক্ষেত্রে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ নয়, একাঙ্গ নাগরিক তৈরী হয় এই ব্যবস্থায়।

কিন্তু এর প্রতিবিধান কি? প্রতিবিধান হচ্ছে আজকের মধ্যবিত্তদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার বদলে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন যা শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন কৃষক ও শ্রমিক সৃষ্টি করতে পারে। পশ্চিম বাঙলার অর্থব্যবস্থায় এখনও দীর্ঘকাল কৃষক ও শ্রমিকদের প্রাধান্য থাকতে বাধ্য। তাই যে

সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা এখানে গড়ে তুলতে হবে তা কৃষক ও শ্রমিকদের উপযুক্ত না হলে নিরর্থক। এর জন্য ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যম স্বরূপ কৃষি ও শিল্পের অনুসরণ করতে হবে যাতে জীবিকা হিসাবে পরে তাঁরা কৃষি ও শিল্পকে গ্রহণ করতে পারেন এবং আদর্শ কৃষক ও কারিগর হন। এর কমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লবসাধন অসম্ভব। মাও-এর নেতৃত্বাধীন চীনে এই ধরণের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধন করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এদেশে মাও-এর অনুগামী বলে যাঁরা নিজেদের জাহির করেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লব শুধু স্কুল কলেজ ধ্বংস করা ও মনীষীদের মূর্তি, ছবি ও সাহিত্য নষ্ট করার মধ্যেই সীমিত রয়ে গেছে। বিপ্লবের নামে প্রতিবিপ্লবের এমন নিদর্শন সচরাচর দেখা যায় না।

॥ ৪ ॥

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে আজকে যুব বিদ্রোহ নামে যা চলছে তার স্বরূপ কি? বিদ্রোহ যদি বিপ্লব বা নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সহায়ক না হয়ে কেবল অন্ধ ভাঙাচোরার কার্যক্রম হয় এবং স্থিতাবস্থার সমর্থক অথবা প্রতিক্রিয়া অভিমুখী হয় তাহলে তাকে আদৌ বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যায় না। সে-জাতীয় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা বড় বেশী হলে বিক্ষোভ নামে অভিহিত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উদ্দাম উত্তালতার পিছনে গঠনমূলক প্রয়াস না থাকায় একে তাই যুববিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যায় না।

বর্তমান আর্থিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুঃসহ। এর পরিবর্তন বিপ্লবের কম কোন কিছুতে হবে না এবং সেই বিপ্লব বা নূতন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার সাধন হল যুববিদ্রোহ। এবং তাই যুববিদ্রোহ কাম্য—অতীব কাম্য। কিন্তু যুক্তিবর্জিত অন্ধ উন্মত্ততার অনুশীলনে যুববিদ্রোহ মূর্ত হবে না, এর জন্য চাই সুচিন্তিত গঠনমূলক প্রয়াস। কবির ভাষাতেই শেষ করি:

"শোণিতে ভাসাল ধরণী যাহারা তারা নয় তারা নয়,
মোরা পথ চাই নূতন বীরের গাহি তাহাদেরই জয়।"

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক যে তথাকথিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় ইদানীন্তন কালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত সেই সময় থেকে। তারপর নোয়াখালি পর্ব ও শেষ অবধি ভারত বিভাজন। সৌভাগ্য-ক্রমে দেশ বিভাগের সময় স্বয়ং গান্ধীজী বাঙলাদেশে উপস্থিত থাকায় মাউন্ট-ব্যাটেন কথিত সেই one man boundary force-এর প্রভাবে পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব পাকিস্তান দেশবিভাগ জনিত রক্তস্নানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়—পঞ্জাবের মত স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং ৬০ হাজার নিরপরাধের প্রাণনাশ (দ্রষ্টব্য: The Last Days of British India : Michael Edwardes), বহু কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট ও কয়েক হাজার ধর্ষিতা লাঞ্ছিতা নারীর অশ্রু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম অর্থদ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়নি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাঙলাদেশকে দেশবিভাজনের মূল্য দিতে হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে উভয় বঙ্গই এই সমস্যায় ভুগছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সংখ্যালঘুদের সমস্যাই এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। স্বাধীনতালাভের পর মাঝে মাঝেই পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নিধন পর্বের সূচনা হয়েছে এবং তার পরিণামে দফায় দফায় ভীতসন্ত্রস্ত ও আত্মীয় বিয়োগ ব্যথায় কাতর নিঃস্ব সংখ্যালঘুর দল বৈধ অথবা অবৈধভাবে ভারতবর্ষে এসেছেন। সাময়িকভাবে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহ এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু বাঙালীর জাতিচরিত্রের স্বধর্ম অনুযায়ী শীঘ্রই এ সমস্যার কথা বিস্মৃত হয়ে সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অন্য কোন নূতন চাঞ্চল্যকর প্রসঙ্গ নিয়ে মাতামাতি করেছেন। এর ফলে স্বাধীনতালাভের পর প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসরকাল অতিক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলেও সংখ্যালঘুদের সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধানের সূচনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এ সমস্যার বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সমস্যাটির পটভূমিকা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিজাতি তত্ত্বের নীতিতে বিশ্বাসী মুসলিম লীগের

ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবির কাছে কংগ্রেস সহ তাবৎ অখণ্ড ভারতের নীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে নতি স্বীকার করে। সে সময় জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ ও খান আবদুল গফুর খান ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের সমাজবাদী গোষ্ঠীর নেতারা ভারত বিভাজন প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও এ সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। বাস্তব অবস্থার জন্য খান আবদুল গফুর খানের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বাকি কেউই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভারত বিভাজনের প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতা করেন নি বলে ভারত বিভাগ হয়ে যায়। নিজ সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বক্তব্য ছিল এই যে দেশের কোণে কোণে সম্প্রসারণশীল সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান অগ্নিশিখা, অন্তবর্তী মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ প্রতিনিধিদের বাধাদানের নীতির ফলে দেশের বিলম্বিত প্রগতি ইত্যাদির কারণে তাঁরা বৃহত্তর কল্যাণভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে দেশ বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে এর পরিণামে সাম্প্রদায়িক অশান্তির স্থায়ী অবসান হবে এবং নিজ নিজ এলাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ স্ব স্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী দেশগঠনে ব্রতী হতে পারবে।

পরবর্তী অভিজ্ঞতায় অবশ্য পূর্বোক্ত বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে এর জন্য তদানীন্তন নেতৃবর্গের প্রতি দোষারোপ করা নিরর্থক। কারণ কোন ঘটনা ঘটে যাবার পর বিজ্ঞ হওয়া সহজ।

যাই হোক, স্বাধীনতালাভের পরই এমনকি পাকিস্তানের জনক ও পাকিস্তান গণপরিষদের তদানীন্তন সভাপতি জিন্নাসাহেবও পাক-গণপরিষদে তাঁর প্রথম ভাষণে ঘোষণা করলেন যে "অতঃপর প্রশাসনের ব্যাপারে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানরাও মুসলমান থাকবে না" উভয়ে মিলে পাকিস্তানী জাতিতে পরিণত হবে। স্বভাবতই এতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত হবার কারণ ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের তিনজন জননায়ক—জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট নেহরুজী বললেন, "আমাদের যেসব ভাইবোন রাজনৈতিক সীমানা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হতে চলেছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁরা বর্তমান স্বাধীনতায় অংশ গ্রহণ করতে অসমর্থ সেইসব ভাইবোনদের কথা সর্বদাই আমি

মানসপটে অঙ্কিত রাখব। তাঁরা আমাদেরই লোক ও যাই ঘটুক না কেন চিরদিন আমাদেরই থাকবেন এবং আমরাও তাঁদের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার থাকব।" একই দিনের ঘোষণায় বল্লভভাই প্যাটেল বললেন, "যাঁরা এতকাল আমাদের সঙ্গে মিলিত ছিলেন কিন্তু আজ পৃথক রাষ্ট্রভুক্ত হতে চলেছেন স্বভাবতই তাঁদের প্রতি আমাদের অন্তঃকরণ ধাবিত হচ্ছে। ...সীমান্তের অপর পারের ভ্রাতৃগণ, কখনও আপনারা মনে করবেন না যে আপনারা অবহেলিত ও বিস্মৃত হবেন। আমরা পরম ঔৎসুক্য সহকারে আপনাদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখব।" ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমি বারম্বার ঘোষণা করেছি যে বঙ্গবিভাগক্রমে একটি স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সৃষ্টির দ্বারা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের লোকরক্ষার ব্যবস্থা হল তা সত্যি নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের প্রতি আমাদের গুরুতর দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ উভয়কেই একযোগে পালন করতে হবে।" এই প্রমুখ নেতৃত্রয় ছাড়া তখনকার প্রায় প্রতিটি ছোট-বড় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী ভারতীয় স্বাধীনতার বলি—পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণবিধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

॥ ২ ॥

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হল এবং তার পূর্বাঞ্চলে রইল মোট ১·৩৫ কোটি সংখ্যালঘু। এর মধ্যে খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ কয়েক হাজার করে হলেও এর অধিকাংশই ছিল হিন্দু। অবশ্য অনেকের মতে ১·৩৫ কোটি সংখ্যাটি যথার্থ নয়, সংখ্যালঘুদের আসল সংখ্যা আরও কিছু বেশী। কারণ তাঁদের মতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের যে জনগণনার উপর ভিত্তি করে ঐ সংখ্যা নির্ধারিত হয় তা যথাযথ নয়। তদানীন্তন সরকারের প্ররোচনায় ঐ সময়ের জনগণনায় ইচ্ছে করে হিন্দুদের সংখ্যা কম দেখানো হয়েছিল।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর মধ্যে ৪২ লক্ষ সংখ্যালঘু নিজেদের পৈতৃক ভিটামাটি ও জীবিকার উপায় ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছেন। আর ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর ১৯৬৫ সনে আরও ৯ লক্ষের মত সংখ্যালঘু ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭০ সনে এসেছেন প্রায় আড়াই লক্ষ। পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা বিবরণ অনুযায়ী সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ।

তারপর তিন বছরে সংখ্যালঘুদের কিছু সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে এবং তার থেকে বিগত বৎসরের দাঙ্গার পর ১৯৬৫ সন পর্যন্ত ৯ লক্ষ লোক ভারতবর্ষে এসেছেন। এঁদের মধ্যে আবার প্রায় এক লক্ষ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে গেছেন। সুতরাং বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে ৮০ লক্ষের মত সংখ্যালঘু রয়েছেন এবং আমাদের আলোচ্য বিষয় হল এঁদের ভবিষ্যৎ।

পূর্ব পাকিস্তানে যে ৮০ লক্ষেরও কিছু বেশী সংখ্যালঘু এখনও আছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এযাবৎ মোট যে ৫৩ লক্ষের মত সংখ্যালঘু ভারতবর্ষে আসতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের বাস্তুত্যাগের মোটামুটি কারণ জানা প্রয়োজন। এই কারণগুলির উপর বহুলাংশে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা এবং পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট জননায়ক বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় আগত শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় এ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি অতীব প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : India Partitioned and Minorities in Pakistan)। প্রভাসবাবু সুদীর্ঘকাল পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন এবং ইউনাইটেড ফ্রন্টের মন্ত্রীত্বকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর বিশ্লেষণ সঙ্গত কারণেই প্রামাণ্যতার দাবি রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে সংখ্যালঘুদের পূর্ব পাকিস্তান পরিত্যাগের কারণগুলির অধিকাংশ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও বাঙলার বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয়ের লোকসভার দুটি বক্তৃতা (১২।২।১৯৬৩ ও ৪।৪।১৯৬৪) থেকে সঙ্কলিত।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে চলে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তৎসংশ্লিষ্ট লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ, নারীধর্ষণ এবং হত্যা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই প্রত্যেক বছরে বহু ছোটখাট স্থানীয় ধরণের দাঙ্গা হয়েছে এবং এর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুরা একতরফা নিগৃহীত হয়েছে। একমাত্র ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬ সনের ভিতর এ জাতীয় ৮০২১টি ঘটনায় সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তবে ব্যাপকতার জন্য ১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের দাঙ্গা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সর্বাধিক কুখ্যাত। ঢাকা, বরিশাল ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব প্রমুখ জনপদের সংখ্যালঘুরা এই দাঙ্গার শিকার হন। ১৯৬১ সনের মে-জুন মাসে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা, ১৯৬২ সনের জানুয়ারি-মার্চ মাসে রাজসাহী ঢাকা খুলনা ও পাবনা

ইত্যাদির দাঙ্গা এবং সর্বোপরি ১৯৬৪ সনের জানুয়ারি মাসের দাঙ্গা। লোকসভার সদস্য শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে শেষোক্ত দাঙ্গায় একমাত্র ঢাকা-নারায়ণগঞ্জেই মৃতের সংখ্যা হল ১০ হাজার এবং অনেকের মতে খুলনা-যশোহর সহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে মৃত সংখ্যালঘুর সংখ্যা ৩০ হাজার হতে পারে। অবশ্য সংসদ সদস্য শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ মহাশয়ের মতে মোট মৃতের সংখ্যা ২০ হাজারের কাছাকাছি এবং নানাবিধ কারণে এই সংখ্যাটিই নির্ভরযোগ্য মনে হয়।

সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের গৌণ কারণগুলির অন্যতম হল নিরাপত্তার অভাব, অনিশ্চয়তা, মুসলিম লীগ ও ন্যাশনাল গার্ডদের আক্রমণাত্মক আচরণ, ন্যায়বিচার লাভে ব্যর্থতা। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সনে বাস্তুত্যাগের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক মনে হয় যার জন্য মাঝে মাঝে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরাও গোপনে ভারতে বসতি স্থাপন করেন ইত্যাদি। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের অভিসন্ধি ছিল : "রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সহস্রবুদ্ধি ও বুদ্ধিমান সংখ্যালঘুদের বিতাড়িত করা যাতে বাদবাকি অপেক্ষাকৃত নিরীহ কম বুদ্ধিমান ও দুর্বল সংখ্যালঘুদের ধর্মান্তরিত করা যায় ও নেহাত তা সম্ভব না হলে যাতে তাদের ঐস্লামিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও চিন্তাধারা গ্রহণে বাধ্য করা যায়।" এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সংখ্যালঘুদের বিতাড়িত করা হয়েছে, তাদের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দের কাছে প্রতিকারের আশায় আগত সাধারণ লোকদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ ছাড়া লীগ শাসনের আমলে সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথার প্রবর্তন ও পাকিস্তানের ঐস্লামিক সংবিধান স্বীকার ইত্যাদি। ঐস্লামিক সংবিধান স্বীকৃত হবার পরই মাসে প্রায় ৫০০০-এর হারে সংখ্যালঘুরা বাস্তুত্যাগ করা আরম্ভ করেন বলে সংখ্যালঘুদের কাছে ঐস্লামিক সংবিধানের তাৎপর্য কি তা জানা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৬ সনে বিধিবদ্ধ এই সংবিধান অনুসারে ইসলামের অনুগামী না হওয়ার জন্য কোন অমুসলমান রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না। এই সংবিধান অনুসারে সুন্না ও কোরান-বিরোধী কোন বিধিব্যবস্থা পাকিস্তানে আইনসিদ্ধ হবে না। ঐস্লামিক সংবিধান অনুসারে অমুসলমানেরা জিম্মী এবং তাই পাকিস্তানেও তারা সম-অধিকারবিশিষ্ট নাগরিক নন—জিম্মী মাত্র। আবার শরিয়ৎ-এ জিম্মীর মর্যাদা যতই মহান বলে উক্ত থাক না কেন, বাস্তববিচারে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ

অধিবাসীর কাছে জিম্মীর অর্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক এবং প্রত্যুত জিম্মীরা হল ভারতবর্ষে যে-সব মুসলমান রয়ে গেছেন তাঁদের প্রতিভূ। ভারতীয় মুসলমানদের কোন অসুবিধা হলে তার দায়দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানের এইসব জিম্মীদের। ঐস্লামিক সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর ইসলাম প্রত্যুত পাকিস্তানের সরকারী ধর্মের পর্যায়ে উন্নত হয়েছে এবং স্বভাবতই এই পরিবেশে অমুসলমানদের পক্ষে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়া কঠিন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অধিবেশন শুরু হয় কোরানশরিফ থেকে আবৃত্তি দ্বারা। পরিষদের সংখ্যালঘু সদস্যদের সে সময়কার বিব্রত অবস্থা সহজেই অনুমেয়। স্কুল-কলেজ, সরকারী দপ্তরে মসজিদ ও ঐস্লামিক উপাসনার ব্যবস্থা হয়েছে। রমজান মাসে এমনকি অমুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত খাবারের দোকান সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি এমনভাবে ঢেকে রাখার নিয়ম যাতে খাবার মুসলমানদের চোখে পড়ে তাঁদের প্রলুব্ধ না করে। এ ছাড়া এ সময় প্রকাশ্যে ধূমপানও নিষিদ্ধ ও এইসব বিধানের উল্লঘন হলে শাস্তি পেতে হয়। পাঠ্যপুস্তকসমূহের মারফতও বিধিবদ্ধভাবে ঐস্লামিক সংস্কৃতি প্রচার করে সংখ্যালঘু অমুসলমানদের উপর সাংস্কৃতিক বিজয় সূচিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

মুসলিম লীগ শাসনে আমলে পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত এইসব অনাচারের জন্য কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষেরা অথবা কংগ্রেস কর্মীরা সেদেশ ত্যাগ করেননি। যোগেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডলের মত লীগ সমর্থক তপশীল নেতা ও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের মন্ত্রী এবং শ্রীমতী ইলা মিত্রের মত কমিউনিস্ট কর্মী যাঁরা চিরকাল নীতিগতভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দোহাই দিয়ে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেছেন তাঁদের মত আরও অনেককে পূর্ব পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হতে হয়।

১৯৫৪ সনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রচণ্ডভাবে পরাজয় বরণ করে। বিজয়ী ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতৃত্রয়—ফজলুল হক, শহীদ সুরাবর্দি ও মৌলানা ভাসানী সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচারের আশ্বাস দেন এবং কার্যতঃ তাঁরা যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন সংখ্যালঘুরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশ কিছুটা নিশ্চয়তা বোধ করেছিলেন। মাঝে হক সাহেবের মন্ত্রীমণ্ডলীকে কেন্দ্রীয় পাক সরকার বাতিল করলে নিরাপত্তাবোধের অভাবে সংখ্যালঘুরা আবার পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আবুহোসেন সরকার ও

আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীত্বের আমলে তাঁদের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক নীতির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা আবার সুদিনের মুখ দেখতে পান। কিন্তু ১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে যে জঙ্গী শাসন প্রবর্তিত হয় তার ফলে সংখ্যালঘুদের এই সাময়িক সুদিন চলে গিয়ে আবার অত্যাচারের তপ্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হতে হয়।

আয়ুব খাঁর জঙ্গী শাসনের আমলে মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকেও নিগৃহীত হতে হয়। সতীন সেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নিহত হন এবং মনোরঞ্জন ধর, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বহু সংখ্যালঘু সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কারারুদ্ধ হন। এঁদের মধ্যে অনেকে এখনও অনির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগের অপরাধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু সাধারণ অধিবাসীকেও নানাভাবে হয়রান করা হয়েছে।

লীগ শাসনের আমলে সংখ্যালঘুদের আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁদের দুর্বল করার জন্য সংখ্যালঘুদের নির্বাচকমণ্ডলীকে (ক) হিন্দু (খ) তপশিলী-হিন্দু (গ) বৌদ্ধ ও (ঘ) খ্রীষ্টান—এই চার ভাগে বিভক্ত করেন। তবে বিভক্ত হলেও লীগ আমলে শাসনযন্ত্রে সংখ্যালঘুদের কিছুটা প্রতিনিধিত্ব ছিল। কিন্তু জঙ্গী শাসনের পর যে তথাকথিত বৈধানিক শাসন প্রবর্তিত হল, তার আমলে আয়ুব খাঁর বুনিয়াদি গণতন্ত্রের মহিমায় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের (পাকিস্তানের লোকসভা) ১৫৬ জন সদস্যের মধ্যে সংখ্যালঘুদের একজনও প্রতিনিধি থাকল না। আর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক বিধানসভায় ১৫০টি আসনের মধ্যে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি মাত্র তিনজন। এর একজন হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি এবং দুজন তপশিলী হিন্দু সমাজের। বলা বাহুল্য সংখ্যালঘুদের সর্বাপেক্ষা মুখর অংশ—বর্ণহিন্দুদের কৌশলে বাদ দিয়ে তিনজন দুর্বলচেতা ও বশংবদ ব্যক্তিকে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বের দরবারে পেশ করার জন্যই এই ব্যবস্থা।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউই শাসনযন্ত্রের উচ্চপদে নেই—ইউনাইটেড ফ্রন্টের আমলে যে দু-চারজন কাজ পেয়েছিলেন জঙ্গী শাসনের আমলে তাঁদের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। বেসরকারী দপ্তর বা ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানেও সংখ্যালঘুদের কাজ মেলা ভার। সংখ্যালঘুদের ব্যবসাবাণিজ্য করে জীবিকা অর্জন করার সুযোগও ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় সংকুচিত হচ্ছে।

শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা হিন্দু সমাজের এক পুরাতন পেশা ; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মারফত ঐস্লামিক সংস্কৃতি প্রবর্তন মানসে হিন্দুদের অশিক্ষকতা থেকে দূরে রাখছেন। রাজশাহীর বি. বি. হিন্দু আকাদেমী, সংস্কৃত কলেজ এবং কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা ও নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় প্রমুখ সংখ্যালঘুদের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবৎ সরকার দখল করে নিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী সংখ্যালঘুদের অধিকাংশ লোকের জীবিকা হল জমি থেকে প্রাপ্ত উপস্বত্ব। পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি হওয়ায় প্রধানতঃ মধ্যস্বত্বভোগী সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে কাল স্বয়ং জমিদারী ও জমি সংক্রান্ত অন্যবিধ মধ্যস্বত্বের বিরুদ্ধে বলে সংখ্যালঘুদের অন্ন চলে গেলেও জমির মধ্যস্বত্ব বিলোপের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য করা হবে না। কিন্তু তাই বলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান নাগরিকদের জমির উপর যতটুকু অধিকার আছে সংখ্যালঘুদের তার থেকেও বঞ্চিত করলে সে ব্যাপারকে নিছক পক্ষপাত ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? মুসলিম লীগ আমলেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে সংখ্যালঘুদের দশ বিঘার অতিরিক্ত জমি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ ছিল এবং গোপন সার্কুলারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা যেন পারতপক্ষে সংখ্যালঘুদের জমি হস্তান্তরের অনুরোধে রাজী না হন। আয়ুবশাহী আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে নির্দেশ জারী করল যে ইউনিয়ন কাউন্সিল থানা ইত্যাদি সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জাতীয়তার সার্টিফিকেট দাখিল ব্যতিরেকে সংখ্যালঘুদের জমির কোনরকম হস্তান্তর চলবে না। এদিকে পরিবারের কর্তার ছেলেমেয়ে ভাই বোন—কেউ যদি ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে আর জাতীয়তার সার্টি-ফিকেট দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয় সাবরেজিষ্ট্রারদের গোপন সার্কুলারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে জমি বিক্রয়েচ্ছু সংখ্যালঘুর কোন আত্মীয় ভারতীয় নাগরিক বলে তাঁর সন্দেহ হলেই তিনি তাঁর জমি বিক্রয়ের দলিল রেজিষ্ট্রি করণে অস্বীকার করতে পারবেন। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা বিবাহ শ্রাদ্ধ অথবা শিক্ষা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্য সংখ্যা-লঘুদের জমি হস্তান্তর করার উপায় নেই। আর যেক্ষেত্রে সম্ভব সেখানেও পূর্বোক্ত গোপন সার্কুলারের জন্য সংখ্যালঘুদের ঘুষ দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

জমি হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের ব্যতিব্যস্ত করার একটি

সাম্প্রতিক নিদর্শন হল ১৯৬৪ সালের জানুয়ারির দাঙ্গার পর সংখ্যালঘুদের জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জারী করা অর্ডিনান্স। এর ফলে বাস্তুত্যাগেচ্ছুক সংখ্যালঘুদের নিঃস্বভাবে ভারতে আসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সৌভাগ্যের কথা সম্প্রতি ঢাকা হাইকোর্টের এক রায়ে এই অর্ডিনান্সকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে কারণ এ নির্দেশ পাক "শাসনতন্ত্র ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের বিরোধী"। তবে পাকিস্তান সরকার ন্যায়ালয়ের এই রায়কে মর্যাদা দিয়ে সংখ্যালঘুদের পীড়নকারী এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে অনিচ্ছুক বলে ঢাকা হাইকোর্টের রায় কার্যকর না করার ব্যবস্থা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বহু যৌথ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের একাংশ অনেককাল যাবৎ পশ্চিমবাঙলা সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চাকুরি ব্যবসা ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। আয়ুব খাঁর আমলে ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহের অধ্যক্ষদের কাছে গোপন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে যেসব সম্পত্তির কোন অংশীদার পাকিস্তানের বাইরে থাকতেন সম্পত্তির সেইসব অংশকে বিদেশীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিবেচনা করে তাঁরা যেন তার দখল নেন। এর ফলে সম্পত্তির অন্য শরিকদের টেকা দায় হয়েছে। কারণ তাঁদের পক্ষে এই জাতীয় যৌথ মালিকানার পুকুরের মাছ অথবা বাগান ও ক্ষেতের ফসল বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় অনেক ইউনিয়ন কাউন্সিলের অধ্যক্ষের চাপে এমনকি তাঁদের বাস্তুভিটার একাংশে মুসলমানদের থাকতে দিতে হয়েছে। এইসব মুসলমান আবার অনেক সময় বদপ্রকৃতির লোক এবং বহুক্ষেত্রে এরা ভারত থেকে আগত উদ্বাস্তু। তাই সর্বদাই কোন না কোন ছলে বিবাদ-বিসম্বাদ ঘটিয়ে ওইসব বাস্তুভিটা ও সম্পত্তি থেকে হিন্দু অংশীদারদের উৎখাত করাই এঁদের লক্ষ্য হয়।

যেখানে এইভাবে মুসলমানদের বসানো সম্ভব হয়নি সরকারী নির্দেশে সেখানে পাকিস্তানের বাসিন্দা যৌথ সম্পত্তির অংশীদারদের তাঁদের ভারতস্থ অংশীদারের সম্পত্তির আয় ব্যাঙ্কে এক বিশেষ খাতে জমা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজনে এই টাকা ওঠাবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ফলে পারিবারিক দেব-বিগ্রহের পূজা অর্চনার ব্যয় নির্বাহ বা ভারতস্থ অংশী-দারের সম্পত্তির খাজনা ইত্যাদি দেওয়ার উপায় নেই। ভারতস্থ অংশীদার তাঁর পাকিস্তানের শরিককে নিজ অংশ দান করতে চাইলেও করতে পারেন না। এর পরিণামে অনাদায়ী খাজনার দায়ে তাঁদের অংশ মুসলমানদের কাছে

বিক্রি হয়ে যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন সব লোকেরা এই অংশ কেনেন যাঁরা সম্পত্তির সংখ্যালঘু অংশীদারকে নানাভাবে হয়রান করে বাকি অংশটুকু আত্মসাৎ করার অভিসন্ধি পোষণ করেন।

ইভাকুয়ী প্রপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে গঠিত ইভাকুয়ী প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কমিটিতে মনোনীত সংখ্যালঘু সমাজের প্রতিনিধি থাকলেও প্রায়শঃ তাঁরা দুর্বল ও বশংবদ প্রকৃতির হন বলে কমিটি পক্ষপাতিত্ব করে পাকিস্তানত্যাগীদের সম্পত্তির অধিকার মুসলমানদের দিয়ে দেন। এছাড়া পাসপোর্ট দেবার ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের উপর পক্ষপাত এবং দুষ্টপ্রকৃতির মুসলমান কর্তৃক জোরজবরদস্তি করে সংখ্যালঘুদের ক্ষেতের ফসল, বাগানের ফল ও পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যাওয়া ও কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করা সত্ত্বেও ন্যায়বিচার না পাওয়া ইত্যাদি আরও বহুবিধ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা দলে দলে বাস্তুত্যাগ করছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবীণ বিপ্লবী নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ) মহাশয়ের হৃদয়বিদারক বিবৃতিটি (আনন্দবাজার, ১৫।৩।৬৪) এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়া স্টেটসম্যানের কলকাতা সংস্করণে ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কেদার ঘোষ মহাশয়ের দুটি প্রবন্ধ এবং ওই পত্রিকাতেই ১২ই মার্চ '৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৈমনসিংহ জেলার খ্রীষ্টান আদিবাসীদের মধ্যে একদা কর্মরত পাদ্রী সি. ভিক্টর. বার্নাড সাহেবের দীর্ঘ পত্রও পূর্ব পাকিস্তানের খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের কারণ বুঝতে সাহায্য করবে। ১৯৬৫ সনে প্রকাশিত ভারতীয় জুরিস্ট কমিশনের এতৎ-সম্বন্ধীয় প্রতিবেদনেও সাক্ষ্য সহযোগে প্রমাণ করা হয়েছে যে "পাকিস্তান ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বজনীন মানবিক অধিকার ঘোষণার ১৪টি অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করেছে এবং জাতিহত্যা (জেনোসাইড) কনভেনশনের তৃতীয় অনুচ্ছেদে দণ্ডনীয় বলে বর্ণিত চারটি ধারা অনুসারে অপরাধ করেছে" (যুগান্তর, ১২ই চৈত্র ১৩৭১)। এ ছাড়া সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশনের সমক্ষে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন (যার সামান্য অংশমাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে) তার থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের যে বিভীষিকার রাজত্বে কাল কাটাতে হয়েছে তার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যাবে।

॥ ৩ ॥

এইবার দেখা যাক পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের বাস্তুত্যাগের পূর্বোক্ত কারণগুলির অদূর-ভবিষ্যতে দূর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা।

অদূর-ভবিষ্যতে পাক সামরিক শাসনের চারিত্রধর্ম—সংখ্যালঘুদের উপর পক্ষপাতমূলক আচরণ করা—পরিবর্তিত হওয়ার বিশেষ আশা নেই। তবে একেবারে নেই তা নয়—ক্ষীণ আশার সূত্রটুকু হল পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান যদি সরকার গঠন করতে পারেন। এর কারণ সম্ভবতঃ পাকিস্তান সৃষ্টির মূলে নিহিত। হিন্দুদের প্রতি অবিশ্বাস ও হিন্দু-বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের জন্ম হয় এবং এক ইউনাইটেড ফ্রণ্টের কিঞ্চিদধিক তিন বৎসরের শাসনকাল ছাড়া এযাবৎ সর্বদাই পাকিস্তানের শাসকগণ তাঁদের দেশের সব অভাব-অসুবিধার কারণস্বরূপ ভারতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার প্রথা গ্রহণ করেছেন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে পাক-শাসকদের চোখে স্বাধীন ভারতবর্ষ অতীতের হিন্দু সত্তার প্রতীক। এ ব্যাপারে আয়ুব ও ইয়াহিয়া সরকার সেকালের মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সার্থক উত্তরসাধক।

পূর্ব পাকিস্তানে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হবে না—এ কথা জোর করে বলা যায় না। বরং এর উল্টোটাই সম্ভব। অর্থাৎ পাকিস্তানের শাসকবর্গ প্রয়োজন বোধ করলে খুলনার দাঙ্গার নায়ক পাকিস্তানের অন্যতম মন্ত্রী সবুর মিঞার মত কাউকে দিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে দিতে পারেন। আর স্থানীয় ছোটখাট সাম্প্রদায়িক বিবাদে শাসন কর্তৃপক্ষ যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করবেন এ কথা বলাই বাহুল্য।

অনুরূপ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবোধ ফিরে আসবে অথবা সম্পত্তির অধিকার ভোগ-দখল করার ব্যাপারে তাঁদের উপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে, তা দূরীভূত হবে, এমন ভরসা হয় না।

ভারত সরকার যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার জন্য বিশেষ কিছু করতে পারবেন তার সম্ভাবনা নেই। কারণ পাকিস্তান এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুসারে তাঁদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ কিছুই করণীয় নেই। যে ভ্রান্ত ধারণাপরবশ হয়ে স্বাধীনতার প্রাক্কালে জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা যে কত

অসার তা এই দীর্ঘ কয় বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝে নেওয়া উচিত। অবশ্য এখনও কোন ভারতবাসী (যদিও দায়িত্বশীল মহলের তাঁরা কেউ নন) মনে করেন যে হায়দ্রাবাদের মত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু এঁরা স্বপ্নরাজ্যে বাস করছেন। কূটনীতির কৌশলে পাকিস্তান পাশ্চাত্ত্য সামরিক জোটের সদস্য এবং রুশ ও চীনের সঙ্গেও তার গভীর আঁতাত। এমতাবস্থায় আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও চীন সবাইকে শত্রু করে ভারতের পূর্ব পাকিস্থান আক্রমণ করা উচিত কিনা এবং করলেও সে প্রচেষ্টায় কতটা সাফল্যলাভ করা সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এজাতীয় উন্মাদ পরিকল্পনার নৈতিক দিকের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল।

ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু বিনিময় এমনি আর এক উন্মাদ পরিকল্পনা। পাঞ্জাবে স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে রক্ত ও অশ্রুস্রোতে যা সম্ভবপর হয়েছিল বর্তমানে পাকিস্তান বা ভারতে তা সম্ভব নয়। এছাড়া ভারতে যদি একজনও যথার্থ ভারতীয় মুসলমান থাকেন (বাস্তবপক্ষে এঁদের সংখ্যা এক নয়, অনেক এবং পাকপ্রেমী ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত কম) তাহলে তাঁকে পাকিস্তানে চলে যেতে বলার কি অধিকার আমাদের আছে ? এছাড়া আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে যদি এই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয় তাহলে আমরা ৮০ লক্ষের কিছু বেশী পাক সংখ্যালঘুদের নিয়ে ৪ কোটির বেশী ভারতীয় মুসলমানকে পাকিস্তানে পাঠাব। ৫২ লক্ষ সংখ্যালঘু পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে আসায় আমরা যদি তাদের জন্য পাকিস্তানের কাছ থোক জমি দাবি করার কথা ভাবি তাহলে অতিরিক্ত ৩ কোটিরও বেশী মুসলমানের জন্য পাকিস্তান আনুপাতিক হারে ভারতবর্ষের কাছ থেকে জমি দাবি করবে না ? করলে ভারতের কোন্ অংশ আমরা নূতন করে পাকিস্তানকে দেব—পশ্চিমবঙ্গ না আসাম ?

কেউ কেউ মনে করেন যে ভারতীয় মুসলমানদের জিম্মী করে রাখা, তাঁদের পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের প্রতিভূ বিবেচনা করা এ সমস্যার একটা সমাধান। এই মনোভাব বলে যে নোয়াখালির দাঙ্গার জবাবে বিহারের দাঙ্গা, খুলনার দাঙ্গার জবাবে কলকাতার দাঙ্গা এবং ঢাকার দাঙ্গার জবাবে জামশেদপুর ও রৌরকেলার দাঙ্গা হল এ সমস্যা সমাধানের কার্যকর নীতি। এই যুক্তি পেশকারীদের কাছে ঢাকার রহিমের অপরাধে জামশেদপুরের রহমানের গলা কাটার নীতিগত অযৌক্তিকতার কথা বলা নিরর্থক। কিন্তু একটি কথা

এঁদের জেনে রাখা ভাল এবং তা হল এই যে ভারতীয় মুসলমানদের সত্য বা কাল্পনিক দুঃখে অশ্রু বওয়ানো পাকিস্তান শাসকদের রাজনৈতিক কৌশলের অঙ্গ, তাঁদের সমস্যার সমাধানের বাস্তব ইচ্ছা পাকিস্তান সরকারের নেই। এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ হল পাকিস্তানে ভারত থেকে যেসব মুসলমান উদ্বাস্তু গেছেন তাঁদের দুরবস্থা। এখনও তাঁদের অধিকাংশ শোচনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ হল এই যে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর ৫ লক্ষের বেশী পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে বেআইনীভাবে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে এসেছেন। স্বীয় নাগরিকদের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধানে অক্ষম সরকার অপর রাষ্ট্রের নাগরিকদের শুভাশুভের জন্য চিন্তিত হবে মনে করা বাতুলতা। আর তা ছাড়া এই মনোভাবের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু-দের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে গতবার খুলনার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় দাঙ্গা না বাধলে ঢাকা ও অন্যান্য জায়গার সংখ্যালঘুদের প্রাণ যেত না এবং তাঁদের ধনসম্পত্তিরও ক্ষতি হত না।

মাঝে মাঝে কোন দাঙ্গার পর ভারতবর্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সপক্ষে জনমত উদ্বেল হয়ে ওঠে এবং এই উদ্বেল জনমত সময় সময় ভারতীয় মুসলমানদের উপর সমজাতীয় অত্যাচারের অনুষ্ঠান করে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আত্মপ্রসাদ লাভ করলেও এ কথা এক নিষ্ঠুর সত্য যে মোটামুটি ভারতবর্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা খুব একটা বাঞ্ছিত আগন্তুক নন। এই কারণেই মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে এত কড়াকড়ি এবং বর্ডার সিল করে দেওয়া ইত্যাদি ব্যবস্থার শরণ নিতে হয়। এই কারণেই গত দাঙ্গার পর এবং ১৯৭০ সনে আগত শরণার্থীদের ভারতবর্ষের মাটিতে পা রাখামাত্র হয় দণ্ডকারণ্যে যেতে বাধ্য করা হয় আর নচেৎ যাবতীয় সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। অবশ্য এইসব সরকারী ব্যবস্থার সপক্ষে সরকারের অনেক কিছু বক্তব্য আছে এবং সেইসব বক্তব্যের অনেকটাই হয়তো যুক্তিযুক্ত। তবে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সাধারণভাবে এদেশে অবাঞ্ছিত মনে করা হয়—এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ব্যবস্থার সমর্থনে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ অপ্রাসঙ্গিক।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিশেষ করে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে আমরা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারির দাঙ্গার পূর্ব পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে ৪২ লক্ষের বেশী উদ্বাস্তু এদেশে

আসেনি। এঁদের মধ্যে ৮ লক্ষ কোন সরকারী সাহায্য না নিয়ে নিজেদের প্রয়াসে ভারতবর্ষে পুনর্বাসিত হয়েছেন। বাকি ৩৪ লক্ষ প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা ও দণ্ডকারণ্যে এবং স্বল্পসংখ্যায় আরও কয়েকটি প্রদেশে বসতি স্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই কোন রকমের একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেওয়া ছাড়া সুপরিকল্পিতভাবে আর্থিক পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়নি। পুনর্বাসনের মত একটি মানবিক সমস্যা বিজড়িত কাজের দায়িত্ব একান্তভাবেই সরকারী আমলাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে পুনর্বাসন দপ্তরের কাজ আর পাঁচটা সরকারী দপ্তরের মত চলছে যেখানে হৃদয়বৃত্তি অথবা ক্ষিপ্রতার কোন স্থান নেই। এবং এর চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার এই যে বছরের পর বছর কংগ্রেস, যাবতীয় বিরোধী দল এবং তাবৎ সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থাতে সন্তুষ্ট আছেন। সংবাদপত্র জনসভা অথবা বিধানসভা ইত্যাদিতে সরকারী পুনর্বাসন নীতির বিরুদ্ধে অনলবর্ষী বক্তৃতা দেওয়ার কোন মূল্য নেই। উদ্বাস্তুদের আর্থিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যোজনাবদ্ধভাবে তাঁদের সক্রিয় নেতৃত্ব দেওয়া, তাঁদের নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কর্মে লিপ্ত হওয়া—এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের আমরা সবাই যে ব্যর্থ হয়েছি একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট। অথচ প্রাণের টান থাকলে কেবল যে উদ্বাস্তুরা এসেছেন তাঁদেরই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের তাবৎ সংখ্যালঘুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন ব্যবস্থা অসম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহের মতে (লোকসভার বক্তৃতা ১২।২।৬৪) পূর্ব পাকিস্তানের তাবৎ সংখ্যালঘুর সংখ্যা ভারতের এক বৎসরের স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও কম এবং যে দেশ চতুর্থ পরিকল্পনায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে বলে স্থির করেছে তার পক্ষে এই উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য ৩৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। টাকাও বড় কথা নয়। সরকারী হিসাবে প্রকাশ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার এযাবৎ ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে কতটুকু? এ তো গেল সরকারী প্রচেষ্টার কথা। কেবল পশ্চিম বাঙলার জনসাধারণ ইচ্ছা করলে এ সমস্যার সমাধান কিভাবে করতে পারেন তার একটি আভাস দিয়েছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'যুগান্তরে' প্রকাশিত তাঁর "গ্রামের চিঠি"তে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে কয়েকটি করে পরিবারের দায়িত্ব নিলেই বেসরকারীভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়। তাই যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের ক্ষিপ্রগতিতে পুনর্গঠন অথবা পশ্চিম জার্মানী ও

ইজরাইল ইত্যাদি রাষ্ট্র কর্তৃক যেভাবে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের নিদর্শন দেখা যায় তখন এ ব্যাপারে আমাদের ব্যর্থতা পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে।

তেইশ বছরে বাহান্ন লক্ষ উদ্বাস্তু নিয়ে যদি আমরা এইভাবে হিমসিম খেয়ে থাকি এবং গত এক বছরে আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু আসায় যদি ভারতবর্ষের মত বিশাল দেশ বিব্রত হয়ে থাকে তাহলে সুপরিকল্পিতভাবে এক আধ বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাকি আশি লক্ষ উদ্বাস্তুকে ভারতবর্ষে এনে পুনর্বাসিত করা কী কঠিন ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। কোন যাদুমন্ত্র প্রভাবে সরকারের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন বিভাগের আমলারা অচিরাৎ বহুগুণ যোগ্যতা অর্জন করবেন না এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহও কর্তব্য-ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠবেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ভারতবর্ষে আসার পর পুনরায় বহু সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার কারণ বোঝা যাবে। ১৯৬৫ সনের ২রা এপ্রিল বিধানসভায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "১৯৬৪-র জানুয়ারীর দাঙ্গায় পনেরো মাসে···মোট প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে আসেন। ইহার মধ্যে ছিয়াশি হাজার পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন—ইহাই সবচেয়ে ভাবনার কথা।···পুনর্বাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা কেন গেলেন? সর্বস্বান্ত হইয়া যদি আসিয়া থাকেন, তবে ফিরিয়া যাইবেন কেন? ইজ্জত ধর্ম থাকিবে না, বাস করা অসম্ভব, তবে ফিরিয়া গেলেন কেন?" (যুগান্তর ৩।৮।৬৫)

॥ ৪ ॥

তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ কি?

বাস্তব অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে আগামী কয়েক বছরে হয়তো আরও কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু সেদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে আসবেন কিন্তু তারপরও বেশ কয়েক লক্ষ—হয়তো বা পঞ্চাশ লক্ষ বা তারও বেশী সংখ্যালঘু নিছক পেটের দায়ে পূর্ব পাকিস্তানে থাকতে বাধ্য হবেন। ইতিমধ্যে স্বাভাবিকভাবে তাঁদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই সংখ্যা ভারত ব্যবচ্ছেদের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সংখ্যার সমতুল হওয়াও বিচিত্র নয়। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যা যথাপূর্বং রয়ে যাবে।

পেটের দায়ে যাঁরা রয়ে যেতে বাধ্য হবেন স্বভাবতই ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদি

তাঁদের কাছে ক্রমশঃ গৌণ ব্যাপার হয়ে উঠবে। ১৯৬৪ সনের জানুয়ারির দাঙ্গার পর আগত যেসব উদ্বাস্তু ভারত থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাঁদের অনেকের ভিতরই এই মরিয়া ভাব লক্ষিত হয়েছে। তাঁদের মনোভাব কতকটা এই রকম: শেষ আশা-ভরসার জায়গা ভারতবর্ষেও যখন কোন ব্যবস্থা হল না তখন ভাগ্যে বাঁচামরা যাই থাক তা পূর্ব পাকিস্তানেই সংঘটিত হোক। এই রকম নৈরাশ্যপীড়িত চরমপন্থী লোকদের ধর্মান্তরিত হওয়া মোটেই আশ্চর্যের কথা নয়। পেটের দায়ে বাঁচার তাগিদে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, ধর্মান্তরিত হওয়া তো তুচ্ছ ব্যাপার। অতীতে মানুষ এ রকম অবস্থায় অনুরূপ আচরণ করেছে, ভবিষ্যতেও করবে। ভারতবর্ষে আমাদের অনেকের অহমিকাবোধ আহত হলেও একথা সত্য যে ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানে এর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে হলেও ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এই বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে জ্যামিতিক গতিবেগ সঞ্চারিত হওয় অসম্ভব নয়।

অবশ্য ধর্মান্তরিত হলেও বর্তমানের সংখ্যালঘুরা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের মত সমমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হতে পারবেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং এর বিপরীত ব্যাপার ঘটাই সম্ভব। এঁরা পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের এক অপাঙ্‌ক্তেয় অংশে পরিণত হতে পারেন। একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের হিন্দুদের কাছে বহুযুগ যাবৎ হরিজনরা যে ব্যবহার পেয়েছেন, আমেরিকার নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গদের কাছে অথবা ইরাণের বাহাই সম্প্রদায় ও পৃথিবীর আরও বহু দেশের ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতিগত সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছেন অভাবনীয় কোন কিছু না হলে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ তার চেয়ে উজ্জ্বল হলে মনে হয় না। খোদ পাকিস্তানেই শিয়া, কাদিয়ানী ও মোমিন ইত্যাদি ইসলাম ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের ললাটে কি এ ছাড়া অপর কোন বিধিলিপির সম্ভাবনা নেই?

আছে—একটির ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা গেছে এবং অপরটি প্রস্তাবমাত্র।

ক্ষীণ সম্ভাবনাটি হল পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের ভিতর আধুনিক অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিস্তৃতি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের একটি শক্তিশালী

অংশ গণতন্ত্রের মানদণ্ডে সেদেশের সরকারী বিধিব্যবস্থাকে মেপে তার মধ্যে ন্যূনতা আবিষ্কার করে এবং তারপর থেকে ক্রমশঃ গণতন্ত্র ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রবর্তনের দাবি পাকিস্তানে সরব হতে থাকে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের আধুনিক মনোভাবনার প্রথম সফল অভিব্যক্তি। এই মনোবৃত্তির ব্যাপক বিজয় ঘটে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে। তারপর তিন বছর ইউনাইটেড ফ্রন্টের শাসনের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ও আধুনিক মানসিকতার বিকাশ হয় এবং সামরিক শাসনের আমলে এর বাহ্য অভিপ্রকাশ ব্যাহত হলেও আদর্শবাদের মূল স্রোত অক্ষুণ্ণ আছে। সত্য ও ন্যায়বিচারের আগ্রহকে পৃথিবীর সবাপেক্ষা শক্তিশালী একনায়কও চিরকাল কণ্ঠরোধ করে রাখতে পারেন না এবং পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সাময়িক পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলে সেদেশে আধুনিক মানসিকতা, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার জয় একদিন হবেই এবং তখন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা হয়তো ন্যায়বিচার পাবেন।

এ আশা যে কল্পনাবিলাস নয় তার অন্যতম প্রমাণ হল পূর্ব পাকিস্তানের বিগত দাঙ্গায় প্রাতঃস্মরণীয় আমীর হোসেন চৌধুরী, কাজী রউফ, এমদাদ খাঁ ও তাঁদের মত আরও বহু (মোট ২২ জন) আধুনিক মনোভাবাপন্ন মুসলমানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য প্রাণোৎসর্গ। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের ভিতর ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত এই আধুনিক মানসিকতা কেবল পূর্বোক্ত দশ-বিশজন শহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণোৎসর্গ না করলেও সর্ববিধ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সংখ্যালঘুদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন—এমন বহু মহানুভব পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমানের পরিচয় বিগত দাঙ্গার সময় পাওয়া গেছে।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়ের পূর্বোক্ত বিবৃতি ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বহু উদ্বাস্তুদের জবানবন্দিতে এইসব সর্বদেশের সর্বকালের মনুষ্যসমাজের গর্বের পাত্র মহাপ্রাণদের কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া গেছে। বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের উপর তেমন কোন অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়নি—এরও অন্যতম কারণ এই নূতন মানসিকতা। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত সতীন সেন মহাশয়ের বিশ্লেষণও প্রণিধানযোগ্য (দ্রষ্টব্য : তাঁর জেলের ডায়েরী ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত তাঁর জীবনী)। এছাড়া আরও একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন হল শকুন্তল সেনের "পাকিস্তান ঘুরে এলাম"। ১৯৭০ সনের জুলাই-এ

হিন্দুদের পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে না যাওয়ার জন্য শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের অনুরোধ এবং তার থেকেও বড় কথা মুসলমানদের এইসব সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব নিতে তাঁর উদাত্ত আহ্বান—পাকিস্তানের এই নূতন মানসিকতার পরিচায়ক।

এই নবীন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আত্মবলের সাধনা বলে পূর্ব পাকিস্তানের এই নূতন ভাবধারার সাধকদের ভারতবর্ষ থেকে কোন রকম ভৌতিক সাহায্য দান করার প্রস্তাব করা হচ্ছে না। তবে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের ভিতর ক্রমবর্ধমান এই আধুনিক মনোভাবকে পুষ্ট করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে আমরাও অন্ততঃ দুটি জিনিস করতে পারি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের এই নবজাগরণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে—যা এযাবৎ বিশেষ করিনি। আমাদের জানতে হবে যে পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তানের জনসাধারণ সমঅর্থদ্যোতক শব্দ নয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব পাকিস্তানের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক অংশের শক্তি খর্ব হয় এমন কিছু ভারতে আমাদের করা উচিত নয়। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রচার, ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও অন্যায় অবিচারের অনুষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে বিকাশমান অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অনুশীলনকারীদের কাজকে আরও দুরূহ করে দেবে। সুতরাং আর কোন কারণে যদি নাও হয় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের কল্যাণভাবনা দ্বারা চালিত হয়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ যেন তাঁদের ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শ—ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্যে অচঞ্চল থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মানুষের মত বাঁচার দ্বিতীয় সম্ভাবনা—যাকে ইতিপূর্বে প্রস্তাবমাত্র রূপে অভিহিত করা হয়েছে—তা হল অহিংস সত্যাগ্রহের পন্থা। ঘটনাস্থল থেকে দূরে নিরাপদ ব্যবধানে থেকে এ জাতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করার জন্য সমালোচনার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবের যৌক্তিকতা হ্রাস পায় না। অথবা খান আবদুল গফুর খাঁ কিংবা বালুচ গান্ধী সামাদ খাঁর মত নেতার আপাত ব্যর্থতাও সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে পেশ করা যায় না। আধুনিক বিশ্বে কোন সুগঠিত সরকার এবং সংখ্যাগুরু সমাজের অন্যায় সিদ্ধান্ত ও আচরণের প্রতিরোধ করার একমাত্র পন্থা হল অহিংস সত্যাগ্রহ। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যদি তৎপর হন তাহলে সত্যাগ্রহের পথে তাঁদের মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার ফিরে পাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

সত্যাগ্রহ নীতির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনার স্থান বর্তমান প্রবন্ধ নয়। এখানে কেবল এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে দফায় দফায় মরা ও অপমানিত হওয়ার চেয়ে একদফা মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে বাঁচার প্রয়াস কেবল যে বাস্তববুদ্ধিযুক্ত তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অতীতের ত্যাগ ও আত্মদানের ঐতিহ্যের অনুকূলও এই পৌরুষময় পন্থা। আর একটি কথা। কেবল পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের প্রগতিশীল অংশের ভরসায় মানমর্যাদা নিয়ে সেদেশের সংখ্যালঘুরা কোনদিনই বসবাস করতে পারবেন না। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের মত সংখ্যালঘুদেরও আত্মবলের সাধনা করতে হবে এবং বিশেষতঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহের চেয়ে শ্রেয় কোন আত্মবলের সাধনার প্রক্রিয়া নেই।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় যে সন্দেহ ব্যক্ত করার সম্ভাবনা তা হল এই যে পূর্ব পাকিস্তানে সত্যাগ্রহ করার জন্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর মত নেতা কই? বিশেষ করে এ আদর্শে বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতা ও কর্মীই আজ যখন হয় সে-দেশ ছেড়েছেন আর নচেৎ সামরিক শাসকদের কারাগারে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সত্যাগ্রহ মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত কোন অভিনব প্রক্রিয়া নয়—সত্যাগ্রহ সম্ভবতঃ মানুষের সভ্যতার সমসাময়িক। মহাত্মা হওয়ার অনেক পূর্বে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা ও চম্পারণে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মত অত্যাচারিত এবং ভীতসন্ত্রস্ত মানুষদের সংগঠিত করে তাদের স্বাধিকার অর্জনে সহায়তা করেছিলেন। অতীতের যীশু ও চৈতন্য প্রভৃতি সার্থক সত্যাগ্রহীর উদাহরণ যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, এই শতাব্দীতে গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে বহু কমবেশী সার্থক সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রূঢ় ও প্যালাটিনেটের জার্মানরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডেনমার্ক ও স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশসমূহেও দখলকারী জার্মানদের বিরুদ্ধে এক জাতীয় সত্যাগ্রহ প্রযুক্ত হয়। আফ্রিকার কোন কোন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনায় সত্যাগ্রহের প্রভূত প্রভাব ছিল। আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার কিং ও তাঁর পর তাঁর অনুরাগী বিশপ এভারনেথী পরিচালিত সত্যাগ্রহ কিভাবে ধাপে ধাপে নিগ্রো সমাজকে স্বাধিকার অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার নিদর্শন তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের পর এখন তাসখন্দ চুক্তি বা শান্তি পর্বের কাল। কিন্তু তাসখন্দ চুক্তির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থার কোন ইতরবিশেষ হবার সম্ভাবনা নেই। তাঁদের সমস্যা পূর্বেরই মত রয়ে যাবে। সুতরাং তাঁদের সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ণ অবকাশ এখনও রয়েছে।*

* এই প্রবন্ধ যখন লেখা হয়, তারপর পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ-এর জন্ম হয়েছে। গণতন্ত্র-প্রেমিক ও নূতন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী এক নূতন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে মৌলবাদী ও কট্টর সাম্প্রদায়িক অংশ এখনও সেখানে সক্রিয়। আগামী যুগ সাগ্রহে অপেক্ষা করছে দেখার জন্য—কবে গণতন্ত্র ও উদার মত জয়লাভ করবে সমস্তরকম প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে। এই নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক ও উদার মানসিকতার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুরা কতটা ও কতখানি সামিল হয়ে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে ও বজায় রাখতে পারে তারই ওপর নির্ভর করছে তাদের

বাঙালী মুসলমান-সমাজ

একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বাঙালী বলতে সচরাচর আমাদের চোখের সামনে মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর চেহারাই ভেসে ওঠে। বাঙালী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান শোচনীয় রকমের অল্প। প্রায় আটশত বছর পাশাপাশি বাস করেও বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়—বিশেষত এর শিক্ষিত অংশ পরস্পরের খুব একটা কাছাকাছি আসেনি। বরং রাজনৈতিক কারণে প্রধানত এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে উভয় সম্প্রদায় মনের দিক থেকে দূরে সরে গেছে এবং এর পরিণামে হয়েছে ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বিভাগ। বাঙলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় অন্তত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালীর মনে বেশ কিছুটা মুসলিমপ্রীতির সঞ্চার হলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর রূঢ় আঘাতে মূলত ভাবাবেগপ্রধান সেই প্রীতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত দেশবিভাগের ক্ষত নিরাময় হয়নি এবং উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি একটা সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছে—এমন দাবি করা যায় না। অথচ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার হিসেবে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই মুসলমানদের সংখ্যা ৯০·৬৪ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ২০·৪৬ ভাগ এবং আশি দশকের প্রারম্ভে মুসলমানদের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ হবে অনুমান করা অন্যায় হবে না। এই বিপুল সংখ্যক বাঙালীর মন ও তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, সমস্যার কথা না বুঝলে বাঙলা ও বাঙালীর সঠিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হবে না।

১২০২ খ্রীস্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ জয় করার পরই বিধিবদ্ধভাবে বাঙলাদেশে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি হয়। যদিও এর অনেক আগেই ইসলাম ভারতে এবং বঙ্গে এসেছে এবং প্রচলিত ধারণার বিপরীত—রাজশক্তির সহায়তায় নয়, নিছক তার মানবীয় আবেদন ও প্রবর্তনা (persuasive) শক্তির গুণে এদেশে প্রসারলাভ করেছে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে, "রাজাদের আগমনে, লোক-লস্করদের তাড়নায় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বহুলোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে সত্য, তবু ভারতের যথার্থ জয় রাজরাজড়ারা বা সৈন্যসামন্তরা করে নাই ; তাহা ঘটিয়াছিল কেবল মুসলমান সাধু ও সাধকদের আগমনে।" আচার্য ক্ষিতিমোহনকে এই ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট বলা যায় না,

যেহেতু একনিষ্ঠ বৈদান্তিক বিবেকানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "ভারতের দরিদ্রদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যায় মুসলমান কেন? তরবারির বলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, একথা বলা মূর্খতা। জমিদার ও পুরোহিতদের দাসত্ব হইতে মুক্তির জন্য ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।" হ্যাভেল তাঁর 'Aryan Rule in India' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

যাইহোক, ইতিমধ্যে বাঙলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে কয়েকবার পালাবদল ঘটেছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাঙালী বৈদিক ধর্ম ও আর্যসভ্যতায় দীক্ষিত হয়েছে। তারপর এসেছে বৌদ্ধধর্মের প্রবল জোয়ার অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে—যা পালবংশীয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকতম হয়েছে। তারপর আবার দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদে (১১৫৮—১১৭৯) সেনবংশীয় রাজা বল্লালসেনের রাজত্বকালে সনাতন ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। বৈদিক এই পুনরভ্যুত্থানের পর্ব আদৌ স্বাভাবিক বা শান্তিপূর্ণ হয়নি। এই পর্বে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সনাতন ধর্মের প্রসারের জন্য বাঙলাদেশের অগণিত বৌদ্ধদের উপর বহু উৎপীড়ন-নিপীড়ন হয়েছে। অসংখ্য বাঙালী বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে বৈদিক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হলেও তাদের মধ্যে ক্ষোভ-বিরোধ-প্রতিবাদের মনোভাব থেকেই গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন রাজশক্তির আওতায় আবির্ভাব হল ইসলামের।

বাঙালীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের মূলে কিন্তু বহিরাগত তুর্কি, পাঠান অথবা মোগল জাতির মুসলমান নয়, এর মূলে রয়েছে অগণিত ধর্মান্তরিত হিন্দু—এ এক ঐতিহাসিক সত্য। বলা বাহুল্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় নিপীড়িত ও নিগৃহীত বৌদ্ধদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইসলামধর্মের কিছু পরোক্ষ সাদৃশ্যও আছে—বিশেষ করে বৈদিক ধর্ম ও মূর্তিপূজা ইত্যাদির বিরোধের ব্যাপারে। রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণে'র কালনির্ণয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁর রচনা যে সে সময়কার হিন্দুদের একটি অংশের মানসিকতার প্রতিচ্ছবি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইসলামের অভ্যুদয়ে অনেক বাঙালী হিন্দুই রামাই পণ্ডিতের মতো মনে করেছিলেন:

> ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কালো টুপি
> হাতে ধরে ত্রিকচ কামান…
> ব্রহ্মা হইলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
> মহেশ হৈল বাবা আদম…
> দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি…ইত্যাদি।

একথা সত্য যে রাজশক্তির পীড়নে, উচ্চপদ এবং ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদির বিনিময়ে অভিজাত হিন্দুদের ইসলামের শরণ নিতে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। ভারতের আরো অনেক এলাকার মতো বাঙলাদেশেও মুসলমানদের সংখ্যা স্ফীত করতে এইসব ঘটনা সাহায্য করলেও ইসলামের সাম্য ও উদার মানবিকতার বাণীর আহ্বান এবং মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের ব্যক্তিগত জীবন ও প্রেমের বাণীও ভিন্ন ধর্মের লোকদের ইসলামের শরণ নিতে কম অনুপ্রাণিত করেনি। ভারতে ইসলামধর্মের সূচনা হয় অষ্টম শতাব্দীতে যখন আরব বণিকেরা পশ্চিম উপকূলে বর্তমানের কেরলে পদার্পণ করেন। জাতিভেদপ্রথায় পীড়িত ও খণ্ডবিখণ্ড হিন্দু সমাজে তখন থেকেই ইসলাম একটু একটু করে স্থান করে নিতে থাকে, যখন রাজশক্তির সহায়তায় ইসলামধর্ম-প্রচার প্রায় অসম্ভব ছিল।

বখ্‌তিয়ার খিলজীর মাধ্যমে বঙ্গদেশে রাজশক্তিরূপে ইসলামের যে আবির্ভাব হয় তা মাত্র দশ বছরের ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই দশ বছর রাজা কংস ও রাজা যাতমল (ধর্মান্তরিত হয়ে যিনি জালালুদ্দিন শাহ নাম গ্রহণ করেন)—এই দুই হিন্দু রাজা বাঙলাদেশে রাজত্ব করলেও টি ডবল্যু আরনল্ড (The Preaching of Islam) এবং জে এইচ র‍্যাভেনশ (Gour : Its ruins and Inscriptions) প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে এই সময় বাঙালীর ইসলামধর্ম গ্রহণ করা হ্রাস না পেয়ে বরং অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল।

রাজশক্তি হিসাবে ইংরাজের আবির্ভাবের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ইসলাম যে সরকারী আনুকূল্য হারাল তা-ই নয়, তদানীন্তন শাসকরা পূর্বতন শাসক ও তাঁদের ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা বিরূপ ছিলেন। তবুও বঙ্গদেশে এই সময়ে ইসলাম ধর্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় ভাঁটা পড়েনি। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার প্রতিবেদনে দেখা যায়—"একথা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এযাবৎ ১০,০০০ ব্যক্তির মধ্যে উত্তরবঙ্গ বাদে ইসলামের আওতায় এসেছে ১০০ জন, পূর্ববঙ্গে এর সংখ্যা ২৬২ ও পশ্চিমবঙ্গে ১১০ জন অর্থাৎ গড়ে সমগ্র বাঙলাদেশে ১৫৭ জন। মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি যথার্থ ও প্রভূত। এই হার যদি বজায় থাকে তাহলে আগামী সাড়ে ছয় শত বৎসরে সমগ্র বঙ্গে মহম্মদের ধর্মবিশ্বাস সর্বজনীন হয়ে পড়বে এবং পূর্ববঙ্গে এ অবস্থা আসতে লাগবে প্রায় চারশত বৎসর।...উনিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে ৫ লক্ষ বেশি ছিল এবং কুড়ি বৎসরেরও কম

সময়ের মধ্যে মুসলমানরা যে কেবল হিন্দুদের সমান হয়েছেন তা-ই নয়, তাঁদের থেকে সংখ্যায় ১৫ লক্ষ অধিক হয়ে পড়েছেন।”

ইসলামের অভিঘাতে বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রবল আলোড়ন এবং ভাঙন শুরু হলেও প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ার বা সমন্বয়-সাধনের একটি ধারাও এর পাশাপাশি জেগে ওঠে। মধ্যযুগের এই ধারার উৎসসন্ধান করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় দেখেছেন, “মুসলমান-সাধনা ও মুসলমান-শক্তির আবির্ভাবে এই যুগ পুনরায় ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠিল। নানা অন্ধতায় ধর্মের আচারের জটিলতায় ভক্তিভাবের অতি সরসতায় যে সহজ প্রেম ও ভক্তি চাপা পড়িয়াছিল তাহা এই আঘাত পাইয়াও মুসলমান-সাধনার একেশ্বরবাদে দৃঢ় নিষ্ঠায় নতুন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল···।” আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু-সমাজ কূর্ম-বৃত্তি গ্রহণ করে বাঁচার চেষ্টা করলেও শীঘ্রই উপলব্ধি করে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব এবং তাই ধর্ম ও সংস্কৃতি—বিশেষ করে এর লৌকিক পর্যায়ের ক্ষেত্রে পারস্পরিক লেনদেন শুরু হয়। তদানীন্তন সমাজ ছিল মূলত গ্রামীণ। তাই উভয় সম্প্রদায়ের লোককে সুখে-দুঃখে পাশাপাশি থাকতে হত। তদুপরি অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের আচারব্যবহার, ধ্যানধারণা অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জীবনের মূল রেশ রয়ে গেছে হিন্দুসমাজের মধ্যে। স্বভাবতই এই সমন্বয়প্রক্রিয়া সাধারণ্যে প্রসারলাভ করল।

হিন্দুসমাজে পীরপুজা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের মাধ্যমে স্বীকৃতি পেল। তাঁর পুজোপকরণ ‘সিন্নি’ বাঙালী হিন্দুর কাছে অজ্ঞাত হলেও শীঘ্রই তা বহুল-প্রচারিত হল এবং পীরফকিরের দরজায় মানত করা, সুতো-বাঁধা, চেরাগ জ্বালানো অথবা ওলাবিবি এবং শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর পুজা সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচলিত হল। মুসলমানদের পীরপুজা, কদম রসুলের স্বীকৃতি, মোহরমের তাজিয়া বার করা ইত্যাদি বহু প্রথা স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে স্বীকৃতি পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর পুঁথিপত্র ঘেঁটে ডঃ এনামুল হক্ প্রমাণ করেছেন যে সেকালের মুসলমান-সমাজে হিন্দুদের মতোই অন্নপ্রাশন, অধিবাস, মঙ্গলঘট, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ইত্যাদি প্রথার প্রচলন ছিল। তাছাড়া সুফী মতবাদের প্রচার এবং আউল, বাউল, কর্তাভজা ও দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উদার মানবিক সাধন-ভজনের পদ্ধতি জনপ্রিয় হওয়ার ফলে সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়া আরও নিবিড় হল। সুলতান হোসেন শাহ ও তাঁর পুত্র রাজা নসরৎ খাঁর অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ সর্বপ্রথম বাঙলায়

মহাভারত অনুবাদ করান। প্রাচীন বাঙলার আলাওল, দৌলতকাজী, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহম্মদ খাঁ ও আবদুল নবী প্রমুখ কবিদের রচনায় কেবল আরব-দেশের মরুভূমি ও খর্জুরবীথির পরিচয় বাঙালীর কাছে আসেনি, বাঙলার নদীনালা শ্যামলিমা থেকে স্বরু করে রাধাকৃষ্ণের বিরহমিলনের কথাও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।' বাঙলাভাষা কেবল অতিসাম্প্রতিক কালের 'বাংলাদেশের' জন্মের মূলে নেই ; বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষার সমন্বয়কারী শক্তির প্রাবল্য যুগে যুগে বাঙালী মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'নূর-নামা'র লেখক (নোয়াখালির সন্দীপ নিবাসী) আবদুল হাকিমের একটি কবিতায় এই বাঙালী মানসিকতার চমৎকার পরিচয় মেলে—

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি ॥
মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি ॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুরায়—
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায় ॥"

কেবল আবেগের দিক থেকেই নয়, বাস্তবক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি থাকার ফলে একে অপরের উৎসব-ব্যসনে, পালপার্বণে অংশগ্রহণ করেছে। একসঙ্গে ভাটিয়ালি, জারি-সারি অথবা আলকাপ গেয়েছে। পাশাপাশি বসে হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম্যকবির তরজা, কথকতা কবির লড়াই উপভোগ করেছে।

মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাতে আর্থিক ক্ষেত্রে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় এবং ইংরাজ আমলে যার প্রসারের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্পর্কে চিড় ধরে তা কিন্তু প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর এবং পরবর্তীকালে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে রাজ-অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপার। সাধারণ গ্রামীণ হিন্দু-মুসলমান কৃষক অথবা হস্তশিল্পীদের মধ্যে এই জাতীয় আর্থিক স্বার্থ-সংঘাত বিশেষ ছিল না। বরং তাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া কাজ করেছিল, যার জন্য লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্ম একটি নতুন সমন্বয়ীরূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু ইংরেজের আগমনে উভয় সমাজের অভিজাত শ্রেণী ভিন্নমুখী হওয়ায় এবং অপর দিকে শাসক শ্রেণীর ভেদনীতির ফলে সমন্বয়ের এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বাধা পেল।

॥ ২ ॥

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বঙ্গদেশেও মুসলমান সমাজে দুটি স্তরভেদ দেখা যায়। এর প্রথমটি হল স্বল্পসংখ্যক বহিরাগত এবং তাঁদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ অভিজাত সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টি হল বহুলসংখ্যক স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান—যাঁদের অধিকাংশই খেটে-খাওয়া মানুষ। অপর যে-কোন সমাজের মতোই ভারত তথা বঙ্গদেশে মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন ঐ স্বল্পসংখ্যক অভিজাত সম্প্রদায়।[৮] সুতরাং ইংরেজের আগমনের পরবর্তীকালীন মুসলমান-সমাজের ইতিহাস জানার পক্ষে এই অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসিকতার বিবর্তন জানা অপরিহার্য। ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্বে উচ্চতর সরকারী পদে এবং ব্যবসায়ে অভিজাত মুসলমানদের একরকম একচেটিয়া অধিকার ছিল—যা পরবর্তীকালে তাঁরা ক্রমেই হারালেন। ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের হাত থেকে রাজশক্তি কেড়ে নেন বলে তাঁদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব যেমন ছিল অপর দিকে তেমনই ইংরেজরা তাঁদের অবিশ্বাস করতেন এবং রাজদণ্ড বজায় রাখার জন্য তাদের কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকতেন।

ইংরেজ রাজশক্তি সর্বপ্রথম আঘাত হানলেন বাঙলার অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের উপর। সরকার ও রাজস্ব আদায়কারী রাজকর্মচারী হিসেবে এই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা আর রইল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অভিজাতদের প্রভাব রাজস্ববিভাগে হ্রাস পেতে লাগল এবং অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে এই ক্ষেত্রে মুসলমান অভিজাতরা চিরবিদায় নিলেন। এযাবৎ যে হিন্দুরা এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত বা বড় বেশী হলে নগণ্য কর্মচারী ছিলেন, তাঁদেরই আবির্ভাব ঘটল জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীরূপে এবং রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়ায় যে অর্থ ইতিপূর্বে মুসলমানেরা পেতেন তার অধিকাংশ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। ক্রমে ক্রমে নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর বিবেচনা করে সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদ থেকেও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের অপসারিত করল কোম্পানি।

পরবর্তী আঘাত পড়ল ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থার উপর। কোম্পানি রাজত্বের প্রথম যুগেও নবাবি আমলের ফারসি-শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিচারপদ্ধতি কায়েম ছিল। এর মাধ্যমে যে মুসলমান-অভিজাতদের একাংশের

রুজিরোজগারের ব্যবস্থা হত তা-ই নয়, তাঁদের একটা প্রতিষ্ঠাও ছিল এই শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থাকে অবলম্বন করে। কিন্তু কোম্পানী রাজত্বের বছর পঞ্চাশ পরে ফারসি শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটান হল এবং বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। বাঙলাদেশে এটা অবশ্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং হিন্দুদের কাছে অতীব বাঞ্ছনীয় মনে হলেও মুসলমান-অভিজাতদের কাছে স্বভাবতই সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা আরও একট প্রবল ধাক্কা খেলেন যখন সরকারী কাজের মাধ্যম হল ইংরেজি ভাষা। এর ফলে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটতে লাগল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ মেকলের শিক্ষানীতি গ্রহণের সময় বড়লাটের পরিষদ সিদ্ধান্ত করল শিক্ষাখাতে ব্যয়িত সরকারী অর্থ কেবলমাত্র ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে লাগবে এবং "প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে না দিলেও শিক্ষাকালে তার ছাত্রদের সহায়তা দেওয়ার নীতি পরিত্যক্ত হবে।" লর্ড বেন্টিঙ্ক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করলেও বাঙলাদেশের নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মনে আশঙ্কা হল তাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শাসককুলের এটা একটা ছল মাত্র। তাই তাঁরা এইসব বিধিব্যবস্থাকে সযত্নে পরিহার করে চলতে লাগলেন এবং হিন্দুরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। সুতরাং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের প্রাধান্য দেওয়ার নীতি গৃহীত হল স্বভাবতই হিন্দুরা আরো এগিয়ে এলেন আর মুসলমানেরা হলেন আরো কোণঠাসা। ফলত নতুন বিধিব্যবস্থার প্রবর্তক ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের প্রতিও তাঁরা রুষ্ট হলেন।

অপরদিকে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান—বিশেষত কৃষকদেরও ক্ষোভের কারণ ঘটল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী সরকারকে দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট হলেও জমিদারেরা (যাঁদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু) মূল্যবৃদ্ধির দোহাই দিয়ে চাষীর খাজনা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। মুসলমান-হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের চাষীরা বর্ধিত করভারে পীড়িত হচ্ছিলেন। এই অসন্তোষকে ভাষা দেবার মতো নেতৃত্ব বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে তখন ছিল না, যেহেতু অভিজাত শ্রেণীর হিন্দুরা নবলব্ধ সুযোগসুবিধার দরুণ শাসক ইংরাজের জয়গানে মশগুল। পক্ষান্তরে, মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিপূর্বেই বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। তাই অনেকটা হতাশাপীড়িত হয়েই তাঁরা সাধারণ মুসলমানকে মুস্‌লিম কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁদের অনুগামী হতে ডাক দিলেন।

ওহাবী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ মূর্ত হয়ে ওঠে। বাঙলাদেশে হাজী শরিয়তউল্লা ও তাঁর পুত্র তুহু মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলন ওহাবী আন্দোলনের পূর্বগামী ছিল। ভারতে ওহাবী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রায়বেরেলির সৈয়দ আহমদ। তিনি মুসলমানদের হতমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মুসলমান সম্প্রদায়কে একাগ্রভাবে ইসলামনিষ্ঠ হতে পরামর্শ দেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐস্লামিক পুনরুত্থানের এই নায়ক তাঁর নিষ্ঠা ও আদর্শের জন্য প্রায় অবতারের মর্যাদা পান এবং তিনি 'ফর্মান জারি' করাও আরম্ভ করেন। সুদূর বাঙলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর বহু অনুগামী তৈরী হয়। শীঘ্রই সৈয়দ আমহদের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে।

পঞ্জাবের তদানীন্তন শিখ শাসক মহারাজ রণজিৎ সিং-এর বিরুদ্ধে জেহাদ করতে গিয়ে সৈয়দ আহমদ নিহত হলেও ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব বজায় রইল। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' অর্থাৎ বিধর্মী-শাসিত দেশ বলে ঘোষণা করে সাচ্চা মুসলমানদের 'দার-উল-ইসলাম' অর্থাৎ ঐস্লামিক দেশে যাবার জন্য হিজরৎ করার প্ররোচনা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওহাবীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে জেহাদ শুরু করে। পরিণামস্বরূপ ওহাবীদের ব্যাপক ধরপাকড় এবং শাস্তি দেওয়া আরম্ভ হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ওহাবী আন্দোলনের অভিযুক্তদের বিচার হয় এবং বিচার ও শাস্তিদানের অন্যতম নায়ক কলকাতার তদানীন্তন প্রধান ইংরেজ বিচারপতিকে ওহাবীরা হত্যা করে।

আন্দোলনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন জননায়কদের মধ্যে—যথা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভি ও শাহ ইসমাইল শহীদ, রায়বেরেলির সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর ভাবশিষ্য পাটনার বিলায়েৎ আলি ও এনায়েৎ আলি এবং বঙ্গের তিতুমীর ও জৌনপুরের কেরামৎ আলি প্রভৃতির পার্থক্য থাকলেও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—ইসলামের শুদ্ধীকরণ ও ইসলামি রাজত্ব কায়েম করা। এর ফলে বাঙলাদেশের মাটিতে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে সহজ সমন্বয় ৭০০ বছর পুষ্টিলাভ করেছিল তার পূর্ণচ্ছেদ ঘটল। বাঙলার মুসলমানেরা—অন্তত নেতৃস্থানীয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে লাগল। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানগণ বিচ্ছিন্নতাবাদের কবলে পড়ল—যার পরিণাম পরবর্তীকালে মারাত্মক হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সিপাহি-বিদ্রোহ ঘটে গেছে। এই বিদ্রোহে মুসলমান-হিন্দু-শিখ-মারাঠা প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সৈন্য থাকলেও শেষ মোগলসম্রাট বাহাদুর শাহকে কেন্দ্র করে এটি সংঘটিত হওয়াতে, এবং অন্যান্য বহু কারণে ইংরেজশাসককুল কেবলমাত্র মুসলমানদেরই প্রধানত বিদ্রোহের দায়ভাগী করেন। কারণ ইংরেজরা মনে করতেন সিপাহি-বিদ্রোহ মূলত মুসলমান রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। তাই মুসলমানদের উপর প্রবল নির্যাতন চালান হয়। ওহাবী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের বার্থতা সরকারী নির্যাতনকে জোরদার করে।

ক্রমাগত পীড়ন ও শোষণের দরুণ মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে মুসলমানদের ইংরেজ-বিরোধিতার অবসান ঘটে, পরিবর্তে তারা সরকারী পক্ষপুটের আশ্রয়ে থেকে হিন্দুদের মতো উন্নতির পথে পা বাড়ায় এবং বিলম্বিত হলেও ঈর্ষান্বিতচিত্তে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে মনস্থ করে। এই নতুন মানসিকতার প্রতীকস্বরূপ কলকাতায় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'মহমেডান লিটারারি সোসাইটি'র জন্ম হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল লতিফ হলেও স্যার সৈয়দ আহমদ এবং কলকাতার বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলি এর দুই দিকপালরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

মুসলমান সমাজের পথপরিবর্তনের কথা আলোচনা করার পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। এটি হল উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে উত্তর ভারতের হিন্দি-উর্দু বিবাদ—সরকারী কাজকর্মের ভাষা উর্দু হবে না হিন্দি হবে। বাঙলাদেশে এই বিবাদ একটু ভিন্ন রূপ নেয়, এখানে মুসলমানদের দাবি—বাঙলা ভাষা যদি মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার মাধ্যম হয় তবে সেই বাঙলা ভাষা সংস্কৃতের বদলে ফারসিবহুল হতে হবে। হান্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্'-এর সুরে সুর মিলিয়ে ফারসি বা উর্দুভাষী অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ১৮৮২ খ্রীঃ শিক্ষাকমিশনের কাছে দাবি পেশ করলেন যে বাঙালী হিন্দু ছাত্রদের কাছে বাঙলা ভাষার যে স্থান, মুসলমান ছাত্রদের কাছে উর্দুর সেই স্থান হতে হবে (আমীর আলি)। নবাব আবদুল লতিফ খান বাঙলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুর মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত হিন্দুয়ানি দেখতে পেলেন। উপরন্তু হিন্দু গুরু, তাঁদের মতে, মুসলমান কৃষকসমাজের ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞ। সুতরাং মুসলমান ছাত্রদের জন্য শুধু আরবি-ফারসি নয়, ইংরেজি শেখাবার জন্যও পৃথক শিক্ষকের দাবি উঠে। পরবর্তীকালে চাকুরি ইত্যাদির সুবিধালাভের

জন্য এই যে ভাষাবিবাদ, তার থেকে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজে ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং পরিণামে বিচ্ছেদকামী মনোভাবের জন্ম হয়।

॥ ৩ ॥

স্যার সৈয়দ আহমদ ইংরেজের অনুগামী হলেও প্রথম দিকে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। বরং বহুক্ষেত্রেই তিনি হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থানের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকাই মুসলমানদের অনগ্রসরতার কারণ মনে করে তিনি ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে রাজনীতির সম্পর্ক বাঁচিয়ে শিক্ষাপ্রসারই মুসলমানদের একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করতেন। আলিগড়ে তিনি যে কলেজ স্থাপন করেন এবং যা পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় তার ইংরেজ অধ্যক্ষ থিয়োডর বেকের প্রভাব তাঁর উপর গভীরভাবে পড়ে। থিয়োডর বেক এবং থিয়োডর মরিসন স্যার সৈয়দ এবং তাঁর অনুগামীদের গোড়ায় রাজনীতি থেকে দূরে রাখা এবং পরে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মত ও কর্মসূচী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন, ইংরেজ শাসককুলের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

সৈয়দ আমীর আলি ও তাঁর 'ন্যাশনাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন' দৃশ্যত অসাম্প্রদায়িক এবং জাতীয়তাবাদী হলেও চাকুরি-ক্ষেত্রে মুসলমানদের—বিশেষত পশ্চিমবাঙলার মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং মুসলমানদের জন্য চাকুরি সংরক্ষণের ও পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। এহেন পরিস্থিতিতে বাঙলাদেশে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদ হিন্দু পুনরুত্থানের পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক ছিল। সরকারী কর্মে ভারতীয়দের ন্যায়সঙ্গত অংশ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, কৃষকদের দারিদ্র্যমোচন, লবণকর রদ এবং বন-আইন সংশোধন প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখ্য কর্মসূচী ছিল। বেক ও মরিসনের প্রভাবপুষ্ট স্যার সৈয়দ ও তাঁর আলিগড় গোষ্ঠীর মুসলমানেরা পূর্বোক্ত প্রতিটি দাবির পিছনে হিন্দুদের দুরভিসন্ধি দেখতে লাগলেন এবং তাঁরা প্রধানত অভিজাত ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে কৃষকদের দুরবস্থা-মোচন, লবণকর রদ প্রভৃতি দরিদ্রকল্যাণকর কর্মসূচী তাঁদের আকর্ষণ

করেনি। সৈয়দ আমীর আলি ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম বৎসর কংগ্রেসের বিরোধিতা না করলেও 'কংগ্রেসের কর্মসূচী মুসলমানদের রাজনৈতিক দিক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে' মনে করে দ্বিতীয় বৎসর থেকে এর বিরোধী হলেন।

এতৎসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের প্রধান বাহক হিসেবে কংগ্রেসের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। বদরুদ্দীন তায়েবজীর মত প্রতিষ্ঠাবান একজন মুসলমান কংগ্রেসের কর্ণধারদের একজন হলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুসলমান-সমাজও বহুলাংশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় এল। যদিও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশই দূরে সরে সরে রইলেন। অন্যদিকে শাসক ইংরেজ এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের গতি রুদ্ধ করতে আগ্রহী হলেন। মুসলমান সমাজকে এই কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের পীঠভূমি বাঙলাকে দুই অংশে—পশ্চিমভাগ হিন্দু বাঙলা ও পূর্বভাগ মুসলিম বাঙলায় বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তদানীন্তন বড়লাট কার্জনের সময়। এই চক্রান্ত বঙ্গভঙ্গ নামে খ্যাত। বঙ্গভঙ্গের আদেশ সরকারী নীতির পালাবদলেরও দ্যোতক। কার্জন মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানেরা এমন ঐক্য ও শক্তির অধিকারী হবেন যা নবাবি আমলেও ছিল না। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গভঙ্গ আইন হলেও ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দেই জনসাধারণ এই ঘৃণ্য পরিকল্পনার কথা জানতে পারে এবং তখন থেকে কেবল হিন্দুরাই নয়, মুসলমান-সমাজের একাংশও বিদ্রোহে ফেটে পড়েন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের নেতাদের অন্যতম ছিলেন। পরে সম্ভবত অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তিনি মত পরিবর্তন করেন। তথাপি হিন্দুদের সঙ্গে সমভাবে মুসলমানদের অধিকাংশ বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ আইন রদ করতে বাধ্য হন।

বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতেই শাসকশক্তি নবতর শক্তিতে ভেদনীতির কর্মসূচী গ্রহণে তৎপর হয়। ভারতে যে নতুন শক্তির জন্ম হচ্ছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের যে-কোন উপায়ে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলারা তৎপর হলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন আলিগড় কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ আর্চিবল্ড। এঁদের যোগসাজসে আগা খাঁয়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের এক প্রতিনিধিদল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা, সরকারি চাকুরিতে পদ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভেদপন্থী দাবি পেশ করেন। বড়লাট তাঁদের

প্রতি 'সুবিচারে'র প্রতিশ্রুতি দিলেন। অতঃপর ভারতের ছয় কোটি মুসলমানকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা হয়েছে বলে আমলাগোষ্ঠী উল্লসিত বোধ করলেন।

সিমলা দরবারে সফল আলিগড়-নেতৃত্ব সেই বছরই ৩০শে ডিসেম্বর হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও দ্বন্দ্বের পীঠস্থান ঢাকায় মিলিত হলেন এবং বিভেদপন্থী রাজনীতির সফলতার উদ্দেশ্য নিয়ে 'মুসলিম লীগ' স্থাপন করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় লীগের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে 'হিন্দু মহাসভা'র জন্ম হয়। এবং পরোক্ষে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্মের পরিবেশ ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করল। লীগ-নেতৃত্ব সরাসরি আন্দোলনের পথে না গিয়ে আবেদন-নিবেদনের পন্থা গ্রহণ করে, কখনো নরম কখনো বা গরম সুরে। কারণ, মুসলমানেরা দেখলেন, আন্দোলন করে কংগ্রেস যা পাবে, এ পন্থায় তাঁরা পাবেন তার বহুগুণ বেশি। এরও ব্যতিক্রম ঘটল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিতে মনস্থ করলে কংগ্রেস ও লীগ খুব কাছাকাছি এল এবং তার ফলে খিলাফতের প্রশ্নে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বহুলাংশে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধিত হল। তবে মুসলমান ধর্মগুরু হিসেবে তুরস্কের শাসক 'খলিফা'র পদ বজায় থাকবে কিনা—রাজনীতিতে এই জাতীয় ধর্মীয় প্রশ্নের আমদানি করা সমীচীন ছিল কিনা, এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবে আজো করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক জনাব জিন্নাহ খিলাফৎকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার বিরোধী ছিলেন। বাঙলার নেতা বিপিনচন্দ্র পালও এর বিরোধী ছিলেন। কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্কে খলিফার পদ বাতিল হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও এই আন্দোলন নিরর্থক হয়ে গেল। এর পরপরই সাময়িক হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ মাথা চাড়া দিল।

এরই মধ্যে ১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন এসে পড়ল। ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের কাঠামো তৈরি করার জন্য দুটি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হল; শাসকদের নির্লজ্জ ভেদনীতিমূলক প্রতিনিধি-নির্বাচনের জন্য এই বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অতঃপর সরকারি সূত্র অনুসারে অন্যান্য সম্প্রদায়সহ মুসলমানদের জন্য পৃথক-নির্বাচনের ব্যবস্থা, আসন-সংরক্ষণ ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অধিক আসন দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থায় সব সম্প্রদায় ও দল পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলেও পূর্বোক্ত বণ্টনের ভিত্তিতে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে

সব দলই অংশগ্রহণ করে। বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ যে উগ্র সাম্প্রদায়িক ছিল না তা এই নির্বাচনের সময় প্রকাশ পায়। বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পৃথক নির্বাচনের দাবি অগ্রাহ্য করে যৌথ নির্বাচনের দাবি জানায়। এমনকি মৌলানা মহম্মদ আলির মতো প্রবলপ্রতাপ নেতার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করে বাঙলার খিলাফৎ কমিটি নেহেরু রিপোর্টের যৌথ-নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায়।

১৯৩৬ সালের নির্বাচনে বাঙলায় ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে লীগ পায় মাত্র ৪০টি আসন। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাড়াহুড়ো করে সংগঠিত ফজলুল হক সাহেবের 'কৃষক-প্রজা পার্টির' ফলাফল লীগের তুলনায় বরং প্রশংসনীয় ছিল। হক সাহেব এক সময় লীগের সঙ্গে থাকলেও পরবর্তীকালে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে সরে আসেন এবং প্রধানত বাঙলার কৃষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হন এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। বলাই বাহুল্য, বাঙলার কৃষকসমাজের সদস্যরা অধিকাংশই ইসলাম-ধর্মাবলম্বী। ফজলুল হক সাহেব মুসলমানদের নেতা হিসাবে অগ্রগণ্য হলেও কট্টর সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তাঁর দলের নামেও নিছক মুসলমানী ছাপের পরিবর্তে আর্থিক কর্মনীতির বলিষ্ঠ ইঙ্গিত ছিল এবং ভোটযুদ্ধেও স্বাভাবিক কারণেই 'কৃষক-প্রজা পার্টি' মুসলমান সংগঠন হিসেবে ভোটারদের দ্বারস্থ হয়নি। হক সাহেবের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ হিসেবে আর একটি রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য তাঁরা লীগের দ্বারস্থ না হয়ে কংগ্রেসের কাছে যান। কিন্তু বাঙলার কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দোহাই দিয়ে হক সাহেবের প্রস্তাবিত কোয়ালিশন থেকে বিরত থাকেন। কতকটা ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং বিরক্তিবশত ফজলুল হক সাহেব মুসলিম লীগের সহায়তায় মন্ত্রীমণ্ডল গঠনই যে করলেন তা নয়, সদলবলে লীগে যোগদানও করলেন। কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই অদূরদর্শিতা ও মারাত্মক ভুলের দরুণ বাঙলায় লীগের প্রভাব নিশ্চিতভাবে বেড়ে গেল, ফলে পরবর্তীকালে দেশবিভাগের পথ প্রশস্ত হল।

মুসলিম লীগের চরিত্রধর্মে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলেও তদানীন্তন যুক্তপ্রদেশে নির্বাচনের ব্যাপারে লীগ ও কংগ্রেস একটা চলনসই সমঝোতা করে, কিন্তু নির্বাচনের পর লীগকে চুক্তিমতো মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে অস্বীকার

করে কংগ্রেস এবং মন্ত্রীসভায় সীমিত সংখ্যক আসনলাভের জন্য লীগের সামনে এমন সব শর্ত রাখে যা লীগের পক্ষে শুধু ক্ষতিকরই নয়, আত্মহত্যা তুল্যও বটে। অতএব লীগ ঐসকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং কংগ্রেসের কাছ থেকে সুবিচার পাবার আশা ত্যাগ করে। অতঃপর লীগ কংগ্রেসের প্রবলতম শত্রুতে পরিণত হয় এবং কংগ্রেসকে কেবলমাত্র হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মে লিপ্ত হয়। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার-অবিচার হচ্ছে এই সত্য-মিথ্যা অভিযোগে লীগ-নেতৃত্ব মুখর হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে কংগ্রেস তথা হিন্দুর সংস্পর্শে ইসলামের সমূহ বিপদ।

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে লীগ ভারতের মুসলমানদের নিজস্ব পৃথক রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেয় এবং 'পাকিস্তান' গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং ঐ যুদ্ধে ভারতের নেতৃবৃন্দের অমতে ভারতকে যুদ্ধলিপ্ত করার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করলে মুসলিম লীগ তা মুক্তি-দিবস হিসেবে পালন করে। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ এবং আগস্ট আন্দোলনেও লীগ বিরুদ্ধাচরণ করে এবং প্রচার করে যে কংগ্রেসের এই আন্দোলন মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী। মহম্মদ আলি জিন্নার কুশাগ্র রাজনৈতিক বুদ্ধির ফলে পঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশ কোয়ালিশন এবং দল ভাঙা-গড়ার রাজনৈতিক খেলার মাধ্যমে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ইংলণ্ডে শ্রমিকদলের সরকার গঠিত হয় এবং সেই সরকার ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার প্রতিবিধানে উদ্যোগী হয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রয়াসই মুসলিম লীগের নানাবিধ দাবিদাওয়ার জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে না। লীগের অন্যতম দাবি ছিল মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করা এবং লীগ-বহির্ভূত কোন মুসলমানকে অস্থায়ী সরকারে প্রতিনিধিত্ব করতে না দেওয়া। মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি কে তা নির্ধারণ করা সরকারের পক্ষে সহজ না হওয়াতে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ৪ ॥

১৯৪৬-এর নির্বাচনে লীগ মোট ৪৯২টি মুসলমান ভোটের ৪২৫টি দখল করে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে। এর প্রভাব বাঙলায়ও পড়ে। বাঙলার বিধানসভার ১১৯টি মুসলমান আসনের ১১৩টিতে লীগ বিজয়ী হয় এবং বাঙলায় লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই সময় প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সমভাবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাও প্রসারলাভ করে।

অতঃপর বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে এক মন্ত্রিমিশন ভারতে আসে এবং বিভিন্ন দল তথা গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার ও গণপরিষদ গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে এই মিশন তার প্রস্তাব পেশ করে। কংগ্রেস গণপরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে লীগের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। পক্ষান্তরে, লীগও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অনেকের মতে, বহুকাল যাবৎ মুসলমান-মানসিকতাকে হিন্দুবিরোধী এবং বিচ্ছিন্নতাকামী করে গড়ে তোলা হয়েছিল, তাকে পুনরায় এক শাসনব্যবস্থা অভিমুখী করার ক্ষমতা স্বয়ং জেহাদের জনকদের পক্ষেও সম্ভবপর ছিল না। সীমিত কর্তৃত্ববিশিষ্ট এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকার শেষ চেষ্টাও এইভাবে ব্যর্থ হয়।

অতঃপর ভারত-বিভাজন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল এবং এর প্রত্যক্ষ প্ররোচনা এল মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' সিদ্ধান্তের মারফৎ। বাঙলা হল এর প্রয়োগক্ষেত্র। জিন্নার ভিন্নরূপ প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও বাঙলার লীগ ও সুরাবর্দী সরকার ১৬ই আগস্টকে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে হিন্দুদের ওপর নৃশংসতম অত্যাচারের দিনে পরিণত করলেন। কলকাতায় ১৫ই আগস্ট থেকে কয়েক দিন নরকের রাজত্ব চলল। আঘাতের প্রত্যাঘাত থাকে। তাই হিন্দুরা সক্রিয় হলে পর কলকাতায় দীর্ঘদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলল। দেখতে দেখতে পঞ্জাব দিল্লী সহ সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান শিখা প্রজ্জলিত হয়ে উঠল। কার্যত পাকিস্তান সৃষ্ট হবার পূর্বেই বেসরকারীভাবে অধিবাসী বিনিময় শুরু হয়ে গেল—বিশেষ করে উত্তর ভারত, পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে। ভারতবর্ষের এহেন বিভীষিকাময় পটভূমিতে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারত-বিভাগ পরিকল্পন

ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাব অনুসারে দেশে দুটি গণপরিষদ গঠিত হবে। পঞ্জাব ও বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান জেলার বিধানসভার প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হয়ে স্থির করবেন তাঁরা কোন্ গণ-পরিষদে অংশ গ্রহণ করবেন। অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেবেন সিন্ধুর প্রতিনিধিরা এককভাবে এবং সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্টে হবে গণ-ভোট। এই প্রস্তাব ঘোষিত হবার আগেই মাউন্টব্যাটেন লীগ এবং কংগ্রেস নেতাদের অগ্রিম সমর্থন আদায় করেন। গান্ধীজীর অজ্ঞাতে ও তাঁর ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা একরকম পরাজিতের মনোভাব নিয়ে ভারত-বিভাগ পরিকল্পনায় সায় দেন। ভারত তথা বাঙলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অধ্যায় সম্পূর্ণ হয় এবং ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের মধ্যভাগে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুই পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

॥ ৫ ॥

মুসলমানদের জন্য জাতীয় বাসভূমির দাবিতে এইভাবে পৃথক ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড স্ব-বিরোধও দেখা দিল। ভারতে তিনকোটির অধিক সংখ্যক মুসলমান রয়ে গেলেন, যাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরাও পড়েন। এঁদের নেতৃস্থানীয় অনেকে পাকিস্তানের সক্রিয় সমর্থক এবং তাঁদের প্রভাবে অধিকাংশ মুসলমান লীগপন্থীদের ভোট দেওয়া সত্ত্বেও পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের তাৎপর্য এঁরা বোঝেননি। প্রশ্ন দাঁড়াল—এঁদের দাবিতে পৃথক একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হবার পর ভারতে এঁদের স্থান কোথায়? এ প্রশ্ন আরো গুরুতর আকার ধারণ করল যখন এঁদের নেতৃস্থানীয়রা তড়িঘড়ি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে গেলেন। এতদিন যেসব নেতার কথা শুনে এঁরা চলতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের অনুপস্থিতিতে সাধারণ মুসলমান সমাজ দিশেহারা হয়ে পড়ল। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা কারণে বেশ কয়েকলক্ষ মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্বপাকিস্তানে চলে যায়, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা হিন্দু উদ্বাস্তুদের চেয়ে ভালো ছিল না। আর্থিক পুনর্বাসন না পেয়ে দেশত্যাগীরা পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন এমন ঘটনা বিরল নয়।

প্রশ্ন হতে পারে এদিকেও মুসলমানদের আর্থিক নিরাপত্তা আছে কি? ভারতের সরকারী নীতি ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ায় অন্যান্য কৃষক বা শ্রমিকদের যতটুকু আর্থিক নিরাপত্তা আছে, মুসলমানেরাও তার সমান অংশীদার, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। স্বাধীনতার পর সমগ্র ভারতের অর্থনীতির, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনমত বিকাশ হয়নি এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির বিকাশের হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ অনগ্রসরতার কারণ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা। এই শ্রেণীর কমই বিকাশ ঘটেছে। জনসংখ্যা ন্যায়-নীতির মানদণ্ডে চাকুরি-ব্যবসার ক্ষেত্রে যোগ্যমত সুযোগে এঁরা বঞ্চিত। পাকিস্তানের সৃষ্টি-লগ্নে মুসলমান সমাজের প্রতি একটা মানসিক অপ্রসন্নতা বৃহত্তর সমাজ ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের প্রশাসনযন্ত্র আরো পাঁচটি দেশের মতোই পক্ষপাত ও আত্মীয়পোষণ দোষে দুষ্ট বলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের দাবি বিশেষ মেটেনি।

এখনও আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাত এড়াতে পারিনি। সুতরাং বহু এলাকাতে মুসলমানদের ভয়ে ভয়ে বাস করতে হয়। একাধিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মস্থান এবং বাড়ি জমি পূর্বপাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল হিন্দুরা দখল করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে সাম্প্রদায়িকতার নামে কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা জবরদখল করেছে। এইসব ক্ষেত্রে আইনের শাসনও ব্যর্থতার শিকার হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও এরা অনগ্রসর। তবে সেটা বহুলাংশে তাদের মানসিক জাড্যের কারণে। সব মিলিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে স্বাধীনতার পর পশ্চিমবাঙলার মুসলমান-সমাজ এক কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করে, যা শুধু তাদের পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক। একই রাষ্ট্রের নাগরিকদের একাংশ যদি দুর্বল, অনগ্রসর এবং অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে সামগ্রিক বিচারে সেই রাষ্ট্রই দুর্বল হয়। রাজনৈতিক বিভ্রান্তির শিকার মুসলমান-সমাজ যে কূর্মবৃত্তি গ্রহণ করে তার ফলে তাঁরা সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ তথা সর্বজনীন সামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে দূরে ছিলেন। পরে এই সমাজের একটা বড় অংশ কংগ্রেসকে আশ্রয় করে। কিন্তু তাঁদের সমস্যাবলীর যত দ্রুত সমাধান হবে বলে তাঁরা কংগ্রেসের কাছে আশা করেছিলেন বাস্তব ক্ষেত্রে তা না হওয়ায় তাঁরা রাজনৈতিক দলবাজির শরিক হয়ে যান এবং 'প্রগ্রেসিভ মুসলিম লীগ'

সৃষ্টি করে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে নবকলেবর দিতে প্রয়াসী হন। একথা ঠিক যে মুসলমান সমাজ যদি সাম্প্রদায়িকতার ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত হন তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল করবেন। এতে ঘটবে শুধু ১৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম লীগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তবে আজ রাজনৈতিক মঞ্চসজ্জা ভিন্ন। তাই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মুসলমানেরা যদি স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তবে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা দ্বিগুণ বেশী প্রভাব বিস্তার করবে এবং মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। এদেশে রাজনৈতিক দলে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিশেষ অস্তিত্ব না থাকলেও ইদানীং নানাবিধ সাম্প্রদায়িক দলের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং কোন কোন রাজনৈতিক দলের আশ্রয়পুষ্ট হয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা সম্মানজনক হয়ে উঠছে। সুতরাং আপন-স্বার্থেই মুসলমানদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাজ্য এবং বিশেষভাবেই অবাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে, পাকিস্তানের বীজ যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থার মাধ্যমে বপন করা হয়েছিল, তার মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে যেন আমরা ভুলে না যাই। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার জন্য অমুসলমান প্রার্থীদের আর মুসলমান ভোটারদের কাছে যেতে হয়নি। এঁরা মুসলমান ভোটার এবং মুসলমান জনসাধারণ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েন। একই মনোভাব মুসলমান রাজনীতিকদের মধ্যেও দেখা যায় হিন্দু ভোটার এবং হিন্দু জনসাধারণ সম্বন্ধে। এই উদাসীনতা থেকে জন্ম নেয় অপছন্দ, এবং অপছন্দের মনোভাব ক্রমশ পরিণত হয় বিদ্বেষে।

অপর একটি বিষয়ও মুসলমানদের বিবেচনা করা উচিত। পৃথক পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন-ব্যবস্থা এবং আসন-সংরক্ষণ ইত্যাদির যুক্তি-সিদ্ধ পরিণাম যে-পাকিস্তান, সেখানকার অধিকাংশ মুসলমানদের সমস্যার সমাধানই কি ইসলামী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ফলে হয়েছে? স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টি হবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেখানকার অধিকাংশ মুসলমানদের মোহভঙ্গ হয় এবং তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, না তাঁদের ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান হয়েছে, না পেয়েছেন তাঁরা গণতন্ত্রসহ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। আমরা দেখেছি সেই ভাষা-আন্দোলন থেকে 'বাংলাদেশে'র জন্য মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্বপাকিস্তানের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা এবং আর্থিক সমতাকামী তরুণ মুসলিম-মানস 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে'। বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও সেই নিষ্ফল মাথা কোটার শেষ হয়নি; যেমন শেষ হয়নি পাকিস্তান নামক ঐস্লামিক রাষ্ট্রের

বাদবাকী অংশের সাধারণ মানুষের মুক্তির সাধনা। এক কথায়, রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য মুসলমান সমাজকে বিভেদপন্থা এবং ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদকে বর্জন করতে হবে। পশ্চিমবাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মূল সামাজিক ধারার সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ থাকার জন্য এদেশের মুসলমান সমাজকে যে পথে এগোতে হবে তাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। আপন অধিকার রক্ষার জন্য তাঁদের লড়তে হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক (ট্রেড-ইউনিয়ন) প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে। অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানই কৃষক ও শ্রমিক অথবা ছোটখাট ব্যবসাদার এবং তাই তাঁদের স্বার্থ আপামর বাঙালী কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে অভিন্ন। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাঙলার মুসলমান সমাজকে তাই সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করে এবং পৃথক থাকার মনোভাবকে বিসর্জন দিয়ে কোন না কোন ধরনের সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। বর্তমান লেখকের মতে দীনতম ব্যক্তিটির আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্ব পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবাদী কর্মসূচি হল সর্বোদয়। পশ্চিমবাঙলার মুসলমান-সমাজ আর সকলের সঙ্গে যত শীঘ্র এ সম্বন্ধে অবহিত হন, ততই বাঙালীর মঙ্গল।

একথা অনস্বীকার্য যে বিগত দুই শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমান সমাজের ইতিহাস মাত্রাতিরিক্ত ধর্মান্ধতায় পূর্ণ এবং এই ধর্মান্ধতা তাঁদের প্রগতির পথ রুদ্ধ করে যুগোপযোগী শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যানধারণা থেকে দূরে রেখেছে। অবশ্য দুর্বল হলেও আধুনিকতার একটা ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৩) এবং সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৯-১৯২৮) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেও তাঁদের বক্তব্যের বাহন হিসাবে বাঙলা ভাষার শরণ না নেওয়ায় ঐ দুই প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রভাব বাঙালী মুসলমান সমাজে ব্যাপক হতে পারেনি। এই দিক থেকে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১২) ভূমিকা অদ্বিতীয়। উদার সহনশীলতার প্রতীক মীর মশাররফ হোসেন মুসলমান সমাজের পক্ষে স্পর্শকাতর এক বিষয়—গোপালন ও গোজীবন সম্পর্কে পর্যন্ত লিখতে কুণ্ঠা বোধ করেননি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির খাতিরে। মুসলমানদের খাদ্যে গোমাংস বর্জন করার পরামর্শ দেন তিনি। মশাররফ হোসেন সাহেবের 'জমিদার দর্পণ' এবং 'গাজী মিয়ার বস্তানী' প্রমুখ গ্রন্থও যথার্থ আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ

মানসিকতার পরিচায়ক। আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন এইরকম আর একজন লেখিকা ছিলেন বেগম রোকেয়া হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মতিচুর'-এ (প্রথম খণ্ড ১৯০৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২১) তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে নানাভাবে সমালোচনা করার যে সৎসাহসের পরিচয় দেন তার তুলনা আজও মেলে না। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'শিখা' (১৯২০-৩২) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবদুল হোসেন, মোতাহার হোসেন ও আবুল ফজল প্রমুখ বুদ্ধিজীবী বাঙালী মুসলমান-সমাজের মধ্যে যে "বুদ্ধি মুক্তির" আন্দোলন চালান, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বঙ্গ-সংস্কৃতির ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আধুনিকতা ও যুক্তিবাদের অনুসারীদের ঐ ধারা একেবারে শুকিয়ে না গেলেও একথা দুঃখজনক এক সত্য যে এখনো বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান-সমাজের মানস, যুক্তিবাদীদের দ্বারা নয় বরং যেন ধর্মান্ধদের দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত।

বাঙালী মুসলমানদের চোখের সামনে একই সময়ে খলিফার দেশ তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ধর্মীয় গোঁড়ামি বিসর্জন দিয়ে কবেই আধুনিক মানসিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অহিতকর ধর্মান্ধতাকে বিসর্জন দিয়ে যুক্তিবাদসম্মত ধ্যানধারণার প্রবর্তন করে আধুনিক বিশ্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে। অথচ এদেশে আজো ঐস্লামিক ব্যক্তিগত আইনের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেবার প্রস্তাবকে 'তমুদ্দুন' আর 'তহজীবের' দোহাই দিয়ে নস্যাৎ করার জন্য সর্বরকমে চেষ্টা করা হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামির পাঁকে বদ্ধ পাকিস্তানে পর্যন্ত মুসলমানেরা আত্মস্থ হয়ে উঠছেন ধীরে ধীরে এবং আধুনিক বিশ্বে নিজেদের স্থান করে নেবার জন্য তাঁরা প্রবল বেগে অগ্রসর হচ্ছেন। নিঃসন্দেহে 'বাংলাদেশ' সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু পশ্চিমবাঙলার মুসলমানদের বড় একটা অংশ যেন এখনও সেই অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার মানসিকতায় আচ্ছন্ন। এর একটা বড় প্রমাণ বাঙালী হিসেবে পরিচয় দেবার বদলে এখনও অনেক মুসলমানই নিজেদের পশ্চিমা বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন। এদিক থেকে নজরুলের সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলীদের প্রভাব পশ্চিমবাঙলায় বেশ ক্ষীণ। ডঃ শহীদুল্লাহর মতো কয়জন মুসলমান বুদ্ধিজীবী সগর্বে বলতে পারেন : 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান একথা যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা

নয়; এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।' উল্লেখ করা যেতে পারে বহু তিক্ততা ও রক্তপাতের পর পাকিস্তানের জন্ম হবার পর মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে ডঃ শহীদুল্লাহ ঐ স্পষ্টোক্তি করেন। যে মিথ্যা আভিজাত্যের মোহে পশ্চিমবঙ্গে এক শ্রেণীর মুসলমানেরা ছেলেমেয়েদের বাঙলা পড়ান না বা আধুনিক শিক্ষালাভের জন্য স্কুলে পাঠান না, বদলে মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষা-প্রণালীকে আঁকড়ে ধরতে চান, তা আর যাই হোক, তাদের উন্নতির সহায়ক নয়। এতে তাদের 'নিজ ভূমে পরবাসী' করার পথ প্রশস্ত করা হয় মাত্র। বলাবাহুল্য, মাতৃভাষা ও প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ না করে কেবল মাত্র উর্দু বা আরবী-ফারসী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের প্রয়াসের ফলে ঐসব মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর বৌদ্ধিক বিকাশ কুণ্ঠিত হয়। এদেশে একজন মুসলমান ছাত্র বা ছাত্রী উর্দু, আরবী অথবা ফারসী ততটুকুই শিখুক একজন হিন্দু ছাত্র বা ছাত্রী সংস্কৃত যতটুকু শেখে। ধর্মনির্বিশেষে বাঙলা বাঙালীর মাতৃভাষা। তাই পশ্চিমবাঙলার মুসলমানদেরও বাঙলা ভাষা শিখতে হবে, চর্চা করতে হবে সগৌরবে। বাঙলা-ভাষা ও সাহিত্যে ঐস্লামিক উপাদান বিরল নয়—বরং চেষ্টা করলে আরও বাড়তে পারে।

॥ ৬ ॥

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

কবিগুরুর এই আর্ষ দৃষ্টিলব্ধ সত্য সনাতন ও শাশ্বত। সুতরাং আর কোন কারণে যদি না-ই-হয়, নিছক আপন আপন মঙ্গলের জন্যই পশ্চিমবাঙলার হিন্দুদের এ প্রদেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের শুভাশুভ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। হিন্দুদের যে মানসিকতা পশ্চিমবাঙলার মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী পঙ্গু করে রেখেছে তা হল তাঁদের আনুগত্য সম্বন্ধেই সংশয়। একথা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, পশ্চিমবাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ কিছুটা সহৃদয়তা এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় দিলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে

মুসলমানেরা কূর্মবৃত্তি পরিহার করে জাতীয় জীবনের মূল ধারার সামিল হতে পারতেন। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়কে বারবার আত্মঘাতী ক্রিয়াকলাপে উদ্বুদ্ধ করেছে। বহু মুসলমান এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দ লীগের সমর্থক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে অমুসলমানপ্রধান রাষ্ট্র ভারতে থাকতে বাধ্য হওয়াকে ভালো মনে নিতে পারেননি। যেমন পারেননি পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুরা। এমনকি 'বাংলাদেশে'র অভ্যুদয়ের পরও সেখানকার হিন্দুরা মানসিক অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাননি। আসলে এটা অস্বাভাবিক দেশ-বিভাজনের যুক্তিসঙ্গত পরিণতি মাত্র। পাকিস্তান, 'বাংলাদেশ' সহ ভারতেও এর প্রভাব কাটতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে স্বাধীনতার সর্ববিধ আন্দোলনে শত শত মুসলমান অংশগ্রহণ করেছেন এবং এঁরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো কেবল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদেব মারই খাননি, স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল-দের প্ররোচনায় স্বধর্মীদের হাতেও মারাত্মকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এই যে দু-তরফা লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন তার গভীরতা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুভবও করতে পারেন না। অথচ দুঃখের কথা স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে এইসব জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কথা বিশেষ স্মরণ করা হয় না। পক্ষান্তরে সব মুসলমানই লীগের সমর্থক ছিলেন মনে করে তাঁদের বংশধরদের এখনো ভারতে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করা হয়।

পাকিস্তানের সঙ্গে বিগত যুদ্ধগুলির সময় ভারতের মুসলমানেরা বুকের রক্ত দিয়ে এদেশের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বহু মুসলমান সৈনিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী মুসলিম রাষ্ট্র বলে আত্মপরিচয়দানকারী পাকিস্তানের মুসলমান সৈনিকদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে লড়াই করেছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণও দিয়েছেন। এই-ভাবে এযুগের ভারতীয় মুসলমান যুবকেরা শুধু লাজপত রায় ও তাঁর মতো আরো অনেকের সংশয়েরই জবাব দেননি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো উদার মানবিকতাবাদীর মনেও যে সন্দেহ ছিল—ভারতীয় মুসলমানরা মুসলিম রাষ্ট্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বেন কিনা—সে সন্দেহেরও নিরসন করেছেন। এর পরও পাইকারী হারে ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, আত্মঘাতী নীতিও বটে।

ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতিভূরূপে

ভাবার প্রবণতাটি ভারতীয় অমুসলমানদের মনে ক্রিয়া করে এবং ঐসব দেশে হিন্দুরা নিগৃহীত হলেই এদেশের মুসলমানদের টুঁটি লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে; পাকিস্তান বা 'বাংলাদেশে'র রহিমের দোষে ভারতের রহমানের গলা কাটা বা ঘর-বাড়ি জ্বালানোর মতো নিষ্ঠুর বর্বরতা সহজেই ঘটে যায়। অথচ ঐসব দেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কুকীর্তির অনুকরণ করলে বাঙালী বা ভারতীয় হিন্দুসমাজের শক্তি বা গৌরব বৃদ্ধি তো হয়ই না, উপরন্তু এদেশে নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার হলে তা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতকেই দুর্বল ও বিশ্বসভায় ধিক্কৃত করে।

প্রতিভূ মনে করার মধ্যযুগীয় বর্বর মনোবৃত্তির আরও একটি রূপ আছে। দেশের যে-কোন জায়গায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী দুই দশ জন দুর্বৃত্তের অপরাধে সমগ্র মুসলমান-সমাজকেই নিগৃহীত করার মনোবৃত্তি। বিশেষ করে নারী-নির্যাতনের ঘটনাকে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল আবেগ সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়। নারী-নিগ্রহ অবশ্যই নিন্দনীয় এবং এই ধরনের দুষ্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দেশের আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ সাজা পাওয়া উচিত। কিন্তু খবরের কাগজ এবং অতীত ইতিহাস, দুই-ই এ কথার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দেবে যে, সকল সম্প্রদায়ের নরপশুদের মধ্যেই এই পাশব বৃত্তি বর্তমান। আর ঘটনাচক্রে এক বা একাধিক নরপশু বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বী হলে, সেই ধর্মাবলম্বী সকলকেই শাস্তি দিতে হবে কোন্ যুক্তিতে? এই জাতীয় হিন্দু দুষ্কৃতকারীদের অপরাধে সমগ্র হিন্দুসমাজকে পীড়ন করার কথা আমরা ভাবতে পারি কি? তাই মুসলমানদের বিচারের ক্ষেত্রেও অন্য মানদণ্ড রাখা উচিত নয়।

হিন্দুদের আর একটি কুসংস্কার হল, মুসলমানরা নিষ্ঠুর এবং ক্ষমতার লোভে ভ্রাতৃহত্যা অথবা পিতৃহত্যা করতেও তাঁদের বাধে না। এই সঙ্গে অকথিত যে বক্তব্যটি রাখা হয় তা হল মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরা অনেক বেশী মানবীয় গুণের অধিকারী। কিন্তু এইসব ইতিহাসনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডাশোক, অজাতশত্রু অথবা ঐরকম আরও অনেক ঐতিহাসিক চরিত্রের কথা মনে পড়ে না। অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে কিছু কিছু মানুষ পশু হয়ে যাচ্ছে, সব ধর্মেই এমন কিছু কিছু লোকের সাক্ষাৎ আমরা দৈনন্দিন জীবনে পাই। বস্তুত সমস্যাটি ধর্মভিত্তিক নয়, মনুষ্য-প্রবৃত্তিগত। পাকিস্তানেই, প্রথমত হিন্দু-নিগ্রহের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়, পরে ভারতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে—এ-ও এক অনৈতিহাসিক উক্তি। ষাটের

দশকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কয়েক বছর পাকিস্তানে কোন বড় রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, অথচ ঐ সময় ভারতে আহমেদাবাদ, ভিয়াণ্ডি, চাইবাসা থেকে শুরু করে আমাদের ঘরের কাছে চন্দননগরের আশেপাশে ও কাঁচড়াপাড়া, ভাটপাড়া প্রভৃতি ২৪-পরগণার শ্রমিক এলাকায় যেসব দাঙ্গা হয়, তা যেন আমাদের বাস্তব সত্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ঐসব জায়গার দাঙ্গা ছাড়াও ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে রাউরকেলা, জামসেদপুর, রাঁচি ইত্যাদি জায়গার দাঙ্গায় হিন্দুরা যে নারকীয় অত্যাচারের নজির রেখেছেন, তাতে তাঁদের মহত্ত্বের অহমিকা কোন মতেই পোষণ করা চলে না। মানবিকতার মানদণ্ডে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান মোটামুটি সমভাবে উত্তীর্ণ বা ব্যর্থ। ১৯৬৪ সনের দাঙ্গার মেঘের ঘনঘটার মধ্যে একমাত্র আলোকরেখা ছিল জয়প্রকাশ নারায়ণ, অন্নদাশংকর রায়, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, মনোমোহন চৌধুরী ও চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রমুখ কয়েকজন অসাম্প্রদায়িক জননেতা ও বুদ্ধিজীবীর ঐতিহাসিক বিবৃতি, যার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিবেক মুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের সেই সত্য ভাষণকে স্বীকার করে নেবার সৎসাহস সাধারণভাবে হিন্দুসমাজ দেখাতে পারেনি।

দাঙ্গা প্রসঙ্গে আর একটি কথা। কয়েক বছর আগে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্বন্ধে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছিল; তার রায় ছিল, এইসব দাঙ্গার প্রথম প্ররোচনা এসেছিল মুসলমানদের কাছ থেকে। এর সূত্র ধরে অনেকে মুসলমানদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান। এ ব্যাপারে জয়প্রকাশের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর প্রশ্ন—সংখ্যালঘু মুসলমানরা যখন ভালোভাবেই জানেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শেষ পরিণতি তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য এবং শেষ অবধি তাঁদেরই বেশী মার খেতে হবে, তাহলে তাঁরা দাঙ্গার প্ররোচনা দেবেন কেন? তাই জয়প্রকাশজীর ধারণা, সাধারণ ভারতীয় মুসলমান দাঙ্গার প্ররোচনা দেন না। এ কাজ করেন পাকিস্তানী এজেন্ট ও এদেশের পাকিস্তান-প্রেমী লোকেরা, যাঁদের মধ্যে হিন্দুরাও থাকতে পারেন। পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী (সাধারণ মানুষ নয়) ভারত এবং বিশেষ করে তার ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে দৃঢ়মূল হলে পাকিস্তানেও তার প্রভাব পড়বে (মুজিব প্রভাবিত 'বাংলাদেশে' যেমন পড়েছিল) এবং তার ফলে ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভিত্তি শিথিল হবার আশঙ্কা।

ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি পাক শাসকদের দরদ যে কত অগভীর তার

প্রমাণ 'বাংলাদেশে'র 'বিহারী'-সহ পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান উদ্বাস্তুর শোচনীয় দশা এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা আবার ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের সাক্ষ্য। সরকারের কর্তব্য পাকিস্তানের চর ও অনুগামীদের ষড়যন্ত্র আগাম ব্যর্থ করা ও শাস্তি দেওয়া। কিন্তু প্রশাসন-যন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য ভারতের সাধারণ মুসলমানকে শাস্তি পেতে হবে কেন? আর একটি কথা। ভারতের হিন্দুরা কি ভেবে দেখেছেন যে এইভাবে সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে তাঁরা পাকিস্তানের শাসক-সম্প্রদায়ের গ্র্যাণ্ড ডিজাইন বা সুচতুর অভিসন্ধির অঙ্গ হয়ে পড়েছেন?

কিছুদিন ধরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মুসলমানদের 'ভারতীয়-করণ'-এর কথাও বলছেন। কথাটি বলতে তাঁরা ঠিক কী বোঝেন তা এখনও খুলে না বললেও, আভাষে-ইঙ্গিতে যা বলেন তাতে মনে হয় যে, সবাইকে হিন্দু-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করতে চান তাঁরা। কারণ, তাঁদের কাছে ভারত ও হিন্দু প্রায় সমার্থব্যঞ্জক। জাতীয়করণের এই দাবি মেনে নিলে শুধু মুসলমান নয়, শিখ পার্শী খ্রীষ্টান বৌদ্ধ ইহুদী, তাবৎ সংখ্যালঘুদেরই এইভাবে 'হিন্দু' করতে হয়। কিন্তু কোন্ হিন্দু? বৈষ্ণব হলে শৈব শাক্ত জৈন প্রভৃতি হিন্দু-সমাজের অন্যান্য শাখাকেও এই একই মতবাদের স্টিম রোলারের নীচে পিষে সমান করতে হয়। আবার বৈষ্ণবরাও এক মত ও পথের অনুগামী নন। তাহলে শেষ পর্যন্ত কি থাকবে? 'ভারতীয়করণে'র কথা যাঁরা বলেছেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ মতবাদটির সঙ্গে হিটলার বা স্ট্যালিনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায়? এই লৌহ-কঠিন ঐক্যের পরিণামে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারাটিই—যার মূল কথা হল যত মত তত পথ বা সমন্বয়—হারিয়ে যাবে।

বিজ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের ফলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে, এমনকি অন্য গ্রহ উপগ্রহও আর রূপকথার দেশ নয়। মানুষকে তাই তার সঙ্কীর্ণ ভাষা ধর্ম সংস্কৃতির রাজনীতি ও ভৌগোলিক সীমার গণ্ডি কেটে বিশ্ব-মানব হতে হবে। সমন্বয় ছাড়া আর যে বিকল্প মানুষের সামনে রয়েছে, তা হল সংঘর্ষ ও সর্বনাশ। এ সত্য বিশ্বের আর সব দেশের মানুষের মতো ভারত ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যত শীঘ্র এ সত্য উপলব্ধি করে তদনুযায়ী মানসিকতা ও জীবনযাত্রা গড়ে তোলেন, ততই শুধু তাঁদেরই মঙ্গল নয়, বিশ্ববিধানও ত্বরান্বিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী-সমাজ

যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি থেকেও বাঙালী সমাজের যে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ খবর রাখি না তা হল আমাদের উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়। হাটে, মাঠে অথবা মেলায় কর্মরত অথবা উৎসবের আনন্দে মত্ত আদিবাসী নর-নারীর দল আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সাধারণভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা অথবা সমস্যা সম্বন্ধে খুব একটা চেতনা নেই। সুতরাং এই সর্বপ্রাচীন বাঙালী, পশ্চিমবঙ্গের জীবনকে রূপ রস ও বর্ণাঢ্য বৈভবে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে যাঁদের ভূমিকা অদ্বিতীয়, তাঁদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশদ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

১৯৬১ সনের জনগণনার বিবরণ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীর সংখ্যা হল ২০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮১ জন। আদিবাসী জনসংখ্যার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.৮৮ ভাগ আদিবাসী এবং সমগ্র ভারতের আদিবাসীদের শতকরা ৬.৮২ ভাগ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আদিবাসীদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলি জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া, মালদা, মেদিনীপুর ও বীরভূম। জেলার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসীদের শতকরা হার ঐসব জেলায় যথাক্রমে ২৬.১০, ১৯.৫৩, ১৫.৪৪, ১২.৮৫, ১৪.৪২, ৮.১৪, ৭.৫৯ ও ৭.৩৯। আদিবাসীদের অল্প সংখ্যক অর্থাৎ মাত্র ৪৮ হাজার ১১৬ জন থাকেন শহরে এবং বাদবাকী সবার নিবাস গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীরা মূলত গ্রামীণ সম্প্রদায়।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় হলেন সাঁওতালেরা। মোট আদিবাসীদের শতকরা ৫৮.৪২ ভাগই এঁরা। এর পর যথাক্রমে ওরাওঁ (১৪.৪৮%), মুণ্ডা (৭.৮০%), ভূমিজ (৪.৪৪%), কোরা (৩.০২%), ও লোধা বা খাড়িয়া (১.৯৯%), মাহালি (১.৩৭%) ও ভুটিয়া (১.১৫%) ইত্যাদির স্থান। পশ্চিমবঙ্গের একচল্লিশটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের ভিতর গুরুত্বপূর্ণ বাকীগুলির নাম হল বাইগা, বেদিয়া, বীরহোড়, চাকমা, ছেরো, গারো, গোণ্ড, গোরাইত, হো, হাজং, কর্মালী, খারওয়ার, খোন্দ, বিষাণ, কোরওয়া,

লেপচা, লোহরা, মালপাহাড়িয়া, মাঘ, মেচ, মরু, মাহলি, নাগেসিয়া, পাহাড়িয়া, রাভা, সাউরিয়া পাহাড়িয়া, শবর ও টোটো।

সাঁওতালেরা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে আছেন। তবে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মালদা, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতেই এঁদের সংখ্যাধিক্য। ওরাওঁরা প্রবল জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, চব্বিশ পরগণা ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলায়। জলপাইগুড়ি, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও পশ্চিম দিনাজপুরে মুণ্ডাদের ঘনবসতি। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও হুগলী—প্রধানত এই চারটি জেলায় ভূমিজদের বাস। কোরাদের বাস বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকায়। লোধারা থাকেন জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুর জেলায়। মাহালিদের নিবাস বর্ধমান ও জলপাইগুড়ি জেলায়। ভুটিয়ারা দার্জিলিং জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অন্যান্য আদিবাসীদের নিবাস সাধারণত একটি বা দুটি জেলার মধ্যেই আবদ্ধ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় যেসব আদিবাসীদের (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) মূল নিবাস তাঁদের জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর অথবা দার্জিলিং-এর মত জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ চা বাগান ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক হিসাবে ঐসব জেলায় গিয়ে সেখানে পরে স্থায়ীভাবে বসবাস করা। অনুরূপ কারণে চব্বিশ পরগণা এবং এমনকি সুন্দরবন অঞ্চলেও জমি হাসিল ও আবাদ করার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীরা এসে স্থায়ী বসতি গড়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে মোট ৫ লক্ষ ২ হাজার ৭০ জন কৃষক যাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও উপর অর্থাৎ ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৪২১ জন হলেন কৃষি-শ্রমিক এবং এঁদের অধিকাংশেরই আবার জমিজমা নেই বললেই চলে। খনিতে কাজ করেন ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৪৮ জন। উৎপাদক গৃহশিল্পতে নিযুক্ত আছেন ৩২ হাজারেরও কিছু বেশী সংখ্যক নর-নারী। নির্মাণকার্য ও পরিবহনে যথাক্রমে ৩,৩৮৯ ও ৩,৫৫১ জন, ব্যবসা-বাণিজ্যে মাত্র ৩,৭৯৬ জন ও অন্যান্য পেশায় রত ৫২,৭৫২ জন নর-নারী।

পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী পুরুষদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ও নারীদের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১১·২ জন ও ১·৮ জন। পুরুষ ও নারী মিলিয়ে শতকরা মাত্র ৬·৫ জন আদিবাসী অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষের আদিবাসী-সমাজের ভিতর অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের হার কিন্তু শতকরা ৮·৫ ভাগ।

অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সম্প্রদায় এবিষয়ে অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে আছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায়ে বিদ্যালয়ে যাবার উপযুক্ত আদিবাসী ছাত্রদের মধ্যে মাত্র ৮'৫৮% বিদ্যালয়ে যান। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা কিন্তু ৪০'৯৪% এবং এমনকি তপশিলীভুক্ত জাতিদের ক্ষেত্রেও এই সংখ্যা ১৪'০১%। সুতরাং আদিবাসী-সমাজের মধ্যে শিক্ষার মান যে শোচনীয় রকমের নিম্ন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এই রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উপজাতীয়দের integration বা সংহতিপর্ব অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। দুই-চারটি আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া আর সবাই একই গ্রামের বাসিন্দা, যদিও ভিন্ন পাড়া বা টোলায় হতে পারে। সুতরাং দেখাশুনা ও পারস্পরিক আদান-প্রদানের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এর কারণ বিশেষ করে ইদানিং আদিবাসী-সমাজের ভিতর আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আধুনিক ধ্যান-ধারণা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রার অন্যান্য পদ্ধতিও প্রসারলাভ করেছে। আদিবাসী-সমাজ আধুনিক ধর্মের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। বহু বৎসর পাশাপাশি থাকার কারণ বেদিয়া, অভিজাত ভূমিজ, গোন্দ, বীরহোড় (অংশত), খারওয়ার, লোধা, মাহালি, ওরাওঁ, রাভা, শবর প্রমুখ উপজাতীয়েরা হিন্দুধর্ম দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে বা অংশতঃ হিন্দু ধর্ম, পূজা-পদ্ধতি, দেব-দেবী ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করেছেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের ভিতর উপজাতীয় ধর্ম এবং হিন্দুধর্ম—উভয়েরই প্রভাব বিদ্যমান। অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের প্রভাবে সাঁওতাল ও গারো প্রমুখ আদিবাসী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। উত্তরবঙ্গের ভূটিয়া, চাকমা ও লেপচা (অংশতঃ) প্রমুখ মঙ্গোলয়েড উপজাতীয়দের ভিতর বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য—যদিও তাঁদের ভিতরও কিছু কিছু খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে পশ্চিমবাঙলার আদিবাসীদের একটা বিপুল অংশই এখনও পর্যন্ত animist বা তাঁদের সনাতন আদিবাসী-ধর্মের অনুগামী। অনেকে তাঁদের পূর্বপুরুষের পূজা করেন। অনেকের উপাস্য বোঙ্গা (সূর্য বা পৃথিবী), ধরম ও ঠাকুর ইত্যাদি।

প্রতিটি উপজাতীয়েরই এক সময় নিজস্ব ভাষা ছিল এবং একমাত্র সেই ভাষাতেই তাঁরা কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে" নীতি অনুসারে চলতে চলতে পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ আদিবাসী-সমাজই আজ দ্বিভাষী এবং এই দ্বিতীয় ভাষা বাঙলা। তবে এই বাঙলা আমাদের মত শহুরে

বাঙালীদের বাঙলা নয়। প্রতিটি উপজাতীয় তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণ-ভঙ্গী এবং শব্দসম্ভার ইত্যাদি এর সঙ্গে যোগ করেছেন। কোন কোন আদিবাসীরা পূর্ণ মাত্রায় বাঙলাভাষী হলেও অধিকাংশই কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় নিজেদের বিশিষ্ট উপজাতীয় ভাষার শরণ নেন। ভিন্ন উপজাতীয় ও অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যম হল বাঙলা ভাষা। বিহার থেকে আগত পুরুলিয়ার অংশবিশেষের আদিবাসীদের একাংশ ও উত্তরবঙ্গের ভুটিয়া, লেপচা ইত্যাদি কয়েকটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লেখাপড়ার ভাষা হিন্দি। বাদ বাকী অধিকাংশ আদিবাসীর লেখাপড়ার ভাষা হল বাঙলা।

॥ ২ ॥

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও প্রগতির দিক থেকে স্তরভেদ বিদ্যমান। এঁদের একদিকে রয়েছেন বীরহোড়, শবর, লোধা অথবা টোটোদের মত আদিবাসী সম্প্রদায়, এখনও যাঁদের ভিতর আধুনিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি বা ধ্যান-ধারণার বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এঁদের বড় একটা অংশই যাযাবর, অরণ্যচারী এবং অরণ্যসম্পদ সংগ্রহ, শিকার অথবা বড় বেশী হলে জুম (নিত্য নূতন অরণ্যাঞ্চলে) চাষ করে এঁরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। শিল্প বলতে এঁদের ভিতর বনজ লতাপাতা দিয়ে দড়ি অথবা ঝুড়ি চুবড়ি তৈরী করা এবং ঐজাতীয় আরও দুই একটি আদিম শিল্প ছাড়া অপর কোন কারিগরী বিদ্যার প্রসার ঘটেনি। এঁদের মধ্যে আবার লোধা ও অপর দুই একটি সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে অপরাধপ্রবণ (criminal tribes) বলে নিন্দিত, যদিও স্বাধীনতার পর আইন ও প্রথা-বলে তাঁদের সেই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা চলছে। তবুও সংস্কার এবং বিশেষ করে কুসংস্কার সহজে যায় না। তাই এমনকি বছর কয়েক পূর্বেও গিধনী-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের এই লোধাদের মধ্যে কয়েকজনের অপরাধে সমগ্র সম্প্রদায়ের উপরই এক বীভৎস অত্যাচারের বন্যা নেমে এসেছিল তাঁরা অপরাধপ্রবণ উপজাতীয় বলে। আর এই অত্যাচার চালান অপর একটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নর-নারী। সংবাদটি অবশ্য আমাদের মত শহুরে বাঙালীদের কাছে খুব একটা পৌঁছায়নি এবং

ভিয়েৎনাম-কঙ্গো নিয়ে মাতামাতি করা আমাদের রাজনৈতিক কর্মী ও সংবাদপত্রের কাছে আদৌ সংবাদ বলে বিবেচিত হয়নি।

যাই হোক, মেরুর অপর প্রান্তে রয়েছেন সাঁওতাল ও ওরাওঁদের মত আদিবাসী, শহর বা গ্রামাঞ্চলে যাঁদের জীবনযাত্রা, পেশা ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ অথবা তপশীলী জাতিভুক্ত অন্যান্য বাঙালীদের খুব একটা পার্থক্য নেই। অর্থাৎ এঁদের ভিতর আধুনিকতার প্রবল প্রভাব পড়েছে। এঁদের মেয়েমহলে ইদানিং এবং বিশেষ করে স্বাধীনতার পর শাড়ি, ব্লাউজ, অন্তর্বাস ও অন্যবিধ প্রসাধনদ্রব্যের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে, পুরুষেরা আধুনিক বাঙালীর মতই শার্ট প্যান্ট ও ছুঁচলো জুতো পরেন। অর্থসঙ্গতি থাকলে ট্রানজিসটার রেডিও হাতে বা কাঁধে ঝোলে। এঁদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বাঙালীদের মতই স্কুল-কলেজে পড়েন এবং বড়রা হয় চাষ করেন, নচেৎ কলকারখানায় কাজ করেন এবং কেউ কেউ ডাক্তার নার্স ও উকিল মোক্তারও হন। বহু আদিবাসী সম্প্রদায় আবার এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন।

পশ্চিমবাঙলার আদিবাসী সমাজের বিবর্তনের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি যদি লক্ষ্য করা যায় তবে বোঝা যাবে যে অন্যান্য বাঙালীদের মত এঁদের ভিতরও আধুনিকতার প্রসার ঘটেছে এবং ঘটবে। পুরাতন আরণ্য জীবন, সভ্যতা ও অর্থব্যবস্থা যত সরল শান্তিময় ও সংঘাতরহিত হোক না কেন এবং সভ্যতা-পীড়িত কারও কারও কাছে যতই তা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হোক, আদিবাসীসমাজকে আর তাঁদের পুরাতন অবস্থায় রাখা যাবে না এবং তাঁদের এইভাবে "জাদুঘরের নমুনা" করে রাখা তাঁদের ও দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে আদৌ কাম্য নয়। কুড়ি লক্ষের উপর বাঙালীকে অর্থনীতি ও মানসিকতার দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে রাখার চেষ্টা করলে তার পরিণাম "তুমি যারে নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের সামনে মাত্র একটিই পথ আছে এবং তা হল আধুনিক জীবনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা। শুধু দেখতে হবে যে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এই উত্তরণ যেন যথাসম্ভব বেদনারহিত হয়।

ব্যথা-বেদনারহিতভাবে আধুনিক যুগে উত্তরণের উপর একটু বিশেষ জোর দেবার প্রয়োজন আছে। কারণ সমাজ-বিজ্ঞান বলে এজাতীয় পরিবর্তন এবং বিশেষ করে অতি দ্রুত, অল্প সময়ের মধ্যে যেখানে দুই-একটি শতাব্দীর অভিজ্ঞতাকে এক লাফে অতিক্রম করতে হয়, সেখানে ব্যথা-বেদনা এক রকম

অপরিহার্য। তবে একে এড়ানোর উপায় যে নেই তা নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে মানুষ পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকে নূতন পথ করে নিতে পারে সচেতন প্রয়াসের দ্বারা। এক্ষেত্রেও সেই উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারলে আধুনিক যুগে উত্তরণের ব্যথা ও বেদনাকে একেবারে এড়াতে না পারলেও হয়ত অনেকটা লাঘব করা সম্ভবপর হতে পারে।

সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রয়াস না করে অপেক্ষাকৃত স্থির ও অচঞ্চল কোন সমাজকে হঠাৎ আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ঘূর্ণিপাকে এনে ফেললে তাঁদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এই পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের মধ্যেই তার কিছুটা সমীক্ষা হয়ে গেছে। প্রধানত তারই ভিত্তিতে (Impact of Industrialisation on the Life of the Tribals of West Bengal : অমলকুমার দাস ও স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতীয় উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত) আমাদের পরবর্তী বক্তব্য উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এই সমীক্ষা চালান হয় বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস, হিন্দুস্থান কেবল ফ্যাক্টরী, ঝিমেরী কোলিয়ারী এলাকায়, চব্বিশ পরগণার কাঁচরাপাড়া লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ এবং নদীয়ার হরিণঘাটা মিল্ক ফ্যাক্টরী সংলগ্ন এলাকায়।

আধুনিক জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ এইসব বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে ও দামোদর উপত্যকার বাঁধ তৈরী করতে বিপুল সংখ্যক আদিবাসীকে তাঁদের জীবিকার সাধন জমি ও বসতবাটি থেকে উৎখাত করতে হয়েছে। একমাত্র হিন্দুস্থান কেবলস্-এর এলাকাতেই কারখানা স্থাপনের কারণে পরিবার পিছু জমির পরিমাণ ১৩.৪৫ একরের বদলে মাত্র ৫.১২ একরে দাঁড়ায়। স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও যে মানসিক ও সামাজিক ক্ষতি হয় তা অপূরণীয়। অথচ কারখানার যন্ত্রপাতির সঙ্গে অপরিচিত হবার ফলে জমি থেকে বঞ্চিত এইসব আদিবাসী নর-নারী সর্বনিম্ন বেতনের অদক্ষ শ্রমিকের কাজ ছাড়া অপর কোন কাজ পাননি এবং তাও সবাই নয়। কিন্তু এই অদক্ষ শ্রমিকের আয়ও কৃষকের তুলনায় লোভনীয়—বিশেষ করে তার নিশ্চয়তা আছে বলে এবং নগদ টাকার একটা দুর্বার আর্কষণ বিদ্যমান। সুতরাং এসব এলাকায় যাঁদের বাধ্য হয়ে কৃষি কার্যে থাকতে হচ্ছে তাঁদের মধ্যে এবং বিশেষ করে আদিবাসী যুবকদের মধ্যে তাঁদের বর্তমান অবস্থার প্রতি তীব্র অসন্তোষ বিদ্যমান। আবার কারখানায় যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরও শান্তি নেই। কারখানার বাজারে অগণিত

ভোগ্যপণ্য তাদের নয়নলোভা আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে। হাতে নিয়মিত-ভাবে নগদ টাকা পাওয়া গেলেও তাঁদের সঙ্গতি অসীম নয়। ফলে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় হওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের অনেককে ঋণগ্রস্ত হতে হচ্ছে।

সমাজ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হল পরিবার। অপরিকল্পিত আধুনিকীকরণের ফলে ঐসব এলাকার আদিবাসীদের পরিবার প্রথাতেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে। কেবল যে যৌথ পরিবারই ভেঙে পড়েছে তা নয়, বহু ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের ছোট (nuclear) পরিবারও আঘাত পাচ্ছে। এর কারণ হল নগদ মজুরী প্রাপ্তি ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত স্ব-স্ব-প্রধানতার মানসিকতা, কারখানা থেকে বাড়ির দূরত্ব, কারখানা শহরের নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। ফলে আদিবাসী-সমাজের ভিতর যে চিরাচরিত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়মূলক সম্পর্ক ছিল এবং যা ছিল প্রত্যুত তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান সাধন, দ্রুত তার অবক্ষয় ঘটছে। এর স্থান নিচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মকেন্দ্রিকতা এবং এর ফলে এইসব এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায় আধুনিক ভারতের সামাজিক নিরাপত্তার অপ্রতুল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে জীবনে নিদারুণ নিরাপত্তার অভাবের সম্মুখীন হচ্ছেন। একটিমাত্র দিকে এই নিরাপত্তার অভাব যে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে, তার প্রতি নজর দিলেই নূতন পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যাবে। নগদ মজুরীর আকর্ষণে আদিবাসী যুবতীরা বিহারের মুসলমান অথবা শিখ ঠিকাদার দোকানদারদের কাছে কাজ করতে আসেন এবং এইসব আধুনিক মানুষের তুলনায় তাঁরা অনেক সরল বলে তাঁদের মধ্যে অনেকে এদের প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে এঁদের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে পড়েন। কিন্তু বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা এঁরা কদাচিৎ পান। ফলে এইসব বহিরাগত ঠিকাদার বা দোকানদারেরা চলে গেলে অথবা তাঁদের আকর্ষণ ফুরিয়ে গেলে অবাঞ্ছিত সন্তানসহ এইসব আদিবাসী যুবতীদের নারকীয় জীবনযাপন করতে হয়। কারণ তাঁদের পূর্বতন সমাজ তাঁদের আর গ্রহণ করে না। নাগরিক জীবনগ্রহণকারী এইসব আদিবাসী পুরুষ ও রমণীদের মধ্যে গ্রামীণ আদিবাসীদের তুলনায় সব রকম নেশার পরিমাণই বেশী। স্বভাবতই নেশার আনুষঙ্গিক ব্যাপারও এঁদের মধ্যে অধিকমাত্রায় প্রকট হয়েছে।

এইসব এলাকার শ্রমিক সঙ্ঘগুলি যদি আদিবাসীদের সঙ্গে অপরাপর সম্প্রদায়ের সংহতির কাজ করতেন তাহলেও এইসব ক্ষতির কিছুটা পুষিয়ে

যেত। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে শতকরা ছয় ভাগের বেশী শ্রমিক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত নন। কারণ অন্য সম্প্রদায় ও ভিন্ন প্রদেশাগত শ্রমিকদের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে প্রথমত তাঁরা শ্রমিক সঙ্ঘের মধ্যে মানসিক সাযুজ্য বোধ করেন না। দ্বিতীয়ত এইসব শ্রমিক সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দও তাঁদের আপন করার চেষ্টা করেন না। শুধু তাই নয়। শ্রমিক সঙ্ঘ যেখানে প্রবল, নূতন শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁরা স্থানীয় আদিবাসীদের পরিবর্তে বহিরাগত নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রতি পক্ষপাত দেখান। সুতরাং আদিবাসীরা মালিক ও শ্রমিক সঙ্ঘ—উভয়ের দ্বারাই পীড়িত। এইসব কারণের জন্য আকস্মিকভাবে আধুনিকতার ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষিপ্ত আদিবাসী সম্প্রদায় বিস্ফোরণের এক অতীব অনুকূল উপাদান।

সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের আদিম অবস্থায় রাখা উচিত বা সম্ভব নয় এবং তাঁদের আধুনিক যুগে আনতে হবে সুপরিকল্পিত উপায়ে যাতে প্রচলিত আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর আকস্মিকভাবে ঘটাতে গিয়ে তাঁদের অনাবশ্যক আঘাত ও বেদনা না সইতে হয়। এর অন্যতম প্রধান উপায় হল তাঁদের ভিতর জ্ঞান ও শিক্ষার আলো প্রসারের সর্ববিধ প্রয়াস করা এবং এর জন্য প্রয়োজন বুঝলে অপরের তুলনায় বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। তবে এই শিক্ষা বর্তমানের কেতাবী শিক্ষা মাত্র নয় যার ফলে বাঙালী বেকার সমস্যায় জর্জর। বর্তমান অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আদিবাসীসহ বাঙালীর শিক্ষাপদ্ধতিকে উৎপাদনমূলক কর্মকেন্দ্রিক করতে হবে।

॥ ৩ ॥

আধুনিক যুগে আনার এই সমস্যা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের অন্য কোন বিশেষ সমস্যা আছে কি যার পীড়ন কেবল আদিবাসী বলেই তাঁদের সহ্য করতে হয়?

একথা সত্য যে বর্ণহিন্দু অথবা তপশীলভুক্ত জাতির বাঙালীদের মধ্যে সাধারণভাবে আদিবাসীদের সম্বন্ধে একটা প্রচ্ছন্ন উপেক্ষা ও উন্নাসিকতার ভাব ছিল যা সমগ্র বাঙালী জাতির সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক। মুদ্রার অপর দিকে আদিবাসীদের মধ্যে অন্যান্য বাঙালীদের থেকে দূরে থাকার একটা মানসিকতা

—একটা হীনতাভাবেরও (inferiority complex) অস্তিত্ব ছিল। একদা তপশীলভুক্ত জাতির সম্বন্ধে বর্ণহিন্দুদেরও এই জাতীয় মনোভাব ছিল যা বর্তমানে এবং বিশেষ করে বঙ্গ বিভাগের পর যে প্রচণ্ড সামাজিক আলোড়ন হয় তার কারণে প্রায় অদৃশ্য। আদিবাসী-সমাজের ভিতর শিক্ষার প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যখন আরও বেশী করে আধুনিক জীবনযাত্রা গ্রহণ করবেন তখন অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগই বৃদ্ধি পাবে এবং এই ভাবে হিন্দিতে যাকে "রোটি ঔর বেটির" সম্পর্ক বলে—অর্থাৎ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে সংহতির গতিকে ত্বরান্বিত করবে। সুতরাং বর্ণ বা অবর্ণহিন্দুদের উন্নাসিকতা ও আদিবাসীদের হীনতাভাব প্রধানত আধুনিকীকরণের সমস্যা।

পৃথক থাকার মানসিকতা রাজনীতিতে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে কেবল আদিবাসীদের জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে পৃথক আদিবাসী রাজ্য ইত্যাদি সব কিছুর জন্যে দাবি উঠতে পারে। প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, ওড়িষ্যা ও আসামে স্বাধীনতার পর থেকেই এ জাতীয় বিচ্ছিন্নতাকামী এবং সেই কারণে আধুনিকতার মানসিকতাবিরোধী দাবি স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী-সমাজ সৌভাগ্যক্রমে এতদিন সঙ্কীর্ণ মানসিকতার শিকার হননি। কিন্তু ১৯৭১ সনের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ঝাড়খণ্ড পার্টির দুইজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় এবং আরও কয়েকটি নির্বাচনক্ষেত্রে কেবল আদিবাসীদের এই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা বেশ কিছু সংখ্যক ভোট পাওয়ায় বোঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজের একাংশের ভিতর পৃথক থাকার মনোবৃত্তি কাজ করছে। উত্তরবঙ্গেও ইদানিং মাঝে মাঝে "উত্তরাখণ্ড" নামক পৃথক আদিবাসী-প্রধান (?) রাজ্যের সম্বন্ধে কানাঘুষো চলছে। আদিবাসী সমাজের পৃথক জনপ্রতিনিধিত্ব এবং পৃথক রাজ্য সম্পর্কিত আপাত শ্রুতিসুখকর দাবি দুটি কতটা আদিবাসী সমাজের কল্যাণসাধনে সক্ষম সে সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ আদিবাসী যদি কোন দিন কোন জাদুমন্ত্র প্রভাবে সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য ভুলে কেবল আদিবাসী হিসাবে এক রাজনৈতিক ছত্রতলে সমবেত হন তবুও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে তাঁরা একক-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন না। কারণ বড় বেশী হলে তাঁদের তরফ থেকে

বিধানসভায় বিশ-বাইশ জন (জনসংখ্যার ভিত্তিতে) সদস্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু এরও কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পশ্চিমবঙ্গের তাবৎ আদিবাসী একটিমাত্র এলাকায় থাকেন না, যুগ যুগের স্বাভাবিক বিবর্তনের কারণে তাঁরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে আছেন। সুতরাং পৃথক থাকার দাবি নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়ালে এবং তাবৎ আদিবাসীদের সমর্থন পেলেও চার-পাঁচজনের বেশী আদিবাসী এইভাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাজ্যের রাজনীতি ও প্রশাসনে কোন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে হলে এঁদের অন্য দলের সঙ্গে হাত মেলাতেই হবে। কিন্তু পৃথক থাকার মনোবৃত্তির ভিত্তিতে ঐ কয়েকজন বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হলে তাঁরা অন্যান্য বাঙালীদের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলবেন যার ফলে পরে অন্যান্য দলের বিধানসভার সদস্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করা দুরূহ হবে। এর বিরুদ্ধে হয়ত বিগত মধ্যবর্তী নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে অন্তত সামাজিকভাবে পৃথক থাকার রাজনীতি সুফল প্রসব করেছে। কিন্তু ইতিহাসে বর্তমানের দুই চার মাস বা বছর কিছু নয় এবং ইতিহাসের বিধাতা শেষ হাসিটুকু নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেন। সুতরাং মুসলিম লীগের আপাত লাভে উত্তেজিত হবার কিছু নেই।

যদি ধরা যায় যে এইভাবে অনেকগুলি অথবা সবগুলি আদিবাসীদের আসনই পৃথক থাকার অনুগামী আদিবাসীরাই পেলেন তবু সমগ্র আদিবাসী-সমাজের তুলনায় তাঁরা কতটুকু? পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য, মন্ত্রী এবং সরকারী কর্মচারীদের বড় একটা অংশ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ অথবা বৈদ্যরা দীর্ঘকাল যাবৎ অধিকার করে আসছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর থেকে মুসলমান ও তপশীলভুক্ত জাতিরাও এইসব সরকারী সুযোগ-সুবিধার যথেষ্ট অংশ পেয়েছেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য অথবা মুসলমান ও অবর্ণহিন্দুদের তাতে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হয়েছে? তাঁদের অধিকাংশই কৃষক, শ্রমিক অথবা নিম্ন আয়ের কর্মচারী। বিশ-পঞ্চাশ জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, সেনগুপ্ত অথবা সৈয়দ কিংবা মণ্ডল পদবীধারী ব্যক্তি ঐসব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থেকে নিজেদের কিছু সুবিধা করে নিলেও বাদবাকী সেইসব পদবীধারী লক্ষ লক্ষ বাঙালীর কি সুবিধা হয় তাতে? নাগাভূমি ও মেঘালয়ে পৃথক পার্বত্যরাজ্য হবার ফলে সাধারণ নাগা অথবা খাসিয়া চাষী, মজুর অথবা নিম্নবিত্ত কর্মচারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্বের তুলনায় কতটুকু বেড়েছে? বিচ্ছিন্নতার মনোবৃত্তিকে একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে

নিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা যে পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছিলেন তার দ্বারাই বা সেখানকার কৃষক ও শ্রমিকের কতটুকু উপকার হয়েছে ? জনপ্রতিনিধি অথবা মন্ত্রী কিংবা সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা দশ-বিশ জন বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের অবস্থার বিশেষ কোন হেরফের হবার সম্ভাবনা নেই। রাজনীতিতে এই জাতীয় পৃথক থাকার ও বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা বরং আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে এবং বিশেষ করে সেই সমাজের নবসৃষ্ট অভিজাতদের (elites) অনগ্রসর সম্প্রদায়কে টেনে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করার বদলে নূতন সুবিধাভোগী গোষ্ঠীতে পরিণত করে স্বীয় সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্বাধীনতার পর আদিবাসী সমাজ থেকেও যে দলেরই হোক না কেন, বেশ কিছু সংখ্যক বিধান-সভা ও লোকসভার সদস্য, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হয়েছেন। কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাঁদের অধিকাংশই শীঘ্র ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধানসভা ও লোকসভার সদস্য এবং মন্ত্রী ও পদস্থ কর্মচারীদের ঝাঁকে মিশে গিয়ে সেই বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে (class) পুষ্ট করেছেন, তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, খানা-পিনা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি গ্রহণ করে তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। নিজেদের আদিবাসী-সমাজের কাছে তাঁরা এক রকম হারিয়ে গেছেন বললেই চলে।

সুতরাং আদিবাসী-সমাজের আর্থিক অনগ্রসরতার চিকিৎসা পৃথক থাকার রাজনীতি নয়—পশ্চিমবঙ্গের আর সবার সঙ্গে কদম মিলিয়ে এমন এক সমাজ-তান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করা যার ফলে কৃষি, সেচ ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি ঘটানো সম্ভব—প্রতিটি কর্মহীনের জন্য উৎপাদনমূলক কর্মের সংস্থান করা সম্ভব। বর্তমান লেখকের মতে সর্বোদয়ের পরিকল্পনাই সেই আদর্শ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি যাতে পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের পূর্বোক্ত চাহিদা মিটবে এবং যথাসম্ভব অল্প ব্যথা-বেদনায় তাঁদের ভিতর আধুনিক যুগের আবির্ভাব ঘটাবে। এক্ষেত্রে আদিবাসী-সমাজের কোন পৃথক সমস্যা নেই, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাঁদের সমস্যা।

প্রবাসী বাঙালীর কথা

অদূরে ক্রীড়ারত ছেলেমেয়েদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি প্রশ্ন করলাম, থাক তো মধ্যপ্রদেশের এই ছোট্ট শহরে। ওদের লেখাপড়ার কি ব্যবস্থা এখানে ?

আমি ছুটিতে বন্ধুর ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেক দিন পর দেখা। তাই খুঁটিয়ে খবরাখবর নেবার পালা আরম্ভ হল।

বন্ধু বললেন, কেন—এখানে একটি হাইস্কুল হয়েছে। সেখানেই পড়ে ওরা।

বিস্মিত কণ্ঠে আমি বললাম, এত দূরেও তোমরা বাঙলা স্কুল করেছ !

একটু হেসে বন্ধু বললেন, না—না। বাঙলা স্কুল নয়। বাঙালী ছাত্র এখানে আর ক'জন ? হিন্দির মাধ্যমে পড়ানো হয় এখানে।

হিন্দি ! আমার মুখ বেজার হয়ে উঠল। বাঙালীর ছেলে শেষকালে হিন্দি পড়ছে ?

বন্ধু তাড়াতাড়ি বললেন, কি করি ভাই—তিনটি ছেলেমেয়েকে বাঙলাদেশে হস্টেলে রেখে পড়াবার সামর্থ্য কই ?

আমি বললাম, কেন—কোন আত্মীয়স্বজনের ওখানে তো রাখতে পারতে।

কৈফিয়তের স্বরে বন্ধু জানালেন, সে সুবিধা নেই ভাই। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আর থাকলেও এই বয়সের বাচ্চাদের বাবা-মায়ের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করাটা ওদের বা বাবা-মা—কারও পক্ষেই শুভ হবে না। সুতরাং আমরা নিজেদের কাছে রাখাই স্থির করেছি।

আমি তবু সন্তুষ্ট হলাম না। বললাম, তা যেন হল। কিন্তু বাঙালীর ছেলে বাঙলা শিখবে না—এ কেমন কথা হল ?

বন্ধু বললেন, কেন বাঙলা তো ওরা জানে। বাড়িতে বাঙলায় কথাবার্তা বলছে। আর তা ছাড়া মায়ের কাছে ওরা বাঙলা শেখেও। বাঙলা গল্পের বই পড়ছে। ওদের জন্য একটি পত্রিকাও আসে। বেশ আগ্রহ করে পড়ে ওরা সেটি।

একটু অবিশ্বাসের হাসি হেসে আমি বললাম, এতে কি আর বাঙালীর ছেলের যথেষ্ট বাঙলা-জ্ঞান হয় ?

বন্ধু বললেন, নাই বা হল বাঙলাদেশের বাঙালী ছেলের মত বাঙলা ভাষার জ্ঞান। ক্ষতি কি তাতে ?

বল কি হে ! আমার বিস্ময়মিশ্রিত প্রশ্ন।

বন্ধু বললেন, হ্যাঁ। দেখ একটা স্পষ্ট সত্য তোমাকে বলি। বাঙলাদেশে আমাদের পেটের ভাত জোগাড় করতে পারিনি বলেই না আমরা প্রবাসে আসতে বাধ্য হয়েছি। আর ক্রমশ বাঙলাদেশ থেকে আরও অনেক বাঙালীকে এইভাবে অন্য রাজ্যে চলে আসতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সব বাঙালীর অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কদাচিৎ কেউ বাঙলাদেশে ফিরে গেলেও এদের মধ্যে অধিকাংশকেই ভিন্ন প্রদেশে থাকতে হবে। সুতরাং আমরা যে প্রদেশে থাকব সে প্রদেশের ভাষা না শিখলে রোজগার করে খাব কি করে ?

তা বলে হিন্দি ?

হিন্দি নয় কেন ! But বাট আর Put-এর ধাঁধা ভেদ করে যদি আমরা ইংরেজি শিখে থাকি, তাহলে হিন্দি কি দোষ করল ? আর বাঙালীর পক্ষে ইংরেজির তুলনায় হিন্দি শেখা যে অনেক সহজ—এটা তোমাকে মানতেই হবে। শুধু হিন্দি কেন, সংস্কৃতের সঙ্গে সম্বন্ধিত হবার জন্য গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি যে-কোন উত্তরভারতের ভাষা শিখতে বাঙালীর কষ্ট হবার কারণ নেই।

কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি থাকবে না ? আমি এবার আমার যুক্তি-তূণের সবচেয়ে শক্তিশালী শর নিক্ষেপ করলাম।

বন্ধু বললেন, তোমার এ প্রশ্নের জবাব দেব দুই ভাগে। এর প্রথম ভাগের জবাব আমার একটি প্রশ্নের মারফত পাওয়া যাবে। বাঙালীর ছেলে অন্য কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেলে তোমাদের ভ্রূকুঞ্চিত হয়; কিন্তু বাঙলাদেশেই দেখছি কনভেন্টে ছেলেমেয়েদের পাঠানোর রেওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে। অভারতীয় পরিবেশের মধ্যে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা নেবার এই ফ্যাশনের বিরুদ্ধে তোমরা তো কই কেউ কিছু বল না।

আমি খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, একটা অন্যায় দিয়ে আর একটা অন্যায়ের সমর্থন করা যায় না।

বন্ধু বলতে লাগলেন, আমার জবাবের দ্বিতীয় অংশ হল এই যে ভাষা সংস্কৃতির অন্যতম বাহ্য নিদর্শন হতে পারে কিন্তু একমাত্র নিরিখ নয়। তা যদি

হত তাহলে প্রথম যৌবন পর্যন্ত বাঙলা তো দূরের কথা কোনরকম ভারতীয় ভাষা অথবা আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অরবিন্দ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দ হতেন না। সংস্কৃতির মূল ধর্মেরই মত গুহায়াম্ নিহিতম্। আর তা ছাড়া জানই তো আমি একথা বিশ্বাস করি না যে ভারতসংস্কৃতি ছাড়া বাঙালীর পৃথক্ কোন সংস্কৃতি আছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি এক এবং অবিভাজ্য—বাঙালীর বড় বেশী হলে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আমি বললাম, বেশ তুমি যদি বৈশিষ্ট্য বলে আনন্দলাভ করতে চাও আমি তাতে বাধা দেব না। বাঙালী তার ঐ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবে না?

বন্ধু বললেন, পারলে অবশ্যই রাখবে। তবে না পারলে একটা মহা সর্বনাশ হয়ে গেল মনে করার কারণ নেই।

নেই?

না, নেই। কারণ এই বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে বদলেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙালীর সঙ্গে না হয় না-ই তুলনা করলাম। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের কতটুকু আজ অবশিষ্ট আছে? হুতোম বর্ণিত বাঙালীবাবু কি আজ আমরা কোথাও দেখতে পাই?

আমি হতাশার ভঙ্গিতে বললাম, তুমি তো সব গুলিয়ে দিচ্ছ হে। তোমার কাছে সবই তো শূন্য।

শূন্য নয়—পূর্ণের প্রস্তুতি। যুগে যুগে বাঙালীর ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা—সব বদলেছে ও বদলাচ্ছে যেমন বদলাচ্ছে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেদের মূল্যবোধ। বদলে বিশ্বমানবতার পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ এক মহাভারত গড়ার অভিমুখে চলেছি আমরা। এই মহান্ ও শাশ্বত প্রবাহের সঙ্গে একাত্ম হলেই আমাদের মত প্রবাসী বাঙালী বাঁচবে। নচেৎ বিবর্তনের পথে অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় প্রকৃতি আমাদের আপনিই ঝেড়ে ফেলে দেবে।

বাঙলাদেশের হৃদয় হতে

পূর্ব পাকিস্তানে এই সর্বপ্রথম পাকিস্তানের স্রষ্টা ও স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আলী জিন্না আসছেন। বলাবাহুল্য ঢাকা শহরে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পাকিস্তানই নয়—একদিকে মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে কায়েদ-এ-আজম জিন্নার দোর্দণ্ড প্রতাপ। ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাষ্ট্রনায়করাও তাঁকে যথেষ্ট সমীহ করেন।

১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ। কায়েদ-এ-আজম ভাষণ দেবেন ঢাকার কার্জন হলে। তিল ধারণের স্থান নেই সেই হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতির ফলে। বাইরেও বিরাট জনসমুদ্র অপেক্ষমাণ পাকিস্তানের এই জনপ্রিয় নেতার শুধু একটু দর্শনলাভের আশায়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জিন্না সাহেব সেদিন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র-ভাষার সম্বন্ধে বলা আরম্ভ করলেন, যা নিয়ে স্বভাবতই কিছুদিন ধরে পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন চলছিল। কায়েদ-এ-আজম তাঁর স্বভাব-সুলভ কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে নিজের অভিমতের কথা বলছিলেন। এই কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিত্বের প্রয়াসেই কবিকল্পনা থেকে তিলে তিলে পাকিস্তান বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এই কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তিত্বের কাছে নির্বিচারে মস্তক অবনত করেই পাকিস্তানের শত শত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁদের ক্ষমতা ও আধিপত্যের পথ সুগম করেছিলেন।

কায়েদ-এ-আজম তাঁর স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলছিলেন, স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু—একমাত্র উর্দু। হঠাৎ হলের এক প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠল। না—কখনই না। এক মুহূর্তের জন্য হলে সূচিভেদ্য নীরবতা ছেয়ে পড়ল। কে এই দুঃসাহসী যার কায়েদ-এ-আজমের কথার উপর এভাবে কথা বলার আস্পর্ধা।

দুঃসাহসী তরুণটির নাম শেখ মুজিবর রহমান। অখণ্ড বাংলার এককালীন প্রধানমন্ত্রী ও মুসলিম লীগের নেতা শহীদ সুরাবর্দী সাহেবের অনুগামী মুসলিম ছাত্র প্রতিষ্ঠানের নেতা।

অথচ এমন মধ্যাহ্নে আঁধারের সূচনা দেখা দেবার তো কথা নয়। আর সব অঞ্চলের মুসলমানদের মত পূর্ব পাকিস্তানের (তদানীন্তন পূর্ববাংলার) অধিকাংশ

অধিবাসীই তো পাকিস্তান ও তার জনক জিন্না সাহেবের সপক্ষে রায় দিয়েছেন ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মকেও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম জনসাধারণ হৃদয়ের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। নূতন রাষ্ট্রের বনিয়াদ হল ইসলাম। আরবের মরুপ্রান্তরে যে ধর্মের জন্ম হয়েছিল এবং অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তির জন্য যা ইউরোপের স্পেন থেকে আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়া হয়ে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই তের শ বছরের মধ্যে, তারই সমতাকারী প্রভাবের দ্বারা সহজেই পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চাবচ বন্ধুর পর্বত ও পূর্ব পাকিস্তানের মেঘনা-পদ্মা-বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষার "আপাত পার্থক্য" মিটিয়ে ফেলা যাবে। হিন্দুদের আর্থিক কর্তৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব বিদূরিত হলে লাহোর-কোয়েটা-করাচী আর ঢাকা-রাজসাহী-চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু সে বিশ্বাস তো টিকল না। পাকিস্তানের জন্ম হতে না হতেই তার কোণে কোণে অসন্তোষের যে চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, ছয় মাস যেতে না যেতেই তার জনক কায়েদ-এ-আজমের বক্তৃতার প্রকাশ্য প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে নূতন মুসলিম রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে তা মুখর হয়ে উঠল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙলা ও বাঙালীর ইতিহাস যে নূতন মোড় নিয়েছিল ছয় মাসের মধ্যে আবার সেই ইতিহাস নূতন মোড় নেবার উপক্রম করল।

কিন্তু কেন এমন হল?

ভূগোলের মধ্যে এর অন্যতম প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। দেশের দুটি অংশের মধ্যে এক হাজার মাইলেরও বেশী ব্যবধান এবং মাঝখানে ভারতের মত অপর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এমনকি বিমানের সাহায্যেও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ রাখা সহজ নয়। কারণ ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকে তার বিমানাকাশ ব্যবহার করা সম্ভব নয় এবং অপর একটি স্বাধীন দেশ সিংহলের অনুমতি ছাড়া কলম্বোতে বিমানযাত্রার প্রয়োজনীয় সাময়িক বিরতি করা যাবে না। সমুদ্রপথে যোগাযোগ বহু সময়সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় কারণ ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে পড়ে। বাঙালীর ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের জাতিগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। বাঙালী মুসলমানদের প্রায় সবাই ধর্মান্তরিত হিন্দু বা বৌদ্ধ। বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে আর্যরক্ত যতটুকু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আরব বা ইরানের রক্তও ততটুকু—একথা বললে সম্ভবত অতিশয়োক্তি হবে না।

নৃবিদ্যার সঙ্গে সংস্কৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সংস্কৃতির একটা বড় উপাদান হল মানসিকতা। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মানসিকতার সাযুজ্যের জন্য একই যাত্রা, ঢপ, জারি, বাউল ও ভাটিয়ালী গান উভয়ের মনোমত। পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাকামী দাবি প্রবল হবার পূর্বে হিন্দুদের দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় বাঙালী মুসলমানরা যোগ দিতেন এবং মুসলমানদের মহররমের তাজিয়ায় বাঙালী হিন্দুদের যোগদান করাও বহুল প্রচলিত ছিল। এই একই মানসিকতা রাজনৈতিক কারণে ভেদবুদ্ধি প্রবল হবার পূর্বে প্রায় সাতশত বৎসরের যুক্ত-সাধনায় সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের মত সমন্বয়ের দেবতার জন্ম দিয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমগ্র বঙ্গব্যাপী সমন্বয়ের নিদর্শন ছাড়াও এমন বহু স্থানীয় আঞ্চলিক দেব-দেবীর উপাসনার প্রবর্তন হয়েছিল (দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি ও আরও কত শত) যা এই সমমানসিকতার নিদর্শন। নীট কথা হল এই যে মনের দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমান পঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং এমনকি আরও কাছের বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মুসলমানের চেয়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের অধিকতর নিকটবর্তী। এরই কারণে পাক সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও উভয় অংশের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহ আদৌ জনপ্রিয় হয়নি। চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মুহূর্তেও লোকচক্ষুর অন্তরালে লোকসংস্কৃতির স্তরে এই সমমানসিকতা ক্রিয়া করেছে এবং পাকিস্তান অর্জনের প্রথম উৎসাহে ভাঁটা পড়ার পর তা আরও প্রবলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই একই কারণে বহু ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার চরম উত্তেজনার সময়েও বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান ভিন্নধর্মের বাঙালীকে আশ্রয় দিয়েছে—রক্ষা করেছে। কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করা যেতে পারে যে এমনকি ১৯৬০ সালের আসামের দাঙ্গার সময়ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসামে গিয়ে বসতি স্থাপনকারী মুসলমানরা অসমীয়া হিন্দুদের আক্রমণের হাত থেকে বাঙালী হিন্দুদের রক্ষা করেছেন, তাঁদের আশ্রয় ও আহার্য দিয়েছেন—এমন বহু ঘটনার কথা জানা গেছে।

অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেছেন। এর চেয়েও বড় কথা হল এই যে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অপমান ও পীড়নের কারণে উদ্বাস্তু বহু লক্ষ হিন্দুরাও অতীতের তিক্ততা ও বেদনা ভুলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুধু সাহায্য করেননি, সাময়িক-ভাবে উদ্বাস্তু ঐ দেশের মুসলমানদেরও সাধ্যমত আশ্রয় দিয়েছেন—আপ্যায়ন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই সংস্কৃতির অপর এক প্রমুখ উপাদান ভাষার কথাও এসে পড়ে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় সব পূর্ব পাকিস্তানীর মাতৃভাষা ছিল বাঙলা। ভিন্ন প্রদেশাগত যেসব পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান অথবা নবাব-জমিদার শ্রেণীর মুসলমান ইরান-তুরানের সঙ্গে নৈকট্য প্রমাণের এক অলীক আভিজাত্য-বোধে চালিত হয়ে বাঙলার বদলে উর্দু বলা পছন্দ করতেন (অথচ উর্দু আদৌ মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশের ভাষা নয়—নিছকই এক ভারতীয় ভাষা) তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোনার মত। সুতরাং ভাষার দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের সঙ্গে পঞ্জাবী, পুস্তু অথবা সিন্ধীভাষী পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোন মিল ছিল না।

ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলাভাষী মুসলমানদের পক্ষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর কোন যৌক্তিকতাও নেই। কারণ পূর্বেই আমরা দেখেছি (প্রথম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে বাঙলা সাহিত্য এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনার ফল। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের তাই এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাহিত্যের অবদান বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র অথবা নজরুলের রচনাবলীর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে বলার অর্থ তাঁদের সাংস্কৃতিক আত্মহত্যা করতে বলার মত। বলা বাহুল্য অতীব সঙ্গত কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানেরা এই সাংস্কৃতিক আত্মহত্যা করে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক সম্প্রদায়কে বাধিত করেননি।

ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে এই যে প্রচণ্ড পার্থক্য তার আপাত বিলোপ করা হয়েছিল ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক সম্প্রদায়—পাকিস্তানের জন্মলগ্নে যাঁদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল—প্রথম থেকেই পূব পাকিস্তানের অধিবাসীদের নিজেদের সমান মনে করেননি। যেহেতু ওদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভিন্ন সেই কারণে ওরা আমাদের থেকে হীন—এই জাতীয় একটা অহংমন্যতায় তাঁরা প্রথমাবধি ভুগছিলেন। (এবং এ দোষ কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের অভিজাত সম্প্রদায়েরই নয়। সব দেশে সব যুগে শাসক সম্প্রদায় কর্তৃক এভাবে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের হেয় জ্ঞান করার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে।)

অপরকে হেয় জ্ঞান করার মধ্যে তাদের আর্থিক শোষণ করার প্রবৃত্তির বীজ লুকিয়ে থাকে। ক্রীতদাস ও প্লেবিয়ানদের শোষণের উপর রোমান সভ্যতা এবং

এশিয়া ও আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের শোষণের উপর যন্ত্রবিপ্লবের পরবর্তী ইউরোপীয় সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছিল। শিল্প শ্রমিক বা প্রোলিটারিয়েটদের ভূস্বর্গ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রথম দিকের সমৃদ্ধির অন্তরালে ছিল কুলাক বা মাঝারি ও ছোট খামারের মালিক কৃষকদের শোষণ। শূদ্র ও অন্ত্যজেরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পূজারীদের কাছে ব্রাত্য হলেও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের "সেবা" করতে বাধ্য ছিলেন। সুতরাং এই একই বিধান চালিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক সম্প্রদায় পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক শোষণের ব্যবস্থা গড়ে তুললেন।

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের আয়তনে এই শোষণের পরিণামস্বরূপ বৈষম্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণের এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) ১৯৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৬১ ভাগ বেশী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় তার পূর্ববর্তী দশ বছরে দ্বিগুণ হয়েছিল।

(২) ১৯৫০-৫৫ খ্রীস্টাব্দে যেখানে পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগ হয়েছে পশ্চিম অংশে, পূর্ব অংশের ভাগে (জনসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও) জুটেছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য দূর করার বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ১৯৬৫-৭০ সনের মধ্যে এর অংশ শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী হয়নি।

(৩) শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় অর্ধেকই হত পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে এবং পূর্ব অংশকে চড়া দামে পশ্চিম অংশের নিকৃষ্ট পণ্যরাজি কিনতে বাধ্য করা হত।

(৪) পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানী বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমাংশের ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়োগ করেন এবং এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের কাজে লাগানো হয়। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কুড়ি বছরে এইভাবে ৩ কোটিরও বেশী টাকা পূর্ব পাকিস্তাম থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

(৫) সরকারী ভাষ্য মতে পূর্ব পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নয়ন হারের কারণ বাড়তি জনসংখ্যা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কম।

(৬) পশ্চিমের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক শিল্পবাণিজ্য বিশেষ গড়ে

ওঠেনি। যেটুকু হয়েছে তার মালিক পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি একচেটিয়া পরিবার এবং তার লাভের কড়িও সেখানেই যায়।

(৭) রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে হবার জন্য সরকারী ব্যয়ের (আধুনিক কালের অর্থনীতিতে যার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ) অধিকাংশ হয়েছে ঐ অঞ্চলে এবং তার দ্বারাও পরোক্ষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানই সমৃদ্ধ হয়েছে যদিও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারী আয়ের অধিকাংশের উৎস পূর্ব পাকিস্তান।

(৮) সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য করা হয়। অনেক আন্দোলন ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোন সময়েই উচ্চতর প্রশাসনিক পদে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দাদের হার শতকরা ৩৬ জনের বেশী হয়নি। এমন কি ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তাঁর ১৯ জন সেক্রেটারীর মধ্যে ৩ জনের বেশী বাঙালী খুঁজে পাননি। সামরিক বিভাগেও পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রবেশাধিকার সীমিত ছিল। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তানের স্থলবাহিনীতে মাত্র একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন যিনি পূর্ব পাকিস্তানী। বিমানবহর বা নৌসেনাবাহিনীতে ঐ জাতীয় পদে কোন দিনই কোন পূর্ব পাকিস্তানী উঠতে পারেননি।

এর অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল রাজনৈতিক। সেই সশস্ত্র বিপ্লবের কাল থেকে পূর্ব পাকিস্তান (তখন পূর্ববঙ্গ) রাজনৈতিক কার্যকলাপের লীলাভূমি। ফলে বহু অঞ্চলের তুলনায় (পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তো বটেই) পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং বিশেষ করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে রাজনৈতিক সচেতনতা অনেক বেশী ছিল। এর উপর পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিকেই ভারতবর্ষ এবং অদূরে চীন। ভারতের সঙ্গে প্রথমাবধি পাকিস্তান সরকার শত্রুতা করলেও এবং ভারতের সংসর্গ বিষবৎ পরিহার করলেও আধুনিক যুগের কল্যাণে তার সংসদীয় গণতন্ত্রের মোটামুটি সাফল্যজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ পূর্ব পাকিস্তানে না পৌঁছে পারেনি। প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীদের সার্বজনিক ভোটের অস্ত্রে সাধারণ মানুষ শাসক বদলাতে পারে। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক বিধি-বিধান রচনা করে তাকে কাজে পরিণত করার প্রয়াস করতে পারে—সাগ্রহে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তা লক্ষ্য করেছেন। অনুরূপভাবে চীনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে মাখামাখি করার পাকিস্তানের সরকারী

নীতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের চীনের কাছাকাছি আসার সুযোগ দিয়েছিল।

একদিকে গণতন্ত্র এবং অপরদিকে সাম্যবাদ—এই দুই প্রবল রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে পাকিস্তানের অবদান কি? তার নাম ঐস্লামিক গণতন্ত্র। স্বভাবতই এই সোনার পাথরবাটি তত্ত্বের অকিঞ্চিৎকরতা ধরে ফেলতে রাজনীতি-সচেতন পূর্ব পাকিস্তানের বেশী বেগ পেতে হয়নি। প্রকাশ্যে স্বীকার করতে কুণ্ঠা থাকলেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এযুগের কোন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে ঐস্লামিক অর্থাৎ আত্যন্ত শরিয়তী শাসনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা ভাবা অসম্ভব। আর গণতন্ত্র? পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস অতীব বেদনাদায়ক।

গণতন্ত্রের এক প্রধান শর্ত—সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কোন দিনই পাকিস্তানে স্বীকৃতি পায়নি। কারণ তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের হাতে দেশের কর্তৃত্ব চলে যাবে যা পাকিস্তানের আসল কর্ণধার ব্যবসায়ী-উচ্চপদস্থ আমলা ও সমরনায়কচক্রের আদৌ অভিপ্রেত নয়। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচনা করতে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সাড়ে আট বছর সময় লাগে। এর মধ্যে পূর্বোক্ত শাসকচক্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ছলে বলে কৌশলে পূর্ব অংশকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যাবতীয় প্রয়াস করেছেন।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ কেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করেন যাতে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা তখন পাকিস্তানের লোকসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ। অর্থাৎ প্রথম থেকেই কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আর কি পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি পশ্চিমের শাসক সম্প্রদায়ের আস্থা ছিল না। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রবল বিরোধ এবং পরবর্তী কালে লিয়াকৎ আলী খাঁর মৃত্যুর জন্য ঐ ফরমুলা কার্যে পরিণত হয়নি।

১৯৫২ সনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে দিয়ে পূর্বোক্ত ধরনের এক ফরমুলা পেশ করা হয়। বলা বাহুল্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই প্রস্তাবেরও প্রবল বিরোধিতা হয়। আসল শাসকচক্র কর্তৃক তিনি পদচ্যুত হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বগুড়ার মহম্মদ আলী তৃতীয় এক পরিকল্পনা পেশ করেন যার বাহ্যরূপ ভিন্ন হলেও আসলে একই। এতে দুই সভার নিম্ন সভায় পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেবার কথা বললেও উচ্চ সভায় তার থেকে বঞ্চিত

করে সংখ্যালঘু করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। মহম্মদ আলী পদচ্যুত হলে তাঁর পরিকল্পনারও পূর্বের ওই পরিকল্পনার দশা ঘটে।

অবশেষে এক কক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় বিধানসভায় দুই অংশের সমান সংখ্যক সদস্য থাকবে (pari y)—এই ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের সমস্যার একটা সমাধান হল। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই বিধান লিপিবদ্ধ হল। কিন্তু এই বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সম্মতি পাবার জন্য বলা হল যে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানীরা সমান আসন পাবে। তবে এই শর্ত যে কোন দিনই পালিত হয়নি, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

তবে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার এই বাহ্য অনুষ্ঠানটুকুও ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর লুপ্ত হয়। এবং সেই অবস্থা ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত চলে। ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার ব্যবস্থাপনায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে যে নির্বাচন হয় তার মাধ্যমে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে বলে অনেকে আশা করলেও পাক শাসকচক্রের আদৌ তা কাম্য ছিল না। তাই কোন না কোন ছুতানাতায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে বিলম্বিত করা হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবরের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে তাঁকে অপর এক সংখ্যালঘু দলের নেতা জনাব ভুট্টোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য চাপ দেওয়া হতে লাগল এবং বলা হল প্রস্তাবিত সংবিধান স্বীকার বা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির, যিনি আদৌ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিও নন। অর্থাৎ আইয়ুব থেকে ইয়াহিয়া—সেই একই স্বৈরতন্ত্রী ব্যবস্থার নিদর্শন।

আর সামরিক শাসনের পূর্বে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মর্যাদা? জনৈক বিশেষজ্ঞের হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে (যখন পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তত কাঠামোটুকু বজায় ছিল) জাতীয় পরিষদ বা পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসেছে মাত্র ৩৩৮ দিন অর্থাৎ বৎসরে মাত্র ৩০ দিন হিসাবে। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় পরিষদে মাত্র ১৬০টি আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, অথচ ঐ একই সময়ে গভর্নর জেনারেল বা রাষ্ট্রপতি ৩৭৬টি গুরুত্বপূর্ণ অর্ডিন্যান্স জারি করেন।

সংক্ষেপে পাকিস্তানের ঐস্লামিক গণতন্ত্রের এই হল চিত্র।

॥ ৩ ॥

১৯৪৮ সনের ২৪শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী-আমলা-সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী ও তাঁদের অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বাঙলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙালীর যে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে ধাপে ধাপে তা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে অবশেষে ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর বাঙালী নিধন যজ্ঞের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিণত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ হবার, সাত কোটি ওপার বাংলার মানুষের এই গৌরবোজ্জ্বল গাথা, আজ সর্বজনবিদিত কাহিনী। তাই তার বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়াস এখানে করা হবে না।

তবুও মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তির এই মহাকাব্যের কয়েকটি দিক-চিহ্নের উল্লেখ এখানে করা হবে এই মহান্ সংগ্রামের গতিবিধির মূল্যায়নের জন্য। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য শেখ মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার হন। ১৯৫০ সনের ২৪শে নভেম্বর মুসলীম লীগ পরিষদীয় দলের ১৩ জন সদস্য এক যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তান চঞ্চল। বেসিক কমিটির প্রতিবেদনে বাঙলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় প্রবল বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিসের গুলি-চালনায় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯ জন ছাত্র সহ বহু নর-নারী হতাহত। ফলে বিক্ষোভ ও আন্দোলন আরও উত্তাল হয়ে উঠল।

১৯৫৪ সনের ১৯শে মার্চ সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রচণ্ডভাবে পর্যুদস্ত করে জনাব শহীদ সুরাবর্দী ও জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হল। ২৯শে মে কেন্দ্রীয় পাক সরকার যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বরখাস্ত করে রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তন করলেন।

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হল ও যাবতীয় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হল। ১২ই অক্টোবর শেখ মুজিবর ও মৌলানা ভাসানী ইত্যাদি নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলেন।

১৯৬২ সনের এপ্রিল মাসে বিগত বৎসরের আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের জের চলতে থাকে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নিরস্ত্র মানুষদের গুলি করে হত্যা করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার চারজন বাঙালী সদস্য পদত্যাগ করেন।

৯ই জুন আন্দোলনের ফলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। "বুনিয়াদী গণতন্ত্রের" ভিত্তিতে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান এতে সন্তুষ্ট নয়—পূর্ণ গণতন্ত্র চায়।

১৯৬৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য তাঁর ছয় দফা প্রস্তাব পেশ করলেন। ২০শে মার্চ তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। ৭ই জুন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রচণ্ড আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ। শত শত নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী নিহত। কখনও প্রবল কখনও বা মৃদুভাবে ১৯৬৭ সনেও এই আন্দোলন চলতে থাকে।

১৯৬৮ সনের ৫ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের নিদর্শন তুলে ধরার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করার অভিযোগে সামরিক অফিসার সহ আঠাশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি কারারুদ্ধ। আগরতলা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৮ই জানুয়ারী মুজিবর রহমান গ্রেপ্তার। ৭ই ডিসেম্বর প্রচণ্ড আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ। বহু হতাহত ও কারারুদ্ধ। ১৪ই ডিসেম্বর আন্দোলনের ফলে আয়ুবের পতন।

১৯৬৯ সনের ২৫শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কর্তৃক সামরিক শাসন জারি। ২৬শে মার্চ "অবস্থা স্বাভাবিক" হলে জনসাধারণকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। ২৮শে মার্চ মুজিবর রহমান কর্তৃক ফেডারেল সরকারের পরিকল্পনা পেশ।

১৯৭০ সনের ১লা জানুয়ারী রাজনৈতিক দলসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার ফলে বহু সহস্র ব্যক্তি মৃত ও বহু ক্ষয়ক্ষতি। ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন সম্পন্ন, এবং মুজিবের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিম পাকিস্তানে জনাব ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ। ৯ই ডিসেম্বর তাঁর ছয় দফার ভিত্তিতে মুজিব কর্তৃক নূতন সংবিধানে স্বায়ত্তশাসনের দাবি। ১০ই ডিসেম্বর মৌলানা ভাসানী কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের দাবি। ১২ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের আরও তিনটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক স্বাধীনতার দাবি সমর্থন।

১৯৭১ সনের ১৬ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে ইঙ্গিত করেন। ২৯শে জানুয়ারী স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ঢাকায় ভুট্টো-মুজিবের সংবিধান সংক্রান্ত

আলোচনা ভেঙে যায়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী মুজিব ঘোষণা করেন যে বাঙালীর সংস্কৃতিকে নষ্ট করার জন্য ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করা হবে না। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া ভুট্টোর দাবির কাছে নতিস্বীকার করে জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করেন। দোসরা মার্চ ঢাকা ও অন্যত্র প্রবল গণবিক্ষোভ, সৈন্যবাহিনী তলব ও সান্ধ্য আইন জারি। তেসরা মার্চ আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ৫ই মার্চ সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ৩০০ আন্দোলনকারীকে হত্যা। ৭ই মার্চ মুজিব জনসাধারণকে কর দিতে নিষেধ করেন ও সরকারী কর্মচারীদের তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ নিতে বলেন। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে। ৮ই মার্চ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ৯ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের বিচারপতিরা নূতন গভর্ণর ও সামরিক প্রশাসক টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। ১৫ই মার্চ মুজিব একতরফা স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা প্রচার করেন ও পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে ৩৫টি নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া ও মুজিবের সঙ্গে সাংবিধানিক আলোচনা চলছে যাতে ২১শে মার্চ ভুট্টোও যোগ দেন। ২৫শে মার্চ আওয়ামী লীগ সূত্রে প্রকাশ যে বার্তালাপে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে সৈন্যদল কর্তৃক নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করার আরও খবর আসে। আরও সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসছে। ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও অন্য সব উচ্চপদস্থ পশ্চিম পাকিস্তানীদের ঢাকা ত্যাগ। রাত্রি থেকে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু এবং বাংলাদেশের জন্ম।

॥ ৪ ॥

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই তার নিকটতম প্রতিবেশী ও তার সুখ-দুঃখের ভাগীদার ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে যার সঙ্গে তার নাড়ির টান সবচেয়ে বেশী সেই পশ্চিমবঙ্গে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছেন যে এই নূতন রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তাই স্বভাবতই প্রতিটি প্রগতিশীল মানুষের মনোজগতে বাংলাদেশ এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে এবং স্বাধীনতার পর দ্রুত এক সংবিধান রচনা করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করছে। বলা বাহুল্য যুদ্ধ ও তার আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষাবস্থা ও মহামারী ইত্যাদিতে ক্ষতবিক্ষত এক নবীন রাষ্ট্রের পক্ষে এ এক বিরাট কৃতিত্ব। তবে শেষ অবধি সশস্ত্র সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা অর্জন করার দামও বাংলাদেশকে দিতে হবে। একবার বুলেটের প্রাধান্য সমাজে স্বীকৃত হবার পর আবার ব্যালটের প্রাধান্যে প্রত্যাবর্তন করা সহজ নয়—বিশেষ বাংলাদেশের মত যেখানে পাড়ায় পাড়ায় এখনও ভূরি প্রমাণ বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে। আইনের রাজত্ব বাংলাদেশের ঘোষিত লক্ষ্য হলেও সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহ্যের কারণে ঐ লক্ষ্যের সাধন খুব সহজ হবে না। বাংলাদেশের নেতৃত্বের অগ্নি-পরীক্ষা নিহিত এইখানে।

বাংলাদেশ সংসদীয় পদ্ধতিতে অর্থাৎ আইনসভায় আইন প্রণয়ন করে এবং প্রশাসনযন্ত্রের মাধ্যমে তাকে কার্যকর করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেছে। সমাজবাদের বহুবিধ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য সত্ত্বেও কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড আছে যার অন্যতম হল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা। একমাত্র ভবিষ্যতেই একথা বলা সম্ভব হবে যে বাংলাদেশের নেতৃত্ব কতটা এই লক্ষ্যের পরিপূর্তিতে সমর্থ হয়েছে। তবে একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে যথাযথভাবে সংসদীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই দিকে তার অগ্রগতির হার ভারতের চেয়ে বেশী হবে না। অর্থাৎ দরিদ্রতম ব্যক্তিদের কল্যাণ সাধন প্রয়াস এক বিলম্বিত প্রক্রিয়া হবে। বাংলাদেশের জনসাধারণ ততদিন এই জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকবে অথবা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পথ ছেড়ে স্বৈরতন্ত্রী সমাজবাদের পথ ধরবে কিনা—তা বর্তমানে অনুমান করা সম্ভব নয়।

প্রভূত পরিমাণ অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার শিক্ষা পেয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম বণিকচক্রের আর্থিক শোষণ ও অবশেষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রদের পাইকারী হারে হত্যা ও লুণ্ঠন এবং এমনকি সহস্র সহস্র মুসলিম নারীর সম্ভ্রম নাশ বাংলাদেশকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নেই। এই শিক্ষার বলে বাংলাদেশ রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যযুগ ছেড়ে এক লাফে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে। তবে

আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতিশীল ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যুক্তিবাদের সহায়তায় সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করলেও বাংলাদেশের আপামর মুসলমান জনসাধারণ যে ইতিমধ্যে এতদিনের পরিবেশিত বিষের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছে বা পারবে—এই উচ্চাশা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কারণ এ ব্যাধি এত সহজে যায় না, এর জন্য দীর্ঘ অনুশীলন করতে হয়। ভারতরাষ্ট্র অথবা তার নেতৃত্ব যে রাজনৈতিক দলের হাতে সেই কংগ্রেস কোন দিনই সজ্ঞানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় না দিলেও ভারতে এখনও এই বিষের রেশ রয়েছে—এ আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং জনসাধারণের মনের থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য বাংলাদেশের নেতৃত্বকে এখনও অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এবং যতদিন না সেই বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছান যাচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুরা যে বিচ্ছিন্নভাবে (এবং হয়ত বা ব্যাপকভাবেও—যদি বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এর দ্বারা স্বীয় লক্ষ্যসাধন সম্ভব বলে মনে করেন) বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হবেন তার আশঙ্কা আছে।

এবার ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কথা আসে। ভারত বাংলাদেশের জন্য যা করেছে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ তার জন্য কৃতজ্ঞ এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজবাদী বাংলাদেশ প্রতিবেশী হিসাবে ভারতের পক্ষেও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্য ভারতের স্বার্থেও বাংলাদেশের এই নূতন যুগের আবাহন ক্রিয়াকে এদেশের সহাযতা করা উচিত। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ভারত সরকার অথবা ভারতীয় বণিকসমাজের কোন রকম মাতব্বরী ও শোষণ-প্রয়াস বাংলাদেশ বরদাস্ত করবে। বাংলাদেশ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক এবং বিশেষ করে ইসলামের মত আবেগের ক্ষেত্রস্থ গভীর বন্ধনও ছিঁড়ে ফেলেছে প্রয়োজনে তেমনি ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব-বন্ধনও ছিন্ন করতে পারে। বিশেষ করে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের চারপাশে এখন বিশ্বরাজনীতির অনেক মৎস্যশিকারী টোপ ফেলছে এবং বাংলা-দেশের ভিতরেও রাজনৈতিক ক্ষমতা পেতে আকাঙ্ক্ষী এমন দলের অভাব নেই যারা জনসাধারণকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য ভারতের সত্য বা কল্পিত শোষণের ভূতকে চাঙ্গা করতে চায়। সুতরাং ভারত ও বিশেষ করে তার অধিবাসীদের বাংলাদেশের সঙ্গে অত্যন্ত সংযত ও সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশ যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ও নিজের ভালো-মন্দ নির্ধারণের

সম্পূর্ণ অধিকারী একথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না।

এই একই কথা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খাটে। আর বিশেষ করে এপার বাঙলার অধিবাসীদের বাংলাদেশের স্বাধীন ও সার্বভৌম ভূমিকা সম্বন্ধে আরও বেশী করে সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে। কারণ এপার বাঙলা ওপার বাঙলার মধ্যে স্বভাবতই যতটা পারস্পরিক দরদ, প্রয়োজনে তা ততটাই বিরূপতাতে পরিণত হতে পারে। আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে যখন শত্রুতা হয় তখন তা অনাত্মীয়ের শত্রুতার তুলনায় ভীষণতর হয়ে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে দুই বাঙলার সংযুক্তির প্রশ্ন কোন বাঙলারই যুক্তিশীল মানুষের সামনে নেই। বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে তার ভাগ্য গঠন করবে এবং পশ্চিমবাঙলার কল্যাণ নিহিত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাজ্য, ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য হিসাবে।

কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হলেও দুই বাঙলার মধ্যে সংস্কৃতি-সাহিত্য ও মনের লেন-দেনের অবকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে—এমন আশা পোষণ করার সঙ্গত কারণ আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা একভাষাভাষী রাষ্ট্র হলেও স্বতন্ত্র। এর আরও কাছের উদাহরণ অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। ইউরোপেও জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান ভাষাভাষীরা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু তার জন্য সংস্কৃতি ও মানসিকতার জগতে তাঁদের আত্মীয়তাবন্ধন ছিন্ন হয়নি। ইংরেজ আমলের পূর্বেও বঙ্গদেশ বলতে আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে যে ভাবমূর্তি ভেসে ওঠে, তা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কাঠামোর অধীন ছিল না। সুতরাং বাঙালী দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিবাসী হলেও তাদের হৃদয় বিচ্ছিন্ন থাকবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ঃ আজ এবং আগামীকাল

সমাজ আর জনতার ভীড় যে এক নয় একথা খুব একটা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। রেলস্টেশন, খেলার মাঠ অথবা হাটে-বাজারের ভীড় কিন্তু সমাজ নয়। কারণ সম উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে জৈব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করা বা সংবেদনশীলতা সহকারে চলাফেরার স্থিতি সেখানে নেই। বড় জনসভায় অথবা রেলস্টেশনে মানুষ একটা সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত সমবেত হয়—কিন্তু উপস্থিত মানুষরা পরস্পরের সঙ্গে জৈব বন্ধনে আবদ্ধ নন এবং পারস্পরিক কার্য-কলাপের দ্বারাও যুক্ত নন। কিন্তু কোন ধর্মীয় সমাবেশে অথবা ধর্মগুরুকে কেন্দ্র করে যে জনসমাবেশ হয় গুরুভাইদের মধ্যে সেখানে একটা আত্মিক সম্বন্ধ থাকে। সম্মেলনের বাইরেও যা ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজেকর্মে প্রতিফলিত হয়, তাই এই জাতীয় সমাবেশের একটা সামাজিক ভূমিকা থাকে।

সমাজ ও জনতার ভীড়ের পার্থক্য এই সামান্য ধারণা মনশ্চক্ষুর সামনে থাকলে আজকের "সমাজে"র স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হবে। কলকাতা শহরের কথাই যদি ধরি তবে দেখব যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে বেরোন মাত্র আমরা সবাই যেন সবার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিভাবে আর সবাইকে কনুই-এর গুঁতোয় সরিয়ে দিয়ে অথবা পায়ের চাপে পিষ্ট করে আমি বাস-ট্রামে উঠে গন্তব্য-স্থলে যাব, অথবা চাল-চিনির লাইনে এবং এমনকি বাজারে মাছ-তরকারী কেনার সময়ে আর সকলকে এড়িয়ে আমি আগে অথবা সস্তা দামে কিংবা তাজা জিনিসটি পাব—এ মানসিকতা অল্পবিস্তর আমাদের সবার মনেই থাকে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করা নিরর্থক। অফিস বা কারখানার পলিটিকস্—এখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কুল-কলেজের অধ্যাপকবর্গ অথবা হাসপাতালের চিকিৎসকবর্গও এই পলিটিকসের আওতার বাইরে নন। অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্ব বিশেষ নেই।

আমাদের মত নাগরিক মানুষদের সমস্ত দিনের বড় একটা সময় বাড়ির বাইরে কাটাতে হয়। তাই বাসস্থানকে কেন্দ্র করে যে পাড়া ও তার "সমাজ"

—তাও হৃতগৌরব ও ক্ষীণবল। বছর চল্লিশ পূর্বেও কলকাতায় শ্যামবাজার, বাগবাজার, কালীঘাট, ভবানীপুর অথবা তার উপকণ্ঠে বেহালা বা ঠাকুরপুকুরে যে সমাজ ছিল তা আজ অদৃশ্য। একদিকে কলকারখানার সম্প্রসারণের ফলে মানসিক দিক থেকে ছিন্নমূল বাইরের মানুষেরা এসব এলাকায় এসেছেন, এখনও যাঁদের মনের শিকড় নিজ নিজ এলাকায় ঢুকতে পারেনি। অন্যদিকে বঙ্গবিভাগ জনিত রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে আর এক শ্রেণীর ছিন্নমূল মানুষ এসেছেন ওপার বাঙলা থেকে "এদেশী মানুষদের" সঙ্গে যাঁদের মানসিক ব্যবধান এখনও রয়ে গেছে। ফলে কি শহর কলকাতা অথবা তার উপকণ্ঠ আর কি আসানসোল, দুর্গাপুর, খড়্গপুর অথবা শিলিগুড়ির মত কলকারখানা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শহর—সমাজ আজ কোথাও নেই। সেই কারণেই নেই সমাজপতি অথবা সামাজিক শাসন।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থাও খুব একটা ভরসাজনক নয়। যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙে গেছে বললেই চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের একটা বড় অংশ কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, খড়্গপুর, শিলিগুড়ি শহরগুলির মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত। এর আশে-পাশের বড় একটা এলাকা থেকে যেসব মানুষ অন্নসংস্থানের জন্য এই শহরগুলিতে আসেন, এখানকার মানসিকতা বহুলাংশে তাঁরা বহন করে নিয়ে যান নিজেদের গ্রামে। আমাদের প্রাচীন গ্রাম-বাংলার কৃষি-কেন্দ্রিক সমাজে পরিবারের কর্তার জীবনের শেষ দিন অবধি জীবিকার সাধন জমির মালিকানা থাকত তাঁর নামে। পরিবারে আর সবার আর্থিক স্বাতন্ত্র্য না থাকায় বাধ্যতামূলকভাবে একটা পারিবারিক আনুগত্য থাকত পরিবারের সব সদস্যদের মধ্যে এবং পরিবারের কর্তারা চণ্ডীমণ্ডপ অথবা ঐ জাতীয় সাধারণ মিলনের স্থানকে (একালের ক্লাব) কেন্দ্র করে সামাজিক সংহতি ও শাসন বজায় রাখতেন। আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের হাওয়ায় সে সংহতি ও শাসন আজ একরকম শিথিল। এছাড়া রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধিকারের ভাবনাও গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়েছে স্বাধীনতার পর। এর ফলে জমির মালিক ও ভাগচাষী বা ভূমিহীন মজুরের সম্পর্কও অনেক বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়ে উঠেছে। ভাগচাষী ও ভূমিহীন কৃষিমজুরেরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এখন দুর্বল পক্ষ হিসাবে থাকতে বাধ্য হলেও তাঁদের অনেকেই মনে মনে অন্ততঃ নিজেদের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ যে জমির মালিক সম্প্রদায় একথা বুঝে তাঁদের প্রতি মানসিকতাতেও প্রয়োজনীয় রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এবং একে যদি শ্রেণী-

সংগ্রামের মানসিকতা বলা হয়, তবে এই মানসিকতা আরও সংগ্রামশীল হবে। বলাবাহুল্য সংগ্রাম বা যুদ্ধের মানসিকতা সমাজ গঠনের অনুকূল নয়—যার মূল ভিত্তি হল সহযোগিতা।

॥ ২ ॥

তাহলে এই সংক্রান্তিকালে "সমাজের" স্বরূপই বা কি আর "সমাজপতিই" বা কারা ?

আজকের সমাজ মরুভূমির বালুকণার মত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর অসম্পৃক্ত মানুষের সমষ্টি। এখানে পথের পাশে নিরন্ন মানুষ তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে পরলোকে যেতে উদ্যত হলেও দেখার কেউ নেই, কোন দুর্ঘটনায় কেউ আহত হয়ে মরণোন্মুখ হলেও কর্মস্থল অভিমুখে স্রোতের মত ধাবিত নর-নারীপ্রবাহের গতি কদাচিৎ রুদ্ধ হয়, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী নিয়ে মজুতদারী ও মুনাফাবাজী লেগেই আছে। খাদ্যবস্তুতে ভেজাল দিতে হাত কাঁপে না—এমনকি রোগীর ওষুধ ও শিশুখাদ্যেও বাড়তি পয়সা রোজগারের জন্য ভেজাল দেওয়া হয়। আরও আধুনিক সমাজে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিকেরা এইসব ভেজাল দেবার প্রক্রিয়া আবিষ্কারে নিজেদের প্রতিভা নিয়োগ করেন অথবা আরও অধিক সংখ্যক নর-নারী-শিশুকে আরও তাড়াতাড়ি, স্বল্পব্যয়ে ও সুচারুরূপে হত্যা করার মারণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য দিবারাত্র তাঁদের ডাকিনীতন্ত্রের সাধনা চালিয়ে যান। ইউরোপ, আমেরিকার সেইসব আধুনিক সমাজে—যেখানে ভোগের উপকরণের অভাব নেই বললেই চলে—দিনের পর দিন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একান্তে চোখের জল মুছে মুখে লোকদেখানো পাণ্ডুর হাসি ফুটিয়ে তোলেন। কারণ বছরের পর বছর তাঁদের ছেলেমেয়ে বা অপর কোন আপনজন তাঁদের দেখতেও আসে না।

আর সমাজপতি ? এ যে কারা তার জবাব দেবার প্রয়োজন হবে না। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা নিজের চারপাশে তাকালেই নজরে পড়বে। পাড়ার ছেলে নামে এঁরা রোয়াক, সামনের চায়ের দোকান অথবা মোড় আলোকিত করে যে-কোন একটা সর্বজনীন পূজা অথবা আর কোন অজুহাতে চাঁদার রসিদ বই হাতে নিয়ে সংসার চালাতে উদয়াস্ত নাকের জলে চোখের জলে একাকার গৃহকর্তা অথবা গৃহিণীর দরজায় বারো মাসই হাজির। এবং কত "চাঁদা" দিতে

হবে তাও এঁরা আদেশ করে দেবেন ও এ নিয়ে—যাঁর পকেট থেকে এটা যাবে—তিনি যদি বিশেষ বাক্যব্যয় করেন, তাহলে শুধু তাঁরই নয়—তাঁর গোষ্ঠী-গোত্রের কপালে বিশেষ দুঃখ আছে। অতঃপর সেই চাঁদার টাকার কতটুকু দেবতা পান আর কতটুকুই বা তাঁর "ভক্তদের" পঞ্চ না হলেও অন্ততঃ দ্বিবিধ "ম"-কার সাধনার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়—তা কেবল সেই দেবতাই জানেন। চাঁদা যাঁরা যাঁরা দেবেন তাঁরা অন্তত জানেন না! ইদানিং পাড়ায় কোন বাদ-বিসংবাদ হলে এঁরাই তার বিচারক, ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষ উভয়ই এঁদের "ফি" দিতে বাধ্য। ডান-বাম নির্বিশেষে রাজনৈতিক দাদাদের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য হয়ে এঁরা আরও মানমর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কারা ক্ষমতাসীন বুঝে এঁরা মাঝে মাঝে দল বদল করলেও মূলত নিমকহারাম নন। যখনই যে দলের অনুগামী থাকলে পুলিশ ও প্রশাসনযন্ত্রের আড়াল পাওয়া যায় একান্ত অনুগতের মত সেই দলের হয়ে ভোটারদের সামনে ছুরি বা পাইপগান নাচিয়ে ভোট দিতে "অনুরোধ" করে আসেন, তেমন বুঝলে অবোধ ভোটার অথবা পোলিং অফিসারদের "নিরাপত্তার" জন্য তাঁদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের সদ্গতি করেন।

নূতন যুগে যে "সমাজ" গড়ে উঠেছে, তাকে সমাজের বদলে বরং guild বা association নামে আখ্যা দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত। এটা প্রধানত পেশাভিত্তিক। সমাজের প্রধান একটা বনিয়াদ—একটা নির্দিষ্ট এলাকা অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠী বা উপগোষ্ঠীর মধ্যে এর কর্তৃত্ব চলে না। নাগরিক মানুষদের জীবনের বড় একটা অংশই বাড়ি অথবা নিবাসের এলাকার বাইরে কাটাতে হয় বলেই বোধহয় পেশাগত এইসব guild-এর শক্তিবৃদ্ধি। কল-কারখানার অথবা অফিস-আদালতের শ্রমিক সংঘ অথবা ক্লাব-অ্যাসোসিয়েশন এই পর্যায়ে পড়ে। ক্যালকাটা বা রোটারী কিংবা লায়ন্স অথবা ঐ জাতীয় সম্পন্ন মানুষদের ক্লাব থেকে শুরু করে অফিসের নাটক অথবা সাহিত্যচর্চার সমিতিগুলিও মোটামুটি এই জাতীয় সমান সাংস্কৃতিক স্তর ও আর্থিক আয়-বিশিষ্ট মানুষের মিলনভূমি।

অপর এক ধরণের সামাজিক সংগঠনও আজকের পশ্চিমবঙ্গে প্রবল এবং তা হ'ল রাজনৈতিক মতাদর্শভিত্তিক পার্টি বা দল। অবশ্য উপরের দিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্থক্যের পিছনে অংশত ভিন্ন ভিন্ন দর্শন থাকলেও নিচের দিকের পার্থক্য প্রধানত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিগত সুবিধাভিত্তিক।

তবে রাজনৈতিক মতভেদের কারণ বিশ্লেষণ আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে না।

ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্যই আছে। নইলে ভদ্রলোকেরা এখনও মোটামুটি বেঁচে আছেন বা চলাফেরা করছেন কিভাবে? তবে তাঁরা নেহাৎই ব্যতিক্রম। সমাজ-মানসিকতার বৃহত্তম অংশের গতি অসামাজিকতার দিকে। পাড়ার শিক্ষিত সচ্চরিত্র নিরপেক্ষ বা আদর্শবাদী মানুষের হাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের নৈতিক নেতৃত্ব নেই। মেকি মুদ্রার প্রবল-প্রাবল্য খাঁটি মুদ্রাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে দিচ্ছে।

॥ ৩ ॥

উপরের আলোচনা থেকে একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে আজকের পশ্চিমবঙ্গে যা চাই তা হল উদার মানবতাভিত্তিক এক সমাজ-ব্যবস্থা। কিন্তু একথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচক বলে উঠবেন যে, চাই বললেই কি পাওয়া যায় অথবা এ যে সোনার হরিণ চাওয়ার মত ব্যাপার।

সমালোচকের বক্তব্য মিথ্যা নয়। একদিকে পুঁজিবাদ এবং অপরদিকে মানবীয় সংবেদনাহীন কেবল অর্থসর্বস্ব অপসংস্কৃতির সাঁড়াশী আক্রমণে ভারত ও বিশ্বের অনেক দেশের সমাজের মতই পশ্চিমবঙ্গের সমাজব্যবস্থার বর্তমানে যে হাল তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ কথা নয়। দ্বিবিধ পেষণের এই জাঁতাকল থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে উদার মানবিক সম্বন্ধ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এক দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের ব্যাপার। এবং বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে এই সংগ্রাম-পদ্ধতির বিশদ আলোচনা করা সম্ভবপরও নয় (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখকের 'সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ' দ্রষ্টব্য।)

দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম-পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে ইঙ্গিতস্বরূপ কেবল এইটুকু বলা হবে যে মানুষের সম্বন্ধের একটা বড় নিরূপক হল ভোগ্য উপকরণসমূহের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে মানবীয় এবং অর্থপূর্ণ করতে হলে তাই উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার বর্তমান অতিবৃহৎ ও সেই কারণে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি পরিহার করে এদের সাধারণ মানুষ ও তাদের স্বয়ং পরিচালিত

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বুদ্ধি ও পরিচালনাব্যবস্থার আয়ত্তাধীন করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ চাই, যাতে তা সাধারণ মানুষের আয়ত্তে আসতে পারে। যাতে তার পদে পদে মানবিকতার স্পর্শ লাগতে পারে।

বর্তমান সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ যে বিপুল ভোগের অযৌক্তিক সুযোগ পায় এর জন্য তা ছাড়তে হতে পারে। কিন্তু সকলের বেঁচে থাকার উপযুক্ত মোটামুটি উপকরণ পাওয়া এবং এই পদ্ধতিতে পরস্পরের মধ্যে যে জীবন্ত মানবীয় সম্পর্ক গড়ে উঠবে, তার ফলে পূর্বোক্ত লোকসান পুষিয়ে যাবে।

কিন্তু এ তো গেল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—ইউটোপিয়াতে পৌছানোর পর যা হতে পারে। হয়ত বা আমাদের এল-ডোরাডোতে যাবার পথে দুই-এক তাল সোনা পাবার মত ব্যাপারও ঘটতে পারে। অর্থাৎ অন্তিম লক্ষ্যে অগ্রসর হবার পথে একটু একটু করে কোন কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে। তবে তার চেয়েও বড় কথা এখনই এই মুহূর্তে আমরা কি করি তাই। কারণ বর্তমানের উপরই ভবিষ্যতের ভিত্তি।

আজকের পরিবর্তনকামীদের একথা বলে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না যে ইউটোপিয়াতে পৌছালে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং তাই এখন যেন-তেন-প্রকারেণ দাদাদের নির্দেশিত পথে সেইদিকে অন্ধগতিতে দৌড়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। অথবা হতাশার এই কান্নাকটি চলবে না, যে বর্তমান অবস্থায় নূতন মূল্যবোধের অনুশীলন হতেই পারে না। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে ইউটোপিয়াতে কোনদিনই পৌছানো যায় না, তার দিকে যতটুকু এগোনো যায়, ততটুকু নগদ প্রাপ্তি। শাস্ত্রকারেরা তাই বলেন, "চরৈবেতি, চরৈবেতি"। আমাদের ভুললে চলবে না যে কংসের কারাগারে কৃষ্ণের জন্ম এবং কংসের প্রবল প্রতাপের মধ্যেই গোকুলে তাঁর বৃদ্ধি। পুরাণকে যদি আধুনিক পরিভাষায় ব্যক্ত করতে হয় তাহলে বলা যায় যে জার্মানী ও ইংলণ্ডে পুঁজিবাদের জঠরেই মার্কসের বিকাশ, জারের স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেই লেনিন ও স্ট্যালিনের আবির্ভাব, দেশী-বিদেশী শোষণের মধ্যে মাও-সে-তুং-এর আত্মপ্রকাশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের শ্বেতাঙ্গদের মেরুদণ্ডভঙ্গকারী শাসনের মধ্যেই মুক্তিকামী মানবাত্মার শাশ্বত নিদর্শন গান্ধীর উদয়।

আমাদের অর্থাৎ যারা মানবীয় ধরণের সমাজের নব-রূপায়ণ চাই, তাদের তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে এইখানে এখনই কর্মে প্রবৃত্ত হতে

হবে। কোন লোভ বা ভয় যেন আমাদের পথভ্রান্ত করতে না পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি চিন্তায় ও কর্মে আমরা যেন আমাদের অন্তিম লক্ষ্যের প্রতিফলন করতে পারি। প্রতি মুহূর্তে ঘোষিত আদর্শের মানদণ্ডে নিজের চিন্ত-ভাবনা ও আচরণকে বাজিয়ে নেওয়া দুরূহ সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের মত মহৎ আদর্শের কোন শর্টকাট নেই।

বাঙালীর সংস্কৃতি—ভিন্ন দৃষ্টিতে

"ইঁহারা অত্যন্ত ছুঁৎমার্গগামী, ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালসার এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন এই আশঙ্কায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন। এইসব বিদ্যার্থীদের মুখে পান,…বাবরী চুল স্কন্ধে লম্বিত…। ইঁহারা ধীরে ধীরে পথ চলে, থাকিয়া থাকিয়া দর্পিত মাথাটি এদিকে ওদিকে দোলায়; হাঁটিবার সময়ে ইঁহাদের ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্ মচ্ শব্দ হয়, মাঝে মাঝে নিজেদের সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটির দিকে তাকাইয়া দেখে। তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্য ভিক্ষুক ও অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহাদের তোষামোদ করিয়া গান ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণ বর্ণ ও শ্বেত দন্তপঙ্ক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বাঁদরটি।…স্বল্প মাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠেন, সাধারণ একটু কলহে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজ সহ-আবাসিকের পেট চিরিয়া দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কম দাম দিয়া বেশী জিনিস দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন।"

"তাদের (বৈষ্ণব সহজিয়াদের) ধর্মীয় আচারের একটি বিশেষ দিক পরকীয়া সাধনা অর্থাৎ প্রচলিত ভাষায় যাকে ব্যভিচার বলে। সুরুচি বিসর্জন না দিয়ে এ আচার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যায় না।….নিজের স্ত্রী নয় এমন নারীর সঙ্গে প্রেম যে শ্রেয়তর একথা এদেশে প্রমাণিত হয়েছিল। এবং এরপর ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কর্তাভজার মত অসংখ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মতের সমর্থক ছিল ও কিশোরী ভজনের (নাবালিকাদের সঙ্গে অবাধ সম্ভোগ) মত অনেক প্রথার প্রবর্তন বঙ্গদেশে হয়েছিল। সুরুচির খাতিরে সেসব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।"

"….এ বিকার কেবল সহজিয়া বা বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই সব জঘন্য প্রথা তন্ত্রানুসারী ধর্মাচরণের মধ্যে চরমে পৌঁছালেও এর প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিকার দেখা দিয়েছিল। দেবী দুর্গার মনোরঞ্জন হবে—এই কারণে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে দুর্গা পূজার সময় নর-নারীর অঙ্গের নাম-সূচক অভব্য শব্দ উচ্চারণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। কালবিবেক কাম উৎসবের সময়

অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করার নির্দেশ দেয়। দুর্গাপূজার বিবরণ দেবার সময় এই গ্রন্থে নর-নারীদের এমন সব কৌতুক ক্রীড়া ও শব্দোচ্চারণের সুপারিশ করে—বর্তমানে যা আমরা অনুচ্চারণীয় বলে মনে করি। কিন্তু কালবিবেকের মতে দেবী দুর্গার প্রীত্যর্থে এসব বাঞ্ছনীয়। গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যৌনসম্ভোগের নগ্ন চিত্রায়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালের বহু পদাবলীতে এর অনুকরণ করা হয়েছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করেই একথা বলা চলে যে বর্তমান সমাজে যেসব সামাজিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রস্থ অশ্লীলতা দুষ্ট ও আইন অনুসারে দণ্ডার্হ, মধ্যযুগে সেসব ধর্মের ক্ষীণ আবরণের অন্তরালে আচরণ করা হত এবং তাদের আপত্তিকর বিবেচনা করা হত না।"

"সমস্ত দিনের পূজা শেষ হয়ে যাবার পর একদল বাইজী দেবী বিগ্রহের সামনে নৃত্য গীত আরম্ভ করে। তাদের পরিধেয় বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে তা আদৌ দেহের আবরণ নয়। যে গান তারা গায় তা অশ্লীল এবং নাচের মুদ্রা ও অঙ্গভঙ্গীও স্থূল। ঐসব নাচ-গানের কথা বর্ণনা করার অনুপযুক্ত। কিন্তু দর্শকেরা এটা বেশ উপভোগ করেন এবং আদৌ বিব্রত বোধ করেন না।"

॥ ২ ॥

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত চারটি উদ্ধৃতিই বর্তমানের বাঙালী সমাজের এক একটি দিকের পরিচায়ক মনে হলেও আসলে কিন্তু এগুলি এক একটি যুগের নিদর্শন।

প্রথমটির কাল দশম ও একাদশ শতাব্দী। নায়ক গৌড় বা বঙ্গদেশীয় ছাত্র-সমাজ, ঘটনাস্থল সুদূর কাশ্মীর। বাঙালী ছাত্রদের প্রথমোক্ত বর্ণনার লিপিকার কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র। 'দশকুমার চরিত' গ্রন্থ থেকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্বে'র ৫৫১-৫৫২ পৃষ্ঠায় বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন। বর্জিত অংশে বাঙালী ছাত্রদের পোশাক, হস্তধৃত ছত্র ও নখ রঞ্জিত করা এবং নারীসুলভ প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহারের মনোরঞ্জক বর্ণনা ছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ধৃতিটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বর্ণনা। উৎস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের History of Mediaeval Bengal, পৃষ্ঠা ২০৬-২০৭।

চতুর্থ উদ্ধৃতিতে বর্ণিত বিবরণের কাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। ঘটনাস্থল সেকালের কলকাতার এক বিশিষ্ট বাঙালী রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ি। এর সাক্ষী জনৈক বিদেশী লেখক। উদ্ধৃতি দিয়েছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২২১ পৃষ্ঠায়।

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবু কালচারের আরও অনেক দিকের বর্ণনা পাওয়া যায় 'হুতোম প্যাচার নক্সা,' "হিকি সাহেবের গেজেট" এবং আরও নানা গ্রন্থে। ঐ বাবু কালচারের মোদ্দা কথা হল—মদ, বারনারী, পায়রা ওড়ানো থেকে শুরু করে বিড়ালের বিয়ে পর্যন্ত নানা বাতিকের পিছনে টাকার শ্রাদ্ধ, পূজা ও বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের নামে অর্থের কুৎসিত প্রদর্শন ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বাবুদের ঐসব খেয়াল মেটাবার জন্য অর্থ জুগিয়েছেন অভুক্ত ও নগ্ন থেকে বাংলার সাধারণ চাষী—বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত।

আর সাহিত্য যদি সমকালীন সমাজের দর্পণ হয়, তবে 'চণ্ডীমঙ্গল' থেকে শুরু করে 'অন্নদামঙ্গল' পর্যন্ত নানা মঙ্গলকাব্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং বিশেষ করে 'চৈতন্য ভাগবত' ও 'চৈতন্য চরিতামৃত' এবং ধোয়ীর 'পবনদূতে' মধ্যযুগের বাঙালীর সমাজচিত্রের প্রভূত বর্ণনা পাওয়া যায় যা তার সাংস্কৃতিক পরিচয় পেতে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য করে।

এইসব সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে তদানীন্তন বাঙালীর সাংস্কৃতিক যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে আজকের সমাজ-জীবনের খুব একটা পার্থক্য নেই। পূজাপার্বণের নাম করে অর্থের স্থূল প্রদর্শন, নানা খেয়ালে গরীবকে বঞ্চিত করা টাকা ওড়ানো, সুরার স্রোত ও যৌনসম্ভোগের প্রাবল্য, অসহায়ের প্রতি অত্যাচার পঠন-পাঠনে অনীহা, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজপুরুষদের দুর্নীতি ইত্যাদি আজকের সমাজ ও সংস্কৃতি-জীবনের যেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের পীড়িত করে, অতীতেও তা ছিল। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি সেই দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে।

॥ ৩ ॥

জানি, সংস্কৃতি-অভিমানী বাঙালী পূর্বোক্ত মন্তব্যে আহত হবেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—তাহলে শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে রামমোহন, এবং রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর ও সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী সমাজে ব্যাখ্যা করা হবে কিভাবে ?

এঁরা এবং এঁদের মত বিরল সংখ্যক মনীষী বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির সামান্য পরিচয় নন, এঁরা ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম না হলে চৈতন্যের তিরোধানের অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই জীববিশেষের পুচ্ছের মত বাঙালী সমাজ স্থূলত্বের পঙ্ক গায়ে মাখত না।

রামমোহন এবং রামকৃষ্ণদেব দ্বারা প্রভাবিত হলেও, বিবেকানন্দ পশ্চিমের উদার মানবতাবাদের ফসল—ইংরেজদের শাসনের ফলে যার সঙ্গে ভারতের পরিচয় ঘটেছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঙালীর "কাকের বাসায় কোকিলের ছানা"—একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন, সৌন্দর্যতত্ত্ব অথবা পল্লীসেবা ইত্যাদিকে বৃহত্তর বাঙালী সমাজ কোন দিনই নেয়নি। নিয়েছে তাঁর সহজ সুরের গানগুলিকে (এবং পূজা, স্বদেশ অধ্যায়ের গভীর ব্যঞ্জনামূলক গানগুলির অর্থ না বুঝেই)—বিশেষত প্রেম পর্যায়ের গানগুলিকে ও তাঁর কয়েকটি নৃত্যনাট্যকে একেবারে কোমরভাঙা কান্তরূপে রূপায়িত করে। রবীন্দ্রনাথ একক—ঘটনাচক্রে তিনি বাঙলাদেশে জন্মেছিলেন। আসাম, কেরল, অথবা কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি রবীন্দ্রনাথই হতেন।

পূর্বোক্ত দুই দশজন ব্যতিক্রম স্বরূপ "বাঙালী"র কথা বাদ দিলে সাধারণ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর প্রতীক হল ভাঁড়ু দত্ত, ভবানন্দ অথবা মীরজাফর, রায়-দুর্লভের দল। "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান"—এ কেবল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কিছু ভ্রান্তবুদ্ধি আদর্শবাদী বাঙালী তরুণের কথা নয়। এ হল সেন বংশের শেষ যুগের কিছু পথভ্রান্ত আদর্শবাদী বাঙালী যুবকের গৌড়ের সীমান্তের ওপার থেকে বাঙালীর কল্যাণের জন্য তুর্কীদের আমন্ত্রণ করে আনার পরিকল্পনার উত্তরাধিকার।

আজকের বাঙলা সাহিত্যে যে উদ্দাম যৌনবাদের প্রাবল্য, ক্যাবারে ছাড়া যে নাটক ও যাত্রানুষ্ঠান হয় না, চলচ্চিত্রকে "এ" মার্কা করে দর্শক টানার মানসিকতা, তার জন্য কেবল পশ্চিমের প্রভাবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এর মূল বাঙলা ও বাঙালীর অতীত ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিতে। "পাড়ার ছেলে" এই সস্নেহ প্রশ্রয়ের অভিধার পিছনে আসলে মস্তানরা যে সমাজপতি এবং যখন

যারাই গদিতে আসীন হোক না কেন তাদের ক্ষমতার উৎস ঐ মস্তান সম্প্রদায় এবং তাদের রসদ জোগাতে হয় সাধারণ মানুষকে "চাঁদা" নামে কথিত বস্তুত জিজিয়া করের দ্বারা, আর সব জেনেশুনেও আইন-শৃঙ্খলার রক্ষাকারীরা এঁদের লাখ-দুলাখ টাকার "পূজা"র উদ্বোধনে প্রধান অতিথি অথবা অপর কোন পদ অলঙ্কৃত করে এঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন—এরও পিছনে রয়েছে অতীতের বাঙালী মানসিকতার ইতিহাস। প্রশাসনে উৎকোচের প্রাবল্য, দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের নারী ও সুরা উপঢৌকন দিয়ে ইচ্ছা মত কাজ করিয়ে নেওয়া যায় এই অবস্থার সঙ্গে সেন রাজা, নবাবী আমল বা ইংরেজ রাজত্বের কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতিতে "ভেঙে দাও" "গুঁড়িয়ে দাও" ও "মুণ্ডু চাই" জাতীয় রক্তপিপাসু জিগির এবং খুনোখুনি প্রাচীন বাঙলার মাৎসন্যায়ের আধুনিক রূপ। আর সর্বোপরি এসব দেখেও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মৌনী বাবা সেজে থাকা, এর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে এ প্রথা চলতে দেওয়া—বাঙালীর সেই সনাতন "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"—নীতির পরিচায়ক। এর সঙ্গে যদি যুক্ত হয় মানব-চরিত্রের অন্ধকার দিককে প্ররোচনাদানকারী বিদেশাগত কোন আধুনিক মতবাদ বা ফ্যাশান, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। বাস্তবে এই হল আজকের বাঙালীসমাজের পরিপ্রেক্ষিত এবং সংস্কৃতির পটভূমিকা।

॥ ৪ ॥

আসলে সংস্কৃতিকে বোধহয় কোন ভৌগোলিক বা কালিক গণ্ডীর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। আমরা যে বাঙালী সংস্কৃতির জন্য সঙ্গতভাবেই গর্ব করি তার মূল হল একটা উদার মানবিকতাবাদ। এটাই হল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার রেনেসাঁসের ভিত্তি, ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ও জীবনের উপর পাশ্চাত্ত্য, আধুনিক অথবা বৈজ্ঞানিক—যে নামই দিই না কেন—সেই উদার মানবিকতাবাদের অভিঘাতের ফসল। এই সংস্কৃতি যে মূল্যবোধের প্রতীক তাকে বিশ্বজনীন বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

তবে এ সংস্কৃতি সমগ্র বাঙালী-সমাজকে এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। বড় বেশী হলে শ্রেণীগতভাবে মধ্যবিত্ত সমাজকে এবং ব্যক্তিগতভাবে উচ্চবিত্ত বা নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন বাঙালীকে প্রভাবিত করেছে। নচেৎ

রবীন্দ্রনাথ-বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের রচনার পাশাপাশি দেহবাদী গল্প-উপন্যাসের চাহিদা দেখা যেত না, রবীন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-নজরুল গীতির সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই মার্কা ফিল্মী গানার এত সমঝদার চোখে পড়ত না। উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়েও বলা যায় যে চলচ্চিত্র, নাটক ও রাজনীতি প্রভৃতি সমাজ-জীবন ও সংস্কৃতির অপরাপর ক্ষেত্রেও পাশাপাশি এজাতীয় সূক্ষ্ম ও স্থূল, আধুনিক ও প্রাকৃত মানসিকতার পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন আজকের বাঙলা ও বাঙালীদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর।

অবশ্য এর জন্য বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হবারও কিছু নেই। সংস্কৃতির বিবর্তন এই ভাবেই হয়। সংস্কৃতির আধার হল মনোভূমি। মনের সম্যক কর্ষণের ফল সংস্কৃতি। ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির যে কথা বলেন, সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। লালন ফকিরের বক্তব্য—"আমার সাঁই যে ফুল ফোটাতে চান, তার জন্য ফুলে জল দিতে হয়। ফুল তাড়াতাড়ি ফোটে না বলে কি তাকে তলোয়ারের ঘা দিলে ফুটবে ?" কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো যায় কিন্তু চিৎপ্রকর্ষমূলক সংস্কৃতির ফুল ফোটানো সম্ভব হয় না।

আর একটি কথা, সংস্কৃতি খণ্ড জীবনের আরাধ্য নয়—সমগ্র জীবনের সাধনা। এ এক নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণাঙ্গ মানসিকতার প্রতিফলন। জীবনের প্রতিটি কর্মে প্রতিটি মুহূর্তে যার প্রকাশ। সমস্ত দিন চোরাকরবারে লিপ্ত থাকার পর সন্ধ্যায় গীতাপাঠ করলে ধর্ম হয় না। রাজনীতিতে খুনোখুনির প্রশ্রয় দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে দুই চার ঘণ্টা কাটালে সংস্কৃতির চর্চা হয় না। জবরদস্তি করে আদায় করা টাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় না। বাসে-ট্রামে সহযাত্রী অথবা কণ্ডাক্টারের সঙ্গে সামান্য কারণে বচসা করে আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের হলে ছবির প্রদর্শনীতে ঘুরলে চিত্তের প্রসারতালাভ হয় না। চোখের সামনে অনুষ্ঠিত জলজ্যান্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার ঝুঁকি এড়িয়ে সভা-সমিতিতে এ সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে অথবা মোটা মোটা কেতাব লিখে সংস্কৃতিপ্রেমীর কর্তব্য নিষ্পন্ন হয় না। জীবনের মতই সংস্কৃতি এক এবং অবিভাজ্য, অদ্বৈত এর সাধনা।

পশ্চিমবঙ্গ—কোন্ পথে ?

স্বাধীনতার সাতাশ বছর আর পরিকল্পনার বাইশ বছর পরও পশ্চিমবঙ্গবাসীর এই হা ভাত জো ভাত অবস্থা! সক্ষোভে ভদ্রলোক কথাটা বললেন। কোন বিরোধী দলের নেতা নন তিনি অথবা হতাশাবাদীও নন। এ রাজ্যের শাসনযন্ত্রের কর্ণধারদের একজন, অপ্রিয় স্পষ্টবক্তারূপে যাঁর সুনাম বা দুর্নাম যা-ই বলুন না কেন আছে। প্রায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থার সম্মুখীন প্রতিটি পশ্চিম বঙ্গবাসীর মনের কথাই সেদিন সেই ভদ্রলোকের কথায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কেন এমন হল? প্রশাসনযন্ত্রের কর্ণধার, এ রাজ্যের অন্যতম নেতৃস্থানীয়, শাসকদলের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল যুক্ত সেই ভদ্রলোক বলছিলেন, রং প্রায়রিটি বা পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণে ভ্রান্ত অগ্রাধিকারই এর কারণ। কথাটির মধ্যে চিন্তার খোরাক আছে।

পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার কিসের হবে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে পরিকল্পনা কাদের জন্য। আজকের বা যখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত হয় তখনকারও পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতবর্ষের অবস্থার কথা বিবেচনা করলে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় দেশের শতকরা ৪০ জন (এ রাজ্যের ক্ষেত্রে ৭০ জন) দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে অবস্থিত নর-নারীরাই অগ্রাধিকার পাবেন উন্নয়নের। আরও একটু স্পষ্ট করে বললে বলতে হবে যে টেলিভিশন, ইলেকট্রনিকস অথবা শহরাঞ্চলের পাকা রাস্তা অথবা দশ বিশ মহলা বাড়ি দিয়ে আমাদের দেশের উন্নয়নের সাফল্যের পরিমাপ করা হবে না। করা হবে—যুগ যুগ ধরে এই যে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার দুটি অন্ন সংগ্রহ করতে পারছে না, পরনে যাদের কদাচিৎ একখানা নূতন অথবা আস্ত কাপড় মেলে, তাদের খাওয়া পরা এবং তারপর বাসগৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা গেছে কিনা ও কতটা গেছে তার নিরিখে।

টেলিভিশন, ইলেকট্রনিকস, এয়ার-কণ্ডিশনার, সুউচ্চ সৌধমালা অথবা পাকা রাস্তা বা মোটরগাড়ির সার্থকতা আমাদের মত দেশে এই দরিদ্রতম মানুষের কতটা কাজে লাগছে বা লাগতে পারে তার মানদণ্ডে। আর অদূর ভবিষ্যতে এসব যদি তাঁদের কাজে না লাগে তবে বিজ্ঞান বা 'সভ্যতা'র অবদান

যতই চমকপ্রদ হোক না কেন, আমাদের দেশে এসবের প্রবর্তন ও প্রসার আপাতত মুলতুবী থাকতে পারে।

খরা, বন্যা অথবা এই জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেওয়া মাত্র পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের মত যেদেশে উন্নয়নের ক্ষীণ পর্দাটুকু সরে গিয়ে অস্থি-পঞ্জরসার নর-নারীর মিছিল দেখা যায় সেখানে উন্নয়নের অপর কোন অগ্রাধিকার থাকতে পারে না। রূঢ় হলেও এই সত্যের আরও একটু সম্মুখীন হওয়া উচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সব দেশে সব কালে ঘটে থাকে। কিন্তু উন্নত দেশ আমাদের মত এত অল্প ধাক্কাতেই ছিন্নমূল কদলীতরুর মত ধরাশয্যা গ্রহণ করে না। উন্নত দেশে এ জাতীয় দুর্যোগে দেশের কোণ কোণ থেকে সাহায্য আসে এবং অচিরে বিপদাপন্ন নর-নারীরা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হন। আর আমাদের দেশে ? আন্তর্জাতিক সাহায্য পাবার পরও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। অর্থাৎ আমরা প্রায় চোরাবালির ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি এবং প্রথমেই আমি যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি তাঁর ক্ষোভের গভীরতাও হয়ত এই জন্য।

যাই হোক, আজকের মত দৈব দুর্বিপাক দেশে থাকবে, কিন্তু তার প্রতিবিধান কি শুধু রিলিফ ? অথবা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও অর্থব্যবস্থায় স্বাধীনতার প্রায় পর থেকেই যে টি. আর. (টেস্ট রিলিফ) বা জি. আর. (গ্রাটুটাস রিলিফ) স্থায়ী শিকড় গেড়েছে তাই ? গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে এইসব টি. আর. এবং জি. আর.-এর স্থায়ী মূল্য কতটুকু ? এর সঙ্গে সম্পর্কিত রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক দুর্নীতির যে অভিযোগের কথা শোনা যায় তা যদি ছেড়েও দেওয়া যায় তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে এর দ্বারা রিলিফ দেবার প্রয়োজনীয়তা কতটা দূর করা গেছে ? অর্থাৎ রিলিফ মানুষকে সাময়িক সাহায্য দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে ভালো এবং এজাতীয় সাময়িক সহায়তার প্রয়োজনও আছে—বিশেষ করে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সময়। কিন্তু মানুষকে যদি চিরকাল রিলিফ দিতে হয়, তবে বুঝতে হবে রিলিফ ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ। এজাতীয় রিলিফে মানুষকে স্থায়ী ভিক্ষুকে পরিণত করা হয় এবং তার যে সামাজিক ও আর্থিক প্রতিক্রিয়া আছে সে কথা এখানে ধরা হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব থেকে স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর ধরে রিলিফ বাবদ যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, আজকের প্রায়-দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন

হয়ে যদি বলা যায় যে সবটুকুই জলে গেছে তাহলে বোধ হয় সত্যের বড় বেশী অপলাপ হবে না।

এবং এর প্রধান কারণ হল রিলিফের টাকা কদাচিৎ উৎপাদনমূলক কাজে খরচ হয়েছে। মানুষকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগাতে না পারলে স্বয়ংচালিত অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে না এবং দেশের মানুষও উৎপাদন-চক্রের ভাগীদার হয়ে মজবুত অর্থনীতির বনিয়াদ গড়তে পারে না। রিলিফের টাকা শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তিতে গেল অথবা এমন বাঁধ বা রাস্তা হল তার দ্বারা প্রথম বর্ষাতেই যা ভেঙে আবার পূর্বের অবস্থা ফিরে এল—এরকম হলে এ বাবদে ব্যয়িত অর্থের কোন স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম আসে না।

এ তো গেল শুধু রিলিফের বাবদ ব্যয়িত অর্থের কথা। উন্নয়নের অপরাপর খাতে ব্যয়িত অর্থ ই কি উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়েছে? তা যদি হত তবে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০ জন দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে অবস্থিত এইসব মানুষগুলির সামনে মোটা ভাত মোটা কাপড় রোজগার করার উপায় থাকত। তাহলে এবছর খরা আর বন্যা দেখা দেওয়া মাত্র এমনভাবে ফ্যান ভিক্ষা শুরু হত না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল এবং দেশ গড়ার কাজে মশগুল থাকতে ইচ্ছুক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটির এই ক্ষোভ প্রকট হত না।

পরিকল্পনা তৈরী করার দরকার ছিল যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিরা খেয়ে-পরে বাঁচার মত উপার্জন করতে পারে। কারণ রিলিফ দিয়ে কতজনকে বাঁচানো যাবে কত কাল? আর এই রিলিফের টাকা আসবে কোথা থেকে? সবার কর্মসংস্থান করার পরিকল্পনা করে তার রূপায়ণ করার দরকার ছিল। এবং এটা অলস কল্পনাও নয়। জাপান ও জার্মানীর মত যেসব দেশের অর্থনীতি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, ভারতের তুলনায় অনেক অল্প সময়ে তারা এই কার্যসাধন করেছে। তারা বিদেশী সাহায্য পেয়েছে ঠিকই। তা বিদেশী সাহায্য আমরাও কম পাইনি। এই ভারতবর্ষেই পঞ্জাব-হরিয়ানার মত কয়েকটি রাজ্য প্রায় এই আদর্শে উপনীত হয়েছে। সবার কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করে কেবল সরকারী দপ্তরের কর্মীসংখ্যা বাড়িয়ে অনুৎপাদক ব্যয় বাড়ানো অথবা ফ্রিজ, রেডিও, টেলিভিশন কিংবা কলকাতায় বড় বড় বাড়ি করার নামই হল সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি কথিত রং প্রায়রিটি বা ভ্রান্ত অগ্রাধিকার। এমনকি এই শতকরা সত্তরজন ক্ষুধার্ত মানুষের ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার অন্ন

উপার্জনের শিক্ষা না দিয়ে শুধু বই পড়ার কেতাবী শিক্ষা দেবার জন্যও যা খরচ করা হয়েছে তাও অনুৎপাদক ব্যয় এবং সেই কারণে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত অগ্রাধিকারের শুধু অপচয় হয়নি—গত সাতাশ বছরে এই শিক্ষার ফলে একটা অনুৎপাদক প্রজন্ম (generation) তৈরী করে তাদের সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে সমস্যাটাকে আর জটিল করে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশী টাকা ও আমাদের সীমিত সম্পদ একত্র করে অনুৎপাদক পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে আমরা একাধিক দিক দিয়ে মার খেয়েছি। মাত্রাতিরিক্ত টাকা ছড়িয়ে পড়ায় এক দিকে যেমন মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ঋণ বাড়া ছাড়াও আমাদের জাতীয় চরিত্রে ঘুণ ধরেছে। গরীবের হাতে হঠাৎ বেশী টাকা পড়লে তার চরিত্র কদাচিৎ ভালো থাকে। চারিদিকে লাইসেন্স, পারমিট আর কনট্রাক্টের ভেল্কিবাজীতে টাকা উড়ে বেড়িয়েছে এবং স্বভাবতই বিনা মেহনতে বেশী টাকা রোজগারের সর্বনাশা মনোভাব বিশেষ করে স্বলুক সন্ধান শিকারী শিক্ষিত সমাজকে দূষিত করেছে।

ভ্রান্ত অগ্রাধিকার ছেড়ে সঠিক অগ্রাধিকার সহ পরিকল্পনা রচনা ও তার রূপায়ণের প্রথম ধাপ হল সবার কর্মসংস্থান। এবং এই কর্মসংস্থান যদি উৎপাদনমূলক না হয় অর্থাৎ জনসাধারণের ভোগ্য উপকরণ অথবা যন্ত্রপাতির মত ভবিষ্যতে উৎপাদনকার্যে লাগার মত মূলধনী সামগ্রী উৎপাদন করার কাজে অধিকাংশ মানুষকে না লাগানো যায় তবে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য। অনুৎপাদক ব্যবস্থাপক শ্রেণীর কাজ অল্প অল্প থাকতে পারে, তবে তার হার হবে যথাসম্ভব কম এবং একটা জাতীয় বেতন নীতি গ্রহণ করে অনুৎপাদক পেশায় নিযুক্ত মানুষদের মজুরীর হার কম করতে হবে যাতে অধিকাংশ মানুষ উৎপাদক কাজ নিতে আগ্রহী হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি সহ নানা কারণে বিদেশী সাহায্য আর খুব বেশী জুটবে না এবং জুটলেও আত্মসম্মান ও দেশের ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে পারতপক্ষে বিদেশী সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে সবার কর্মসংস্থান করার কথা ভাবতে হলে কৃষি ও কুটিরশিল্পের কথা আসতে বাধ্য। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প যত সম্ভব বাড়ুক, কিন্তু তার দ্বারা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি বেকার ও অর্ধবেকারদের সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং সবার কর্মসংস্থানের জন্য কুটিরশিল্পই ভরসা।

এর মধ্যে কৃষির উন্নতিও একটু দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। পশ্চিমবঙ্গের সেচ ও

সারের অবস্থা খুব ভালো নয়। ধান গম কেন, আলুর মত ফসলের উন্নত বীজও প্রয়োজনীয় পরিমাণে এ রাজ্যে পাওয়া যায় না। পাট-নামে স্বর্ণতন্তু হলেও পাটকল-ফাটকাবাজ-আড়তদার চক্রের জন্য এর চাষী গ্রামবাঙলার কৃষকের কাছে এখনও এ গলায় ফাঁসের মত। এসব সমস্যার সমাধান দুই চার বছরে হবে না। তবে এ সমস্যার মোকাবিলায় শৈথিল্য করলেও চলবে না।

অল্প মূলধনে এবং অবিলম্বে যা পশ্চিমবঙ্গবাসীর উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থান করতে পারে তা হল ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। এর যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তিবিদ্যার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হয় না এবং পুঁজি বিনিয়োগের অত্যল্প কালের মধ্যে উৎপাদন শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বাবদ পুঁজি পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকার ও ব্যাঙ্ক থেকে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সীমিত সম্পদের উপর চাপ না দিয়ে অবিলম্বে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে। প্রয়োজনমত একটু সরকারী সংরক্ষণ পেলে অত্যল্প কালের মধ্যে এই শিল্পগুলি নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে এবং বিশেষ করে গ্রামবাঙলার কোটি কোটি মানুষের হাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ক্রয়শক্তি তুলে দিয়ে আজকের গ্রামাঞ্চলের এই প্রায়-দুর্ভিক্ষ অবস্থার বদলে মোটা ভাত মোটা কাপড় পাবার অবস্থা নিয়ে আসতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণকামীরা কথাটি ভেবে দেখুন।

আফিং

না, সেই আফিং-এর কথা আমার আলোচ্য নয়, যার মাত্রা একটু বেশী চড়ালে কমলাকান্তের মত পাকা নেশাখোরেরও মনে হত যে "মনুষ্যসকল ফল বিশেষ।" অথবা যার মাত্রা চড়িয়ে কমলাকান্তের জ্ঞাননেত্র ফুটত এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সামনে ভবের বাজার সুবিস্তৃত হয়ে উঠত কিংবা যার প্রসাদাৎ সপ্তমী পূজার দিন মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপ ধরে হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি হয়ে উঠতেন। আমার আলোচ্য আফিংকে বরং সপ্তমী পূজার দিন কমলাকান্ত-সেবিত অহিফেনের অ্যান্টিথিসিস বলা যেতে পারে, যার পরিচয় প্রসন্ন গোয়ালিনীর আশ্রিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাত্র একবারই পেয়েছিলেন তাঁর "পলিটিক্স্" শীর্ষক জবানবন্দীতে।

কিন্তু রাজনীতির কথা পরে। প্রথমে আফিং-এর সর্পতে রজ্জুভ্রমকারী (এর বিপরীতটা নয়) প্রভাবের কথা খতিয়ে দেখা যাক।

বন্ধুরা আমাকে বিদূষণকারী অপবাদ দিয়ে অভিযোগ করেন যে, বাঙালীর খেলাধূলাপ্রীতির এত সব জাজ্বল্যমান প্রমাণ সত্ত্বেও আমি তাদের ঘরকুণো বলি। কিন্তু বন্ধুদের কি করে বোঝাই যে যদি বাইশজন বাঙালী মাঠে ফুটবল অথবা ক্রিকেট খেলেন তবে অন্তত বাইশ হাজার দর্শক বেশ কয়েক ঘণ্টা করে সময় এবং টিকিটের জন্য অবিশ্বাস্য রকমের মোটা টাকা ব্যয় করে সেই খেলা কেবল দেখেন। আর খেলার মাঠে যে মারপিট ভাঙচুর এবং এমনকি প্রাণান্তকর ব্যাপারও ঘটে তা তো উপরি পাওনা। মাঝে মাঝে এই মারপিট ও ভাঙচুর পথে ছড়িয়ে পড়ে খেলার ব্যাপারে যাঁদের আদৌ কোন আগ্রহ নেই সেইসব সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। জাতিগতভাবে আফিং চড়িয়ে না থাকলে এমনটা হতে পারত?

আরও আছে। বাইশ হাজার বাঙালী যদি খেলার মাঠে আফিং-এর মৌতাতে থাকেন, তাহলে অন্তত বাইশ লক্ষ ঘরে বসে রেডিও এবং ইদানীং টিভির দৌলতে সেই মৌতাতের মৌজ উপভোগ করেন। জাতির যুবশক্তির সময় ও উদ্যমের এজাতীয় অপচয়ের হিসাব করলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয়। এর জন্য অফিস-কারখানা, স্কুল-কলেজ পালিয়ে এবং এমনকি কর্মস্থলে হাজরিটুকু মাত্র দিয়ে কাজের সময়ে "খেলা শোনা" অথবা দিনের পর দিন তার আলোচনায়

মাতা যে নৈতিকতার কোন্ স্তরের ব্যাপার তার কথাই বা কে ভাবছে? এই পরিমাণ কাজের সময়ের অপচয় রোগগ্রস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে আরও কতটা পীড়িত করছে—সে প্রশ্নেরই বা কে জবাব দেবে?

খেলাধূলা নিশ্চয় ভালো। কিন্তু তাকে অবলম্বন করে এই উন্মত্ততা কি অহিফেন-প্রভাবিত মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়?

অতঃপর কমলাকান্তের "পলিটিক্স্" অর্থাৎ একালের রাজনীতির কথা। এ যুগের ভাষায় প্রলিটারিয়েট সেই ব্রাহ্মণ অনুযোগভরা আক্ষেপ করেছিলেন, "আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক যে আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন? ·· কোথায় আমার এমন স্থূলবুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন··· আফিমের জন্য আমি আপনার খোশামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে···" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাবৎ পলিটিক্সকে কমলাকান্ত সারমেয় ও বলীবর্দ দুই ভাগে বিভক্ত করে তার বৈশিষ্ট্য উদাহরণ সহযোগে উপস্থাপিত করেছিলেন। তবু বাঙালীর রাজনীতি কচ্চায়ন-স্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ছাড়া হ্রাস পায়নি।

কমলাকান্তের সদুপদেশের কথা থাক। সাম্প্রতিক কালে এবং বিশেষ করে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে অদ্যাবধি রাজনীতির নীতিবিহীনতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর মত রাজনীতির অব্‌সেশন অর্থাৎ বাতিক আর কারও মধ্যে দেখা যাবে না। শিক্ষা-দীক্ষা উৎসন্নে যাক, অর্থব্যবস্থা লাটে উঠে পেটের ভাতে টান পড়ুক, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রহৃত হতে হতে কোণঠাসা হতে হোক এবং এমনকি নিজগৃহে পরবাসী হয়ে অস্তিত্বেরই সঙ্কট উপস্থিত হোক—তবু বাঙালী রাজনীতির মত্ততা ছাড়ে না। একথার বড় প্রমাণ বাঙলা সংবাদপত্র। রাজনীতি ও সেই পঙ্ককুণ্ড মর্দন করতে করতে ঘুৎকারকারী বিষ্ণুর এক অবতার জীবের মত ব্যক্তিদের কেচ্ছাকাহিনী আমাদের তাবৎ "জাতীয়" সংবাদপত্রে যেমন প্রাধান্য পায়, মানুষের গঠনধর্মী কাজকর্মের বিবরণ তার এক ভাগও স্থান পায় না। কোনও এক বিখ্যাত ব্যক্তি সংবাদের ভাষ্য প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কুকুর মানুষকে কামড়ালে সংবাদ হয় না, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সংবাদ হয়। অতএব আমাদের সংবাদপত্রগুলি পরমানন্দে মানুষের কুকুরকে-কামড়ানো-রূপী বিকৃতির সংবাদের ভিয়েন বসিয়েছেন।

তা বসান। কিন্তু রাজনীতি বস্তুটি আসলে কি? এ হল আর সবাইকে কনুই-এর গুঁতায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজে গদিটি দখল করা—এই নিন্দাসূচক

সংজ্ঞার্থ না হয় স্বীকার না-ই করলাম। কিন্তু রাজনীতির সেবকরাও স্বীকার করবেন যে এ হচ্ছে জনসাধারণের কল্যাণার্থ রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত ও তার সঞ্চালনের শাস্ত্র। কিন্তু অন্তত ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত ডান বাম মধ্যপন্থী নির্বিশেষে তাবৎ রাজনৈতিক দল ও নেতাদের দেশবাসী পালা করে এ সুযোগ দিয়েছে এবং সবাই সমানভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রামের প্রবক্তারাও হাউই-এর মত জ্বলে উঠেই ফুরিয়ে গেছেন। চোখের সামনে এ উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও রাজনীতি নিয়ে এত মাতামাতি করার যুক্তি কোথায়? রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাবার পর মানুষের উন্নতিসাধন করব, এই কুযুক্তির বদলে এখনই নিজেদের চেষ্টায় যতটা পারি আত্মোন্নতি ও প্রতি-বেশীদের কল্যাণসাধন করি—এটা কি বেশী কাজের কথা নয়? সরকারের উপর নির্ভর না করে জনসাধারণের মধ্যে অবরুদ্ধ গঠন-ক্ষমতার স্রোত মুক্ত করে দেওয়ার প্রয়াসে ব্রতী হওয়া কি অধিকতর বাস্তববাদী বুদ্ধির কথা নয়? কিন্তু রাজনীতির আফিং-এ বুঁদ বাঙালীকে এ কথা বোঝানো দায়।

বাঙালীর সাহিত্য, শিল্প, নাটক, চলচ্চিত্র—সর্বত্রই কম-বেশী মাত্রায় আফিং-এর প্রভাব! কিন্তু আলোচনাকে আর দীর্ঘায়ত না করে শেষ উদাহরণটি দিয়ে বক্তব্য সমাপ্ত করব। এ হল ধর্মচর্চায় অহিফেনের প্রভাব।

তবে গোড়াতেই বলে রাখি আমি কিন্তু মার্কসের বিখ্যাত উক্তি—ধর্ম জনসাধারণের আফিং—এতে বিশ্বাসী নই। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং নিজের মত ধর্মনিষ্ঠ। তবুও আজকের বাঙালীর ধর্মচর্চায় যে আফিং-এর প্রভাব সুস্পষ্ট এটা দেখার জন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয় না।

অলি-গলিতে ঈশ্বরের জীবন্ত অবতার বাবা দাদা ও মায়ের কথা এবং তাঁদের ভক্তদের সেইসব শ্রীচরণে অন্ধ আবেগে লুটোপুটি খাবার কাহিনী না হয় ছেড়েই দিলাম। সেসব ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সর্বজনীন পূজার নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসব অসামাজিক কাজ হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র স্বেচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় বাঙালীকে যেমনভাবে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয় তা দেখে ব্যাপারটা আফিং-প্রভাবিত বলে সিদ্ধান্ত করা ছাড়া আর কি বলা যায়?

এক-একটি পূজার জন্য মানুষের কাছ থেকে যে পরিমাণ জিজিয়া কর আদায় করে খরচ করা হয় তার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য কয়টি কলকারখানা অথবা শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা যেত তার হিসাব করার মত

জড়বাদী যদি না-ই হই, তবু সেই টাকা দিয়ে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং এমনকি পাড়ার ও অন্য পাড়ার গরীবদের জন্য একখানি করে বস্ত্রের ব্যবস্থা করলে যে ধর্মকার্য হত—তার কথা মনে না এনে উপায় কি? প্রায় এক শতাব্দী হতে চলল বাঙালীর গর্ব রবীন্দ্রনাথের "কাঙালিনী" আমাদের পূজামণ্ডপের সামনে অপেক্ষা করছে; কিন্তু তার চোখের জল মুছিয়ে তাকে নববস্ত্র পরাবার ব্যবস্থা বাঙালী এখনও করে উঠতে পারেনি।

ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে আফিং-এর এই প্রভাবের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক কালে একটি মাত্র বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শুনেছিলাম এ রাজ্যের সর্ববৃহৎ মার্কসবাদী দলের জনৈক প্রবীণ নেতার কণ্ঠে। কিন্তু তাঁরই দলের অনুগামীরা যেভাবে পাড়ায় পাড়ায় একই ভাবে সর্বজনীন পূজার পাণ্ডা সাজেন এবং তাঁরই দলের অন্যান্য নেতারা সেইসব পূজার উদ্বোধক অথবা পৃষ্ঠপোষক হয়ে ভোট প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে রাখেন তা দেখে মনে হয়—শিরেই সর্পাঘাত, তাই তাগা বাঁধি কোথায়?

আন্দামানের বাঙালী

কলকাতা থেকে আন্দামানের প্রধান বন্দর ও শহর পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব সমুদ্রপথে ১২০০ কিলোমিটারের কিছু বেশী। মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম থেকে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব এর চেয়ে কিছু কম। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বিশাখাপত্তনম্— ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের এই তিনটি বন্দর থেকেই পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে জাহাজে নিয়মিত যোগাযোগ আছে। উপরন্তু কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারে যাতায়াতের বিশেষ একটি স্থবিধা আছে—সপ্তাহে দুইবার ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌সের বিমান চলাচল করে ইদানীং।

ছোট-বড় যে ৩২১টি দ্বীপ নিয়ে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং যার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সর্বশেষ দ্বীপটি স্থমাত্রা থেকে মাত্র ৯০ মাইল দূরে, তার সঙ্গে বাঙালীর যোগাযোগ কিন্তু খুব পুরাতন নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে ইংরেজ শাসকশক্তির পিছু পিছু তাদের সহায়কস্বরূপ গিয়ে বাঙালীরা বসতিস্থাপন করেছিল, যদিও ইংরেজদের আসার অনেক পূর্ব থেকেই ভারতের মূল ভূখণ্ডের এক এলাকা থেকে অপর এলাকায় নানা কারণে কিছু কিছু যাতায়াত ছিল। আন্দামানের কথা কিন্তু পৃথক। এখানে বাঙালী সহ মূল ভূখণ্ডের ভারতবাসীদের যাতায়াত শুরুই হয় ইংরেজদের আগমনের পর।

ইংরেজদের আগমনের পূর্বে সাংস্কৃতিক দিক থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অঙ্গ ছিল না। দ্বীপপুঞ্জের আন্দামান অংশের আদিম বাসিন্দারা নিগ্রো বংশোদ্ভূত জনজাতির, সাংস্কৃতিক দিক থেকে যারা ইংরেজদের আগমনের সময় ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের নদী-উপত্যকার বাসিন্দা হিন্দু-মুসলমানদের থেকে কয়েক হাজার বছর পিছিয়ে ছিল। নিকোবরীরা তাদের থেকে ভিন্ন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মানুষ এবং আন্দামানীদের তুলনায় তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল। এই অবস্থায় ইংরেজরা সর্বপ্রথম প্রশাসনিক দিক থেকে দ্বীপপুঞ্জের ভারতভুক্তি ঘটিয়ে এই এলাকার কাছে আধুনিক বিশ্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে। কাজে কাজেই ইংরেজদের আগমনের পূর্বে বাঙালী অথবা ভারতের অন্য কোন প্রান্তের অধিবাসীদের আন্দামান-

নিকোবরে আসার কথা ওঠে না।

ইংরেজের নৌশক্তির জন্য দ্বীপপুঞ্জের উপর তার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব স্থাপিত হলেও এখানে পরিকল্পিতভাবে বসতি স্থাপন শুরু হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর। সিপাহী বিদ্রোহের যেসব ছোট-বড় নায়কদের তদানীন্তন শাসকরা মূল ভূখণ্ডে রাখা সাম্রাজ্যের স্বার্থে বিপজ্জনক মনে করল, দেশবাসীর উপর তাদের প্রভাব হ্রাসের জন্য তাদের এখানে দ্বীপান্তরে পাঠাতে মনস্থ করল। এইভাবে রচিত হল সেলুলার জেলের ভিত্তি। তারপর ক্রমশ কঠিন অপরাধী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামী—বিশেষ করে এর সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতাদের এখানে নির্বাসনে পাঠানোর প্রথা চালু হল যার জন্য সেলুলার জেল সাতটি ত্রিতল ওয়ার্ডের এক বিশাল বন্দীনিবাসে পরিণত হল। ত্রিশের দশকের পর ভারতীয় জনমতের চাপে ইংরেজ সরকার এখানে বন্দী পাঠানো বন্ধ করে।

মূল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে এত দূরে সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপে কয়েদীদের নির্বাসন দেওয়ায় তাদের উপর খবরদারীর ঝামেলা কম। বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক কয়েদী নয়, এইরকম প্রতিকূল পরিবেশে এসে তাদের মধ্যে অনেকের মনোবল ভেঙে পড়ে। পালাবার পথও খোলা নেই তাদের সামনে। কারণ ছোট-খাট নৌকায় ঐ সুদীর্ঘ সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়ার কথা ভাবা আত্মঘাতী পরিকল্পনা। ইংরেজরা তাই সাধারণ কয়েদীদের দিয়ে দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করল। মাস তিনেক কয়েদীরা অনুগত কিনা দেখে নিয়ে তাদের সেল থেকে বার করে জঙ্গল কেটে ক্ষেত-খামার ও পথ-ঘাট তৈরীর কাজে লাগানো হত। অবশ্য অস্বাস্থ্যকর জলহাওয়া, শত্রুভাবাপন্ন স্থানীয় অধিবাসী এবং বন্য প্রাণীদের জন্য সে কাজও সহজসাধ্য ছিল না। বেশ কিছু কয়েদীর প্রাণ যায় সেই প্রক্রিয়ায়। যারা টিকে গেল, তারা বন্দীশালার জীবনের তুলনায় কিছুটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারত। মাসে তারা দশ টাকা ভাতাও পেত যার কিছুটা জমাতে পারলে মেয়াদের শেষে কিছু জমি ও চাষের উপকরণ সংগ্রহ করে স্থায়ী বাসিন্দা হবার পথে বাধা ছিল না। কারা কর্তৃপক্ষ বন্দীদের চাল-চলন কিছুদিন দেখে নিয়ে এমনকি তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে আসারও অনুমতি দিতেন। কয়েদীদের মত তারাও কাজে লাগলে স্ত্রীরা মাসে পাঁচ টাকা ও ছেলেমেয়েরা তিন টাকা হিসেবে ভাতা পেত।

দীর্ঘ মেয়াদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের মধ্যে অনেকেরই নিজ নিজ দেশে আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তার উপর জেলে যাওয়ার জন্য সামাজিক

মর্যাদাহানি। সুতরাং বেশ কিছু কয়েদীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তারা দেশে ফেরার বদলে এখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। যারা পরিবার আনতে পারল না, এখানে সমাজ বা জাতের ভয় নেই বলে ঘর বাঁধার জন্য যার সঙ্গে বনিবনা হল, তাকেই জীবনসঙ্গিনী করল। এদের বংশধরদেরই "লোকাল" বলা হয়।

অবশ্য এইভাবেও এযাবৎ মোট ৩৮টির বেশী দ্বীপে জনবসতি নেই। এর মধ্যে কয়েকটি দ্বীপে কেবল আন্দামানী অথবা নিকোবরীদের বাস, যেখানে সভ্য মানুষদের বসবাস না তারা পছন্দ করে এবং না সরকার অনুমোদন করে। ভূখণ্ডের শতকরা ১০ ভাগ মাত্র জনবসতির উপযুক্ত এবং শতকরা ৭৫ ভাগে অরণ্য —যা দ্বীপপুঞ্জের অর্থব্যবস্থার বৃহত্তম সম্পদ।

॥ ২ ॥

"লোকাল"দের মধ্যে বাঙালী কিছু থাকলেও তাঁদের মধ্যে হিন্দী, তামিল ও মালায়লম্‌ভাষীদেরই প্রাধান্য।

কিন্তু ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের জনগণনার হিসাবে দেখা যায় যে মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার (বর্তমানে এ সংখ্যা ২ লক্ষের মত হবে বলে অনুমান করা হয়) অধিবাসীর মধ্যে বাঙলাভাষীরা সংখ্যায় ২৮ হাজারেরও কিছু বেশী হয়ে (বর্তমান সংখ্যা ৩৫ থেকে ৪০ হাজার বলে অনুমিত) একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর পর স্থান হিন্দী (১৮৪৯৯), নিকোবরী (১৭৯৫৫) তামিল (১৪৫১৮) ও মালায়লম্ (১৩৯৫৩) ভাষার।

বর্তমানে বাঙালীদের সংখ্যাবৃদ্ধির একক কারণ স্বাধীনতার পর প্রথমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও তারপর ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে কয়েক বছর সরকারী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে এখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন। এই কারণে ১৯৬১ ও ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের জনগণনায় এখানকার জনসংখ্যায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি—যথাক্রমে শতকরা ১০৫.১৯ ও ৮১.১৭ ভাগ। যাই হোক, বাঙালীর সংখ্যা ওখানে আরও অনেক বাড়তে পারত। কিন্তু বাড়ল না পশ্চিমবঙ্গেরই কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল কর্তৃক ওখানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য। অনেক উদ্বাস্তু তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন উর্বরাশক্তি—

বিশিষ্ট অহল্যাভূমির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এখন ওখানে নূতন করে বাঙালী উদ্বাস্তু পাঠানো সহজ নয়। অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সম্পাদকীয়কে মূলধন করে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে. আর. গণেশকে সামনে রেখে (তিনি অবশ্য তখন মন্ত্রী নন, কমিউনিস্ট পার্টির উঠতি নেতা।) "লোকাল"রা (যাদের অধিকাংশ অবাঙালী) দ্বীপপুঞ্জে আর বাঙালী পাঠাবার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন।

দীর্ঘদিন পূর্বেকার সেই আন্দোলনের রেশ এখনও আন্দামান-নিকোবর প্রশাসনের উপর রয়ে গেছে বলে মনে হয়। তাই কেন্দ্রশাসিত এই অঞ্চলের ২৪ হাজারের মত সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা আড়াই থেকে তিন হাজারের বেশী নয়। আর উচ্চ পদে তো (১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের সিভিল লিস্ট অনুসারে) বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম। স্থানীয় বাঙালীদের কেউ কেউ মনে করেন যে বাঙালীদের মধ্যে বামপন্থী রাজনীতির প্রাবল্য থাকায় দিল্লী থেকে আগত প্রশাসনের কর্ণধারদের কাছে বাঙালীরা কাম্য অধস্তন কর্মচারী নন।

বাঙালীদের বসতি এখানে প্রধানত দক্ষিণ আন্দামানের গ্রামাঞ্চল, লিটল আন্দামান ও আরও কয়েকটি দ্বীপে। এঁদের প্রধান পেশা কৃষি। সরকারের কাছ থেকে ৫ থেকে ৭ একর কৃষিযোগ্য জমি ও তার সাজসরঞ্জাম পাবার প্রতিশ্রুতিতে এঁরা এখানে আসেন। তবে সরকারী প্রশাসনের দীর্ঘসূত্রিতার জন্য কেউ কেউ এখনও তা পাননি। জঙ্গল কেটে, শিকড়-বাকড় পরিষ্কার করে ঐ সেচবিহীন এলাকাতে একফসলী জমি তৈরী করে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতে বাঙালী উদ্বাস্তুদের যে কঠোর পরিশ্রম ও দুর্জয় সাহসের পরিচয় দিতে হয়েছে (সে সময়ে অনেককে ঘটি-বাটি বিক্রি করে প্রাণধারণ করতে হয়েছিল) তা সমুদ্রপারের বাঙালীদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার মত বিবরণ।

নিজেদের গ্রামে ছোটখাট দোকান চালানো ছাড়া আর যে পেশার মাধ্যমে অনেক বাঙালী ওখানে জীবিকা নির্বাহ করেন তা হল শিক্ষকতা। ওখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রই হল বাঙালী এবং সেই কারণে অধিকাংশ শিক্ষকও তাঁদের সমাজ থেকে। তবে মিশ্র বসতির জন্য বাঙালী ছেলেরা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক সর্বস্তরে সর্বত্রই যে মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে তা নয়। (গ্রামাঞ্চলের কথা বলাই বাহুল্য, এমন কি খাস পোর্টব্লেয়ার শহরের বুকে প্রতিষ্ঠিত "সেবা নিকেতনের" সব বাঙালী শিশু বাঙলা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। যাই হোক, বাঙালী ছাত্রদের জন্য এক এক করে

পাঁচটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে এবং তার অনেক শিক্ষকও বাঙালী। তবে যে একটিমাত্র কলেজ, আইনের কূটকচালিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় তা পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এবং তাই অধ্যাপক মহলে বাঙালীদের সংখ্যা বেশী নয়।

একমাত্র শহর ও বন্দর পোর্টব্লেয়ারে হাজার আড়াই বাঙালী সরকারী চাকুরিয়া ছাড়া ব্যবসায়ী বাঙালীর সংখ্যা আঙুলে গোনার মত। এখানকার পুরাতন-নূতন দুটি বাজারই সমৃদ্ধ এবং তাতে বেশ বড় বড় দোকান-পসার রয়েছে। কিন্তু মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে পরিবহনের ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত একজন বাঙালী ব্যবসায়ী ছাড়া আর কোন বাঙালীর নাম বড় বা মাঝারি ব্যবসায়ী হিসাবে শুনলাম না। সাময়িক পত্রিকার এজেন্সী জনৈক বাঙালীর। তবে কোন বই-এর দোকান নেই এখানে, যদিও অক্ষরজ্ঞানসম্পন্নের হার মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক বেশী—শতকরা ৪৩·৫৯ ভাগ। বাঙালী আইনজীবী মাত্র একজন। একমাত্র বেসরকারী ইংরাজী দৈনিক 'আন্দামান টাইমস' এবং তার সাপ্তাহিক সংস্করণের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হলেন শ্রীসমর সোম, যিনি সাংবাদিকতা ছাড়াও নানারকম জনসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। লোকসভার একমাত্র সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন ভক্ত বিগত দুটি সাধারণ নির্বাচনেই জয়ী হয়েছেন।

॥ ৩ ॥

আন্দামানের বাঙালীদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জানার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—তাঁদের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ বাঙালী হিসাবে ভবিষ্যৎ।

এ প্রশ্নের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদ আবিষ্কার করার চেষ্টার কারণ নেই। বাঙালীত্বের ভিত্তিভূমির উপর বিশ্বপথিক হবার সৌধ গড়ার বাধা নেই। বিশ্বের যে-কোন কোণে যে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে তিনি বিশ্বপথিক হয়েছেন নিজ অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই। বাঙালীদের মধ্যেও এযুগে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যেসব ছোটবড় মনীষী নিজ প্রতিভাবলে দেশবিদেশে বিখ্যাত

হয়েছেন তাঁরা কেউ বাঙালীত্বকে অস্বীকার করেননি। যে-কোন বিকশিত সংস্কৃতির মত বাঙালীর সংস্কৃতিতেও বিশ্বমানব হবার উপাদান আছে। সুতরাং বাঙালীয়ানার আত্মীকরণ করেই আমরা তার উর্ধ্বে উঠতে পারি। বলা বাহুল্য আন্দামানের বাঙালীদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে এবং তাই সঙ্গত কারণেই পূর্বোক্ত প্রশ্ন উঠতে পারে।

বাঙালীত্বের উপাদান হল বঙ্গসংস্কৃতি। এর বাহ্য উপকরণ ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকাভিনয় প্রভৃতি হলেও এর প্রচ্ছন্ন এবং অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল একটা বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণাভিত্তিক বাঙালী মানসিকতা। বলা বাহুল্য এই দুই ধরণের উপকরণ পরস্পর থেকে জীবনরস সংগ্রহ করে।

পূর্বোক্ত মানদণ্ডের নিরিখে আন্দামানের বাঙালীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান করার প্রয়াস করা যেতে পারে।

সংস্কৃতি-চর্চায় এবং কোন বিশেষ সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে ধরে রেখে তাকে আরও বিকশিত করার ব্যাপারে মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় ভূমিকা আছে। কিন্তু ত্রিতল-বিশিষ্ট আন্দামানের বাঙালী সমাজে একটি গোষ্ঠী বাঙালীত্ব সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়, অপরটি মূলত আত্মকেন্দ্রিক—ওখানকার বৃহত্তর বাঙালী সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনে সেই গোষ্ঠীর বিশেষ আগ্রহ নেই এবং তৃতীয়টির ভিতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হতে এখন কিছু দেরী।

প্রথম গোষ্ঠীর বাঙালী এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বাঙালীত্ব বজায় রাখার প্রতি এঁদের তেমন কোন আগ্রহ নেই। তবে এঁরা সংখ্যাল্প। এঁদের মধ্যে "লোকাল"রা ছাড়াও ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে পুনর্বাসনপ্রাপ্ত উদ্বাস্তুরাও আছেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির নানা স্তরের উদ্বাস্তুরা এখানে এসেছিলেন। যাঁরা এই স্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন, নূতন পরিবেশে এসে তাঁদের অনেকের সামাজিক বন্ধন ক্ষীণ হয়ে পড়ল। কারও কারও ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ আর্থিক সচ্ছলতার পরই সহজলভ্য সুরা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈধ-অবৈধ নারীসংসর্গ সহ অন্যবিধ ব্যসন মস্তক বিঘূর্ণিত করে দেবার কারণ হয়ে পড়ল। এঁদের পরিবারে তাই ভিন্নভাষাভাষী বা ভিন্নধর্মের (মুসলমান ও খ্রীস্টান) জীবনসঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর আবির্ভাব ঘটছে। এসব বিবাহ কেবল তরুণ-তরুণীদের প্রণয়ঘটিত উদ্বাহই নয়, অভিভাবকদের সম্বন্ধ করে দেওয়া বিবাহও আছে। কালক্রমে এইসব বর্ণসঙ্করেরা "লোকাল"দের মত নূতন এক আন্দামানী জনগোষ্ঠীর প্রবর্তন করতে পারেন। কারণ আন্দামানের মূল বাঙালী সমাজে

প্রকাশ্যভাবে না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁরা অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যাবেন। সুতরাং এঁদের সম্বন্ধে খুব বেশী ভরসা রাখার কারণ নেই বোধহয়।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী, যাঁদের মূলত আত্মকেন্দ্রিক আখ্যা দিয়েছি তাঁরা প্রধানত পোর্টব্লেয়ার ও আর দুই-একটি জনপদের বাসিন্দা মূলত সরকারী চাকুরিয়া ও এক-আধজন ব্যবসায়ী। এঁরা বদলি হলেই অথবা প্রয়োজন পড়লে ব্যবসা গুটিয়ে মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাবেন। যদিও এঁরা মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার মানুষ এবং এঁদের মধ্যে এমন বহুসংখ্যক কৃষ্টিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত আছেন যাঁরা ইচ্ছা করলে আন্দামানের গ্রামাঞ্চলের বাঙালীদের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন তবু কদাচিৎ এঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের মধ্যে রাজনীতিসচেতন বামপন্থী যাঁরা তাঁরা নিজেদের মাইনে-ভাতা বাড়ানোর আন্দোলন নিয়েই মত্ত। যাঁরা নিজেদের নিছক সংস্কৃতিচর্চাকারী বলে মনে করেন তাঁদের দৌড়ও "অতুল স্মৃতি সমিতি" নামক বাঙালীদের একমাত্র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত যেখানে তাস, দাবা ও ক্যারাম খেলা হয়, কখনও-সখনও নাটকাভিনয়ও হয় এবং পাঠাগার থেকে কিছু বই-এর লেন-দেনও হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য দ্বীপে বসবাসকারী বাঙালীদের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব নেবার জন্য পোর্টব্লেয়ারে একটি বাঙলা বই-এর দোকান চালানো অথবা কোন বাঙলা পত্রিকার প্রকাশন কিংবা যাত্রা-নাটক-কীর্তনের দল সংগঠিত করে গ্রামাঞ্চলে যাবার কথা এঁরা কেউ ভাবেন বলে শুনলাম না। পোর্টব্লেয়ারে দুটি প্রেক্ষাগৃহে নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখানো হয়। কিন্তু ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী সেখানে সমগ্র বছরে মাত্র পাঁচবার বাঙলা ছবি দেখানো হয়। এ ব্যাপারেও পোর্টব্লেয়ারের মধ্যবিত্ত বাঙালীর কিছু করার নেই। অনুরূপভাবে এখানকার একমাত্র বেতার কেন্দ্রে বেচারী বাঙলা ভাষার জন্য বরাদ্দ সপ্তাহে মাত্র পৌনে দুই ঘণ্টা সময়। আর বেতার কর্তৃপক্ষের এমন ব্যবস্থা যে সাধারণ সেটে (গ্রামাঞ্চলের গরীব বাঙালীরা এইরকম সেট কিনতেই হিমসিম খান) কলকাতা কেন্দ্রের প্রোগ্রাম শোনা যায় না। বরং আন্দামান থেকে ঢাকার প্রোগ্রাম শোনা সহজ। যাই হোক, এ ব্যাপারের প্রতিবিধানের জন্য ওখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী নিয়মিত আন্দোলন করছেন বলে শুনিনি। গ্রামাঞ্চলের গরীব বাঙালীদের বাঙলা বই-এর পাঠতৃষ্ণা মেটাবার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার স্থাপন করার পরিকল্পনা পোর্টব্লেয়ারের কোন বাঙালীর আছে বলে শুনিনি।

এই প্রসঙ্গে পোর্টব্লেয়ারের তামিল, মালায়ালম্‌ অথবা কন্নড়ভাষীদের

সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের তুলনা সহজেই এসে পড়ে। ঐসব ভাষার অধিবাসীরা সংখ্যায় বাঙালীদের তুলনায় কম হলেও নিজ নিজ প্রদেশের মানুষদের জন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়েছেন। শিখদের গুরুদ্বারাও একই কাজ করে। এই-সব সংগঠনের সাহায্যে দ্বীপপুঞ্জে নিজ নিজ ভাষার অধিবাসীদের এনে কাজকর্মের সুবিধা করে দিয়ে সংখ্যাবৃদ্ধির বিধিবদ্ধ প্রচেষ্টা চলেছে। দক্ষিণ ভারতীয়রা নিজেদের এবং শুনলাম স্ব স্ব রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করছে। শিখরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পাচ্ছেন সৈন্যবাহিনীর ভূতপূর্ব কর্মী হিসাবে গ্রেট নিকোবরের ক্যাম্বেল বে এলাকায় বসতি স্থাপন করার জন্য। জনৈক বিশিষ্ট বাঙালী ক্ষোভ সহকারে বললেন যে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য যেখানে পরিবার পিছু আড়াই তিন হাজার টাকাও বরাদ্দ করা হয়নি সেখানে ক্যাম্বেল বে-র পুনর্বাসনে পরিবার পিছু ৫০-৫৫ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে এবং কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাঙালী একজনও নেই।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। কথা হচ্ছিল আন্দামানের বাঙালীর নিজেদের প্রয়াসে বাঙালী থাকার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে।

তৃতীয় গোষ্ঠীর বাঙালী যাঁরা আন্দামানের গ্রামাঞ্চল অথবা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী এবং যাঁদের পেশা প্রধানত কৃষি, দোকানদারী অথবা সড়ক নির্মাণ বা জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজ ও যাঁরা ওখানকার বাঙালীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁরাই আন্দামানের বাঙালীদের ভবিষ্যৎ। দক্ষিণ আন্দামানের ফেরারগঞ্জের এক অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করলাম পুরুষদের সঙ্গে নানা বয়সের মহিলারাও শ্রোতা। ঐসব মহিলাদের প্রায় সবাই বাঙালী। তামিল, হিন্দী ও মালায়ালম্‌ভাষীদের বসতি ধারেকাছে থাকলেও এবং তাঁদের পুরুষ সমাজের প্রতিনিধিরা সভায় যোগদান করলেও তাঁদের মহিলারা প্রায় প্রতিনিধিত্ববিহীন। উপস্থিত মহিলারা আদৌ উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁদের চলনে-বলনে, সাজে-পোশাকে বাঙালী নারী-সমাজের বৈশিষ্ট্য—অহেতুক লজ্জাবর্জিত অথচ শালীনতাযুক্ত ভাব স্পষ্ট। অকুণ্ঠভাবে তাঁরা সভায় গাইলেন, অপেক্ষাকৃত ছোটরা নাচলও। খবর নিলাম হারমোনিয়াম সহযোগে নিয়মিত বাঙলা গানের চর্চার আসর অনেক গ্রামেই আছে। ওখানকার মাটি খোলা তৈরী করার অনুপযুক্ত, এছাড়া 'ঋষি'রাও নেই যে খোলা ছাইবে। সুতরাং অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পশ্চিমা ঢোলকের সঙ্গে সঙ্গত করেই গ্রামাঞ্চলে কীর্তন গাওয়া হয়। দুর্গা পূজার

সময়ে অনেক গ্রামের বাঙালীরা থিয়েটার-যাত্রাও করেন। দুর্গা, কালী, সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠান যথাসম্ভব বাংলার গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে হয়—মাইক্রোফোনের দিক্‌দিগন্ত প্রকম্পিতকারী হিন্দী ফিল্মী গানা, টুইস্ট নাচ এখনও পূজানুষ্ঠানগুলিকে দূষিত করতে সক্ষম হয়নি।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে তার কথাও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বাঙালী শ্রীমনোরঞ্জন ভক্ত সঙ্গত কারণেই লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি গ্রামের কৃষিজীবী বাঙালী উদ্বাস্তুদেরই একজন। বিভিন্ন ভাষার আদিবাসীদের নিয়ে গঠিত গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অনেক নির্বাচিত প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্য বাঙালীরা সভা-সমিতি পরিচালনার সময় অপরাপর ভাষার অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে হিন্দীতে (হোক না তা 'টুটি ফুটি') বক্তৃতা দেন। আন্দামানে যে নূতন সমাজ গড়ে উঠছে প্রশাসনের হিন্দীয়ানা ও পরিবেশের তামিল-মালায়ালমের চাপ সত্ত্বেও এই বাঙালীরা তার মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর এক যোগ্য স্থান অধিকার করার দিকে শনৈঃ শনৈঃ এগোচ্ছেন।

বাংলা বই, পত্র-পত্রিকা এবং বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক অন্যান্য উপকরণ ও অনুষ্ঠানের জন্য তীব্র পিপাসা সমুদ্রপারের ঐসব বাঙালীর। বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমীদের জন্য বড় একটা কর্মক্ষেত্র অপেক্ষা করছে ওখানে।

রাঢ়বঙ্গের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান

অধিকাংশ সম্পদের কেন্দ্রীকরণ করে কলকাতা কেবল আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেই গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রীহীনতার কারণ হয়নি, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও রাজধানী ও গ্রাম-বঙ্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য পরিদৃশ্যমান। এ সত্য নূতন করে উপলব্ধ হল 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থটি* পাঠ করার সময়ে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখার মিউজিয়াম, পুঁথি সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা এর প্রাণ মানিকলাল সিংহ মহাশয়ের সংস্কৃতি-কর্মের নিষ্ঠা দেখে অভিভূত হয়েছেন। স্বদেশের ইতিহাস, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি কী অপরিসীম অনুরক্তি থাকলে প্রায় একক প্রচেষ্টায় তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টির মত বিষ্ণুপুরের গর্ব সাহিত্য পরিষৎ-এর ঐ কেন্দ্রের মত পুরাচর্চার পীঠস্থল গড়া যায়, তা বুঝতে হলে মানিকবাবুর ঐ কীর্তি স্বচক্ষে দেখতে হয়।

কিন্তু সংগঠক ও কর্মী মানিকলাল সিংহের কথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই সাহিত্য পরিষৎ-এর ঐ কেন্দ্রের প্রসঙ্গ মুলতবী রেখে গ্রন্থ-প্রসঙ্গে আসা যাক। মানিকবাবুর ইতিহাস-গবেষণাও যে কত মৌলিক এবং কী পরিমাণ গভীরমূল তার নিদর্শন সমালোচ্য গ্রন্থটি। পরের মুখের ঝাল খেয়ে অর্থাৎ এই গ্রন্থ ঐ গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু নিয়ে ভালো ছাপা বাঁধাই-এর দৌলতে বহু বাঙলা গ্রন্থকার অনেকবিধ পুরস্কার, পারিতোষিক অথবা ঐ জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছেন। নানা পত্র-পত্রিকায় সেইসব পল্লবগ্রাহী গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের তুলনায় শতগুণ প্রতিভাশালী এবং বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিরল সংখ্যক মৌলিক গবেষণাকারীদের অন্যতম মানিকলাল সিংহ মহাশয়ের বর্তমান গ্রন্থটির প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি এখনও তেমনভাবে আকর্ষিত হয়নি—এইটাই ক্ষোভের বিষয়। এবং এর মূল কারণের প্রতি প্রথমেই

---

* পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি—মানিকলাল সিংহ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ইঙ্গিত করা হয়েছে—মানিকবাবু কলকাতার বাসিন্দা নন অথবা কলকাতার যে-সব সংস্কৃতি-কর্মীদের হাতে প্রচারের তাবৎ মাধ্যম তাঁদের পরিমণ্ডলে মানিকবাবু ঘোরাফেরা করেন না। মাত্রাতিরিক্ত কলকাতা-কেন্দ্রিকতা বাঙলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষে আদৌ শুভ নয়।

॥ ২ ॥

গ্রন্থের নিবেদনে লেখক লিখেছেন, "···নুড়ি কুড়ানো আমার পেশা আর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ানো আমার নেশা। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমি বাঁকুড়ার গ্রামগুলিতে ঘুরিয়াছি, নানান্ প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান করিয়াছি, সংগ্রহ করিয়াছি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করিয়াছি।"

গ্রন্থের নাম এবং ভুমিকার উদ্ধৃত উপরিউক্ত ঐ অংশের সাহায্যে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিধিনির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রধানত পশ্চিম রাঢ় বা বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিই তাঁর গবেষণা ও আলোচনায় বিষয়বস্তু। আর পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, এ আলোচনা পারমিউটেশান-কম্বিনেশনের প্রক্রিয়া নয়, অথবা অধ্যাপকসুলভ উদ্ধৃতি ও ফুটনোট-কণ্টকিতও নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেশচন্দ্র সেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসুর পদাঙ্ক অনুসারী মানিকবাবুর তথ্যসংগ্রহ সরেজমিনে—বাঁকুড়ার হাট-মাঠ-ঘাট-গ্রাম থেকে।

সংগৃহীত এইসব তথ্যকে মানিকবাবু এই ক্ষেত্রের পূর্বসূরীদের বিবরণের সঙ্গে তুলনা ও বিশ্লেষণ করেছেন এবং তারপর নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ভি. বল থেকে শুরু করে ভি. ডি. কৃষ্ণস্বামী, ডি. সেন, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, বি. বি. লাল, পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের প্রতিবেদন তিনি যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি এ বিষয়ের চিরায়ত গবেষক L. S. Leakey, E. A. Hooton, Tinley ও O. B. Miller প্রমুখের নীতি-নির্ধারক অভিমতও তাঁর বিশ্লেষণে যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। এইখানেই তাঁর মৌলিকতা, এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য

প্রথম প্রবন্ধটি 'প্রাগৈতিহাসিক পর্ব' সংক্রান্ত। এই পর্বে বাঁকুড়া জেলায় এযাবৎ আবিষ্কৃত প্রত্নাশ্ম, নবাশ্ম, আদি প্রস্তরযুগ ইত্যাদি কালের প্রাগৈতিহাসিক

নিদর্শনের উল্লেখ করে সেইসবের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছেন, এবং তাঁর এই প্রয়াস যে বিজ্ঞানদৃষ্টিচালিত তার নিদর্শন তাঁর মন্তব্যের জিজ্ঞাসু মানসিকতা। এর একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধগুলির সাহায্য হাড়, হরিণের শিং, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি হইতে তীরের ফলা, সুচালো হাড়ের হাতিয়ার, সুতীক্ষ্ণ বর্শাফলক, হারপুণ ইত্যাদি শিকারোপযোগী হাতিয়ারগুলি নির্মিত হইত। ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ নানারূপ শিল্পকার্য করিতেও সক্ষম হইত। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষুদ্রাশ্মরের সাহায্যে শিকার করা সম্ভব হইত বলিয়া মনে করা যায় না। তাই বাঁকুড়া জেলার প্রত্নাশ্মর, নবাশ্মর, তামাশ্মর আয়ুধ ক্ষেত্রগুলি হইতে এত দূরবর্তী দে-জুড়ি এবং মনোহর গ্রামের আদিম মানব গোষ্ঠীগুলির জীবিকা অর্জন সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। তবে কি সেই সুদূর অতীত কালেও বৃত্তি বিভাগ এবং বিনিময় সুরু হইয়াছিল? এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো আজই এত সহজে দেওয়া সম্ভব নয়। আরও ব্যাপকতর অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের পরে এ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে জানা যাইবে।" (পৃ ২৩)

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে এইজাতীয় বিজ্ঞানীসুলভ সংশয়বাদ মানিকবাবুর রচনায় প্রায়ই নজরে পড়ে।

॥ ৩ ॥

প্রত্নতত্ত্বনির্ভর অনুরূপ দ্বিতীয় রচনাটি 'ডিহর পরিমণ্ডল' সংক্রান্ত। মল্ল-রাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের তিন মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ঐ নামের গ্রাম এবং সংলগ্ন আরও সাত-আটটি গ্রাম নিয়ে এই পরিমণ্ডল যেখানে জেলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহুবিধ নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐ এলাকায় এযাবৎ প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পর গ্রন্থকার যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হচ্ছে :

"...প্রাগৈতিহাসিক যুগে ডিহরে বসবাসকারী কোন কোন গোষ্ঠী মৃৎপাত্রের গায়ে আঁচড় কাটিয়া বৃষ্টি, ঢেউ, সারিবদ্ধ ঢেউ (নদী বা জলাশয়), সূর্য, পাখী, তীরের ফলা ইত্যাদির চিত্র আঁকিতে প্রয়াসী হইয়াছিল।" (পৃ ৩৯)

"মিশর এবং মেক্সিকোর চিত্রলিপির সঙ্গে ডিহর হইতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের

গায়ে আঁচড় কাটিয়া তৈয়ারী নক্সাগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে।”

“…প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন এক অধ্যায়ে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ডিহর পরিমণ্ডলের গ্রামগুলিতে মৎস্যজীবি, মৎস্য শিকারী গোষ্ঠীগুলির বসবাস ছিল। এই মৎস্যজীবি, মৎস্যশিকারী গোষ্ঠীর নর-নারীর যে একদা মাছ ধরিবার প্রয়োজনে সূতা, সূতা দিয়া জাল এবং লজ্জা নিবারণের উপযোগী বস্ত্রখণ্ডের উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহা মানিতে হয়। ডিহরের ঢিবিগুলি হইতে সূতা বা কাপড়ের প্রাচীনতম নমুনা এতাবৎ আবিষ্কৃত না হইলেও সূতা পাকাইবার তকলী বা টাকুর (চাকির) সব স্তর হইতে আবিষ্কার এবং তৎসঙ্গে আড়বোনা চৌকার নানা ধরণের প্যানেলগুলি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন এক সময়ে পশ্চিম রাঢ়ের দ্বারকেশ্বর তীরবর্তী গ্রাম ডিহরে বসবাসকারী মৎস্যজীবী ও মৎস্য শিকারী গোষ্ঠীগুলির দ্বারাই সর্বপ্রথম কাপড় উদ্ভাবিত হইয়াছিল।” (পৃ ৩৯-৪০)

“এতাবৎকালের মধ্যে রাঢ়ের যে সমস্ত প্রাচীনতম বসতি কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সে সমস্তগুলি হইতেই দক্ষিণ ভারতীয় কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলাল পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সর্বনিম্ন অধিবসতি স্তর হইতেও পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে এই কৃষ্ণ ও লোহিত কৌলালের বাহক রাঢ়ের কোন্ আদিম নরগোষ্ঠীগুলি ? ইহারা কি কলিঙ্গদেশ হইতে আগত অথবা উত্তরভারত হইতে রাঢ়ে তাম্রলিপ্তিতে গিয়াছেন ? কালে ইহার সুমীমাংসা হইবে।” (পৃ ৪২)

ডিহর পরিমণ্ডলে প্রাগৈতিহাসিক থেকে মৌর্য-শুঙ্গ পর্যন্ত নানা যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন স্তরে স্তরে পাওয়া গেছে। তবে সর্বনিম্ন অধিবসতির স্তরে (নবাশ্মর সংস্কৃতি) যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার থেকে বলা চলে যে, “এই সংস্কৃতির যুগে কতকগুলি পশুপক্ষীকে গৃহপালিত করা, শস্য বপন ও উৎপাদন করা, মৃৎপাত্রের ব্যবহার এবং খাদ্যদ্রব্যগুলি প্রস্তুত বিষয়ে আগুনের ব্যবহার ভালভাবেই হইয়াছিল।” (পৃ ৩৫)।

তৃতীয় প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু ডিহরের ‘ঐতিহাসিক আদি-পর্ব’, নানা স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন যুগের যেসব অবশেষ পাওয়া গেছে তাতে ডিহরে সংস্কৃতি সমন্বয়ের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই “…উপরোক্ত কয়েকটি মৎস্যজীবী ও মৎস্যশিকারী জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে নবাশ্মর ও তাম্রাশ্মর সংস্কৃতির স্রষ্টা ও বাহকদের মিলন বা পরস্পর সহযোগিতার ফলে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। মাছ, ভাত, কাপড় এই যৌথ সংস্কৃতির অবদান।” (পৃ ৪৩)

বলা বাহুল্য এই মাছ, ভাত ও কাপড় বাঙালী সংস্কৃতিরও বনিয়াদ।

ঐতিহাসিক প্রথম যুগে বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে ভারত-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সম্বন্ধেও বহুবিধ প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন লেখক।

"ডিহর হইতে আবিষ্কৃত উপরত্নের মঞ্জুষাগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে-সুদূর অতীতকালে বাঁকুড়া জেলার ডিহর গ্রামটির সহিত মালবের উজ্জয়িনীর—অবন্তীর সুনিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ডিহরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম অবন্তিকা; সংলগ্ন গ্রামটির নাম জন্তা। দামোদর তীরের একটি গ্রামের নাম পুষ্কর্ণা।...তাহা ছাড়া দেখা যায় যে বাঁকুড়া জেলার কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে অনেকবারই মালব রাগের ব্যবহার করিয়াছেন।...চণ্ডীদাসের সহিত রামীর সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে —

বসিঞা অবন্তিপুরে পড়ুঞা পড়ণপড়ে
হেনকালে এক রসের নায়রি দরশন দিল মোরে॥

অবন্তী, উজ্জয়িনী (উজানী) নামের প্রীতি রাঢ়-বঙ্গে এত বেশী হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে রাঢ়-বঙ্গের সহিত উজ্জয়িনী—তক্ষশিলার সুনিবিড় সম্পর্ক বহু পূর্ব হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।" (পৃ ৪৯)

এই প্রবন্ধে প্রাচীন বাঁকুড়া জেলার সঙ্গে অশোক-পূর্ব ও পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কের অজস্র প্রমাণ উপস্থাপিত করে লেখক আধুনিক বাঁকুড়ার জন-জীবনে বৌদ্ধপ্রভাবের অবশেষ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক নিদর্শন পেশ করেছেন:
"...উপরোক্ত (দামোদরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত জেলার উত্তর-পশ্চিমের কিছু গ্রামে) অঞ্চলে ১৩ই বৈশাখ হালসাল অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন বাঁকুড়া জেলার পুরাতন বাসিন্দা দোকানদারগণ নূতন খাতার মহরৎ করিয়া থাকেন। অপরাহ্ণে গৃহস্থগণ গৃহের ঈশান কোণায় শেওড়া গাছের ডাল গুঁজিয়া দেয়—তাহাদের বিশ্বাস গৃহে বজ্র বিদ্যুতের ভয় থাকিবে না। ৺আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ইহাকে বৌদ্ধ সংস্কার বলিয়া মনে করেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহাপদ্মনন্দের রাজ্যাভিষেকের কালে ভরণী নক্ষত্রের আদিতে মহাবিষুব হইত। তদনুসারে ১৩ই বৈশাখ বর্ষারম্ভের প্রথম দিনরূপে গণনা শুরু হয়। বাঁকুড়া জেলার আঁকুড়ে ডোমগণ এই দিনে তাঁহাদের স্বজাতি কালুবীরের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া থাকেন। খুব সম্ভব মহাপদ্মনন্দের কলিঙ্গ অভিযানের সময় এই অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।" (পৃ ৫৩)

এমনি বিস্তীর্ণ ইতিহাস দেওয়া হয়েছে 'ছান্দাড় পরিমণ্ডলে'র যার মধ্যে পড়ে শুশুনিয়া পাহাড়। এখানকার শিলালিপির নির্দেশে রাজা চন্দ্রবর্মার রাজধানী পুষ্করণা বা পখন্নার আবিষ্কার হয়। সুধী পাঠকেরা জানেন যে এই পখন্না গ্রামে আচার্য সুনীতিকুমার মৌর্যশুঙ্গ আমলের পোড়ামাটির যক্ষিণী মূর্তি আবিষ্কার করেন।

॥ ৪ ॥

এমনিভাবে হর্ষবর্ধন, আদিশূর এবং তারপর পাল রাজাদের সময়কার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে 'ঐতিহাসিক মধ্যপর্ব' প্রবন্ধে। তবে ইতিহাস-বিখ্যাত ঐসব নরপতিদের আমল লেখক গ্রহণ করেছেন কেবল পটভূমিকা হিসাবে। তাঁদের যুদ্ধাভিযান বা আর কিছু মুখ্য স্থান পায়নি; বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলের ঐকালের তথ্যনির্ভর ইতিহাসই তাঁর প্রধান আলোচ্য।

আলোচ্য সর্বশেষ যুগটি পাঠান-মোগল রাজত্বের পটভূমিকায় যখন মল্লরাজা বীর হাম্বীরের প্রভাবে বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়ার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ। 'কিল্লাজাত মহল পরিমণ্ডল বিষ্ণুপুর' প্রবন্ধে সেই কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক।

দুটি প্রবন্ধেরই পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘায়ত হবার আশঙ্কায় এর বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কেবল অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত কিছু তথ্য পাঠকদের উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

"ছান্দাড় গ্রামে জঙ্গলাসিনী দেবীর অবস্থানের জন্য এই গ্রামে শারদীয় দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ।" (পৃ ৮৬)

"বাঁকুড়া জেলায় যত বেশী পার্শ্বনাথ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে এত বেশী আর কোন তীর্থঙ্করের মূর্তি দেখা যায় নাই।" (পৃ ১০৬)

"বাঁকুড়া তথা দক্ষিণরাঢ়ের প্রাচীন শিবলিঙ্গগুলির পূজা উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিগ্রন্থ জৈন ধর্মের সহিত এক সুনিবিড় সংযোগ এবং সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।" (পৃ ১০৬)

"জৈন আচারঙ্গ বা আয়রঙ্গ সূত্রে লিখিত আছে যে, চব্বিশতম জৈনতীর্থঙ্কর

মহাবীর রাঢ়ে জৈনধর্ম প্রচারের জন্ম যখন আসেন তখন রাঢ়ের বর্বর অধিবাসীরা তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করে এবং কুকুর লেলাইয়া দেয়।" (পৃ ১০৭)

"বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের ঘোষ, বসু, মিত্র, সোম, চন্দ্র ইত্যাদি পদবী যুক্ত গোষ্ঠীগুলি একসময় করণব্রাহ্মণ ছিলেন।" (পৃ ১০৯)

"রাঢ় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি মধ্যযুগে বিভিন্ন সামন্তরাজাদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় এক একটি অঞ্চল উক্ত সামন্তরাজাদের পদবী অনুযায়ী এক একটি 'ভূম' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। যেমন—শিখরভূম, তুংভূম, সামন্তভূম, মল্লভূম, সিংভূম, গোপভূম, শূরভূম, শবরভূম ইত্যাদি।" (পৃ ১১২)

"ধর্মঠাকুর শূণ্যমূর্তি, নিরঞ্জন নিরাকার প্রভু। ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তিগুলি বৌদ্ধস্তূপের অনুরূপ। অনেক ধর্মশিলার মধ্যে পাঁচটি করিয়া ফোকর দেখা যায়। বৌদ্ধস্তূপে এই ধরণের কুলুঙ্গি থাকিত। আবার অনেক ধর্মশিলায় পাঁচদিকে পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি থাকিতেও দেখা যায়।" (পৃ ১২৭)

"...এই সময়ের (বড়ু চণ্ডীদাসের) বৈষ্ণব ধর্ম, জয়দেব প্রবর্তিত তান্ত্রিক সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম—ইহার সহিত শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।" (পৃ ১৩৭)

"ছান্দাড়ের রাজা শীতল মল্লের আমলে প্রবর্তিত ধর্মঠাকুরের পূজায় জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছিল। ধর্মঠাকুরের গাজনে জাত কলসি অনুষ্ঠানে সব জাতির মানুষ আসিয়া এই কলসটিকে স্পর্শ করে।" (পৃ ১৩৭)

"পশ্চিম রাঢ়ের সেকালের ধর্মের উপর এই তান্ত্রিকতা উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল।" (পৃ ১৩৭)

"মল্লরাজাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেক শ্যামচাঁদ, মদনমোহন বিগ্রহের ভোগে শোলমাছের সহিত কচিআমের টক দেওয়ার রীতি আছে।" (পৃ ১৩৮)

"...মল্লরাজাদের মধ্যে প্রচলিত অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার রহিয়াছে—ইহা বড় দুর্গাপূজা। ছোট দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ হয় শুক্লা ষষ্ঠীর দিন কিন্তু বড় দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ হয় জিতাষ্টমী বা তাহার পরদিন হইতে।" (পৃ ১৫২)

"লৌহ নিষ্কাশনের জন্য বীরহাম্বীর সিংভূম হইতে লোহার জাতির মানুষদের আনয়ন করান।" (পৃ ১৬৪)

"মল্লভূমের লোহারগণ স্থানীয় মাকড়া পাথর গলাইয়া প্রয়োজনীয় লৌহ নিষ্কাশন করিত।...কামানের বিষয়ে অভিজ্ঞ এই সব সুদক্ষ কারিগর মিরদাহা (Mir-daha) বলিয়া অভিহিত হইতেন।...বিষ্ণুপুর নগরীর বাঁধপাড় মহল্লায়

এক সদ্‌গোপ পরিবার পুরুষানুক্রমে মিরদাহা (Match lock)-র কাজ করিতেন। তাঁহারা মিদ্যা বলিয়া সুপরিচিত।" (পৃ ১৬৫)

"…মল্লরাজারা…উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য সুদক্ষ মুসলমান কারিগরও আনাইয়া ছিলেন। বিষ্ণুপুর শহরের অনতিদূরে…এই সমস্ত দক্ষ মুসলমান কারিগরদের বংশধরগণ আজও বসবাস করিতেছেন।" (পৃ ১৬৬)

"…বীরহাম্বীর তাঁহার রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে মোগল রীতির প্রবর্তন করেন। এই মিত্রতার (মানসিংহ ও তৎপুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে) সূত্র ধরিয়াই মল্লরাজ পরিবারে অম্বরী তামাকের বিলাস, তাসের খেলা ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটে।" (পৃ ১৬৭)

"রাঢ়ীয় শাঁখারী জাতির মূল সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে ইহাদের পূর্বপুরুষ সুপ্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে রাঢ় বঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।… চূণারু বলিয়া অভিহিত জাতির মানুষই রাঢ়ীয় শাঁখারী জাতির আদিম রূপ।" (পৃ ১৭০)

"মল্লভূমের রাজারা তাঁহাদের দীক্ষাগুরু শ্রীনিবাস আচার্য ইত্যাদি লইয়া কার্তিক পৌর্ণমাসীতে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয় করিতেন। এই যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ গ্রহণ করিতেন মল্লরাজা স্বয়ং, তাঁহাদের মন্ত্রী মহাপাত্র, স্বয়ং আচার্য শ্রীনিবাস গোস্বামী, তাঁহার দুই পত্নী, কন্যা হেমলতা, কনক লতা ইত্যাদি।…রাসমঞ্চে অভিনীত মল্লরাজ পরিবারের রাসযাত্রাই খুব সম্ভব রাঢ় বঙ্গের প্রথম যাত্রাভিনয় এবং প্রথম প্রাকৃত ভাষা তথা বাংলায় অভিনয়।" (পৃ ১৮৩)

আরও নানা বিষয়ের আলোচনা আছে যার মধ্যে বাঁকুড়ার মন্দিরের ভাস্কর্য ও তার গড়ার ইতিহাস এবং জেলার সঙ্গীত সাধনার ইতিবৃত্ত। তবে এই প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে যোগ্য লেখকদের দ্বারা আলোচিত হয়েছে বলে সে সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

॥ ৫ ॥

যেহেতু মূলত সংস্কৃতি-আলোচনা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের লক্ষ্য তাই ইতিহাসের সঙ্গে এগারোটি প্রবন্ধে পশ্চিম রাঢ় বা বাঁকুড়ার সংস্কৃতির নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে বিষয়টির পূর্ণতাসাধনের চেষ্টা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে প্রচলিত মুঘল তাস, নক্সা তাস ও দশাবতার তাসের বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে এজাতীয় প্রথম প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে। দেশে সাধারণত প্রচলিত চার রং-এর ৫২ খানি তাসের থেকে পূর্ব বিষ্ণুপুরে প্রচলিত পূর্বোক্ত তিন ধরণের তাস ও তার খেলার পদ্ধতি পৃথক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে মল্লরাজাদের শিকারোৎসব এবং তৃতীয়টিতে জেলার দুটি প্রমুখ লোকোৎসব মনসাপূজা ও ঝাপানের সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ একটি লোকায়ত পর্ব 'শিয়াল-শকুনি পর্ব'—যা একান্তভাবেই পশ্চিমবঙ্গের ঐ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের প্রচলিত লোককথাটিও বিচিত্র ও অভিনব বলে লোকসাহিত্যে স্থায়ী স্থান পাবার উপযুক্ত। বঙ্গের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ সম্প্রদায় শুভঙ্করগণ ও তাঁদের গণিতপ্রতিভা সম্পর্কিত আলোচনা একালের পাঠকদের মনোরঞ্জন করবে। শুভঙ্কর কারও নাম নয়—বিশিষ্ট গণিতজ্ঞদের সামান্য উপাধি। বাঁকুড়াতেও দশ-বারোজন শুভঙ্করের জন্ম হয়েছিল।

'বিভিন্ন কালের বাজার দর' সম্পর্কিত রচনাটি পড়ে একালের গৃহস্থরা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস মোচন করবেন। পাঠকদের মনে সেকাল সম্বন্ধে ঈর্ষাসৃষ্টির মানসে দুই-একটি দরদাম উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না।

বীর হাম্বীরের আমলে "টাকায় দেড় মণ চাল পাওয়া যাইত। এক মন গব্য ঘৃতের দাম ছিল দুই টাকা আর সরিষার তেলের মণ ছিল এক টাকা কুড়ি পয়সা···।"

"···বীরসিংহের আমলে মাছের দর বলিয়া কিছু ছিল না। দুই এক পয়সার বিনিময়ে কয়েক সের মাছ মিলিত।"

"···১১৫১ বঙ্গাব্দে সম্পাদিত দলিল হইতে জানা যায় যে তখন পাঁচ সের এক পুয়া আতপ তণ্ডুলের দর ছিল দুই আনা অর্থাৎ টাকায় এক মণের মত। দেবতার নিত্য সেবায় বরাদ্দ দৈনিক আধ পুয়া গব্য ঘৃতের মূল্য ছিল তিন পয়সার মত অর্থাৎ গব্য ঘৃতের সের ছিল ছয় আনা, এক সের মিঠাই এর দাম ছিল দুই আনা, এক সের সন্দেশের মূল্য ছিল সাত পয়সা··· ।"

বিষ্ণুপুরের তিন বৈশিষ্ট্য—গান বাজনা মতিচুর সম্বন্ধেও একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। আর আছে 'মন্দির নির্মাণের কয়েকটি সাংকেতিক সূত্র' সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্রায়তন কিন্তু মূল্যবান রচনা।

'সাহিত্য' শীর্ষকে পশ্চিম রাঢ়ের সারস্বত সাধনার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। আচার্য শ্রীনিবাস, তাঁর কন্যা হেমলতা ও তাঁর শিষ্য যদুনন্দন থেকে আরম্ভ করে

শ্রীনিবাস প্রভাবিত গোবিন্দদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচনার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

॥ ৬ ॥

সংক্ষেপে বলতে গেলে মানিকবাবুর সমালোচ্য এই গ্রন্থটি বাঁকুড়া সহ পশ্চিম রাঢ়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। চারটি ম্যাপ এবং অজস্র আর্টপ্লেটের ছবি ইতিহাস ও সংস্কৃতি আলোচনার দিক থেকে গ্রন্থটির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

সরকার অথবা ব্যবসায়ী পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষের দ্বারা এমন প্রথম শ্রেণীর গবেষণাকর্ম পুরস্কৃত হবার আশা খুব একটা নেই। কারণ ওসব জায়গায় ধরাধরি ও আদান-প্রদানের রাজত্ব। কিন্তু গবেষণা অথবা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের দ্বারা মানিকবাবুর এই অনন্য কৃতি সম্মানিত না হলে তা হবে একান্ত পরিতাপের বিষয়।

বাঙালীত্বের ভূমিকা

দূরদ্রষ্টা কবি অনেক বছর পূর্বে লিখেছিলেন—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই। আবার তোরা মানুষ হ।" একালে লিখলে হয়ত তিনি লিখতেন—"আবার তোরা বাঙালী হ।"

কারণ বাঙালীরও দেশ গিয়েছে। পূর্বতন দেশের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় যা আছে, তাও না থাকারই সামিল। কারণ পশ্চিমবঙ্গের সুস্থভাবে বাঁচার পথ ঐ রাজ্যের অর্থব্যবস্থাই কেবল অবাঙালীর কবলিত নয়, কলকাতা তো বটেই শিলিগুড়ি, আসানসোল, বর্ধমান, খড়্গপুর প্রমুখ শহর থেকেও বাঙালীদের বসতবাটীর উচ্ছেদ ঘটে চলেছে। আর গ্রামাঞ্চলের অবস্থা? সেই পঞ্চাশ বছর আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছুতার, কামার, কুমোর, মাঝি, জেলে, নাপিত, হাটুরে ইত্যাদির পেশা থেকে বাঙালীর সরে যাবার জন্য যখন আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দিতেন, তার থেকে মন্দ ছাড়া ভালো নয়। শেষ অবধি দোষ বাঙালীর নিজের ছাড়া কারও নয়। তবে আমরা আপাতত দোষ বিচারে বসিনি। তাই যা বলছিলাম—বাঙালী নিজ গৃহে পরবাসী হতে চলেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালীদের মনে মনে একটা আশা জেগেছিল যে, ছেড়ে আসা দুই-তৃতীয়াংশ বুঝি আবার বাঙালীত্বের উৎস হবে। ঐ দেশে আর ফিরে যেতে না পারলেও ওখানকার বাঙালীয়ানার সুধা গৌড়জন আবার নিরবধি পান করতে পারবে। কিন্তু দেখতে না দেখতেই সে আশা ক্ষীণ হতে লাগল। আর শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই আগস্টের রাত্রে ভীষণ এক বিস্ফোরণে তা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশের দেশের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যুগ যুগ ধরে সত্যপীর, ওলাবিবি, শীতলা মা, কালু রায়ের ভজনকারী বাঙালীদের এবার মুজিবের অবর্তমানে 'শুদ্ধ ইস্‌লামী' বানাবার প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে। ওদিকের এক কোটির উপর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের ভাগ্যে কি আছে ঈশ্বরই জানেন। ধর্মনিরপেক্ষতা একালের ব্যাপার নয়, অথবা কেবল গান্ধী, জওহরলাল অথবা মুজিবের কথা নয়—এটা যে বাঙালীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ এই সত্য বাংলাদেশের আজকের শাসকেরা

দেখতে অস্বীকার করছেন। সুতরাং আপাতত পুরবৈয়া বায়ু আর বইবে না। উদয়াচল অবরুদ্ধ।

বাঙালীকে তাই স্বভাবতই প্রবাসকেই স্বদেশ করে নিতে হবে।

সৌভাগ্যবশত স্বাধীনতা আন্দোলন পুষ্টিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ", শেষ অবধি "ভারত আমার জননী আমার…" ইত্যাদি রূপ নিয়েছে। অখিল ভারতীয়ত্ব অবশ্য এখনও বহুলাংশে আবেগ ও যুক্তির স্তরে রয়েছে, বাস্তব জীবনে এর ষোলো আনা রূপায়ণ হয়নি। নানা রাজ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরিতে অগ্রাধিকার অথবা মাতৃভাষায় পড়াশুনার অসুবিধা অবধি এই সত্যের দ্যোতক। তবুও স্বীকার করতেই হবে যে অখিল ভারতীয়ত্বের একটা ভূমিকা তৈরী হয়েছে এবং এ ধীরগতিতে হলেও পুষ্ট হচ্ছে।

তাই প্রশ্ন হচ্ছে যে এই অখিল ভারতীয়ত্বের (প্রবাস বা প্রবাসী ইত্যাদি শব্দ তাই আর ব্যবহার করার অর্থ হয় না) পটভূমিকায় বাঙালীত্বের ভূমিকা কি?

কেবল বারোয়ারী দুর্গাপূজা, কালীপূজা অথবা সরস্বতী পূজা? সামাজিক মিলনের ক্ষেত্র হিসেবে এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল্য থাকলেও ইদানীং আর এ সবে নিছক বাঙালীয়ানা অক্ষুণ্ণ নেই। বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাবে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের ভিন্নভাষাভাষী অধিবাসীরাও এইসব অনুষ্ঠানকে নিজেদের করে নিয়েছেন।

তাহলে এইসব উৎসব উপলক্ষে যেসব যাত্রা, নাটক ও গান-বাজনার আয়োজন হয় তাকেই কি বাঙালীত্বের নিদর্শন বলব? অংশত হয়ত তা বলা যায়, তবে পূর্ণমাত্রায় নয় এই জন্য যে এসব নৈমিত্তিক ব্যাপার—যার আয়ু দুই-দশ দিন। নিত্য বাঙালীত্বের অনুশীলনের মাধ্যম কি?

বলা বাহুল্য একমাত্র ভাষা ও সাহিত্যই বাঙালীত্বের এই প্রাত্যহিক উপাদান।

'আরণ্যকে' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাষা ও সাহিত্যের যোগাযোগ না থাকায় বাঙালী হয়েও বাঙালীত্ব হারানো একটি পরিবারের চিত্র এঁকেছেন। আমি স্বয়ং গয়া ও মুঙ্গের জেলায় এরকম একাধিক পরিবারের সম্পর্কে এসেছি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করার জন্য যাঁদের ছেলে-মেয়েরা আজ শুদ্ধভাবে একটা বাঙলা বাক্য বলতে পারে না। বলা

বাহুল্য এঁদের পক্ষে আর বাঙালী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। প্রাণ-প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে গেলে হৃৎস্পন্দন তো বন্ধ হয়ে যাবেই।

তাই বলছিলাম যে অখিল ভারতীয়ত্বের ভূমিকা সত্ত্বেও বাঙালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বজায় রাখতে হলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের তো বাঙলা শেখাতেই হবে এবং শুধু তাদের জন্যই নয় তাদের মা-বাবাদের জন্যও বছরে দুই-চারখানা বাঙলা বই কিনতে হবে যেমন আমরা চাল-ডাল অথবা কাপড়-চোপড় কিনি। চাল-ডাল যদি দেহের খাদ্য হয়, তবে বাঙলা বই হল সর্বভারতীয় হয়ে যাওয়া বাঙালীদের মনের খোরাক।

বঙ্গসংস্কৃতির প্রতিনিধি

পাঠান-মোগলের যুগ থেকেই 'সুবে বঙ্গাল' হিসেবে বিহার-ওড়িষ্যার সঙ্গে বঙ্গদেশের একটা প্রশাসনিক যোগসূত্র ছিল। এইরকম যোগসূত্র কোচ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজত্বের কারণে আসামের সঙ্গেও। অবশ্য রাজ্যের উত্থান-পতনের সঙ্গে এই যোগসূত্র কখনও ক্ষীণ কখনও প্রবল হয়েছে। তারপর ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে এই যোগাযোগ প্রবল হয়, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বিহার-ওড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তবে প্রশাসনিক দিক থেকে পৃথক হয়ে গেলেও ইংরেজ রাজশক্তির সহায়ক হিসাবে প্রথমে সেই রাজশক্তি যে প্রদেশে শক্তিশালী হয়েছিল সেখানে অর্থাৎ বাঙলাদেশ থেকে শাসকদের সহায়ক সরকারী কর্মচারী এবং উকিল মোক্তার হিসেবে বাঙালীরা প্রতিবেশী রাজ্য-সমূহে ছড়িয়ে পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে নূতন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হিসাবে কখনও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, কখনও বা নিজ অ্যাডভেঞ্চারপ্রবণতার জন্য ডাক্তার, শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক হিসাবেও বাঙালীরা প্রতিবেশী রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন।

প্রথমদিকে যাতায়াতের ব্যবস্থা সুলভ ছিল না বলে কয়েক পুরুষ পরেই প্রতিবেশী প্রদেশে আগত বাঙালীরা কথাবার্তা ও চালচলনে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। কেবল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনাতেই এইরকম [একদা] বাঙালীর চিত্র পাওয়া যায় না, চোখ খুলে দেখলে বিহার ওড়িষ্যা ও আসামের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এমন অনেক বাঙালীর খোঁজ পাওয়া যাবে, যাঁদের পক্ষে এখন ভালো করে বাঙলা বলাও কঠিন। তাঁদের বাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মেয়েরা বৌ হয়ে গেলে প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধায় পড়েন।

কিন্তু বিজ্ঞানের দৌলতে এখন যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র ও বেতার মারফত বাঙলা বই ও পত্রপত্রিকা পাওয়া বা বাঙলা গান ও নাটক শোনা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যের বাঙালীর পক্ষে আর কঠিন নয়। অর্থাৎ আদি বাসভূমি ও তার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এখন আর দুরূহ ব্যাপার নয়। সুতরাং জীবিকার জন্যে খণ্ডিত বঙ্গ ত্যাগ করতে হলেও এবং পুরুষানুক্রমে ভিন্ন প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও বাঙালী থাকার অসুবিধা

নেই। প্রয়োজন শুধু নিজ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা।

বলা বাহুল্য সঙ্কর সংস্কৃতি অথবা সংস্কৃতিবিহীনতা নিজের অথবা অপর কারও কাছেই পাঙ্‌ক্তেয় নয়। ভিন্ন রাজ্যের বাঙালীদের তাই বঙ্গসংস্কৃতি-সচেতন হবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। পূজা ও উৎসব আদি অবশ্যই এর এক অঙ্গ। তবে এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সর্জনাত্মক ভূমিকা অল্প। বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রধান স্তম্ভ বাঙলা ভাষা। এর নিয়মিত ও শুদ্ধ অনুশীলনের ব্যবস্থা বঙ্গের বাইরের বাঙালীদেরই করতে হবে। ভাষাগত সংখ্যালঘু কমিশনের সুপারিশে এর প্রশাসনিক রক্ষাকবচ আছে। কিন্তু প্রশাসনযন্ত্রকে তদনুকূল করার জন্যে সংগঠন ও গঠনমূলক প্রয়াস চাই। দিল্লী ও বোম্বের মত দূর দেশে থেকেও কেরল ও তামিলনাড়ুর অধিবাসীদের ছেলেমেয়েরা যে নিজ নিজ মাতৃভাষা শিখে নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে তার কারণ তাঁদের সংস্কৃতি প্রেম ও সংগঠনী শক্তি। ওঁদের কাছ থেকে বঙ্গভাষীদের শেখার আছে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মা-বাবাদেরও বঙ্গসংস্কৃতিনিষ্ঠ হতে হবে। এর মাধ্যমে বঙ্গসাহিত্য ও এর অনুশীলনের সহজ উপায় একটি করে পাঠাগার। কিছুটা সঙ্ঘশক্তি ও সংগঠন থাকলে সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়েও যে এমন পাঠাগার চালানো যায় তার বহুতর নিদর্শন বিহার-ওড়িষ্যা ও আসামে পাওয়া যাবে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এজাতীয় পাঠাগারের সংখ্যা অনেক কম। উৎসাহীদের জন্যে এদিকে তাই একটা বড় কর্মক্ষেত্র পড়ে আছে। উপযুক্ত সংগঠন গড়ে উঠলে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্যে একটি পত্রিকা এর পরের ধাপ।

বহিরঙ্গের ভিন্নতা বাদ দিলে সব সংস্কৃতির মূলে শেষ অবধি মানবীয় সংস্কৃতি। অর্থাৎ সেবা দয়া মায়া প্রেম করুণা সহানুভূতি প্রমুখ মানবীয় সদ্‌গুণাবলী। বঙ্গসংস্কৃতির অনুশীলন পূর্বোক্ত মানবীয় বিভূতিসমূহ বাদ দিয়ে নয়। প্রাদেশিকতা নয়, পূর্বোক্ত মানবীয় সংস্কৃতির পরিচয় দেবার ফলেই একদা বঙ্গের বাইরের বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। আজও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে যেসব বাঙালীর সম্মান তার মূলেও ঐসব সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলন। এবং এখানে বঙ্গভাষী অথবা ভিন্নভাষাভাষীর মধ্যে পার্থক্য নেই। নেই মিথ্যা উচ্চ সংস্কৃতি গরিমার হুল ফোটানোর প্রয়াস।

খণ্ডিত বঙ্গের বাইরের প্রতিটি বাঙালী এই হিসাবে বঙ্গসংস্কৃতির বেসরকারী প্রতিনিধি। তাঁদের আচরণের উপর নির্ভর করছে বাঙালী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ।

শিল্পায়ন ও বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্ব

চণ্ডীমণ্ডপ-কেন্দ্রিক এবং জমিদার-ব্রাহ্মণ শাসিত বাঙালীর প্রাচীন সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজনৈতিক কর্মীদের হাতে যাওয়া শুরু করল। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে এই গণযুগের সূত্রপাত এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের পর্বতসঙ্কুল অববাহিকা বেয়ে নূতন সামাজিক নেতৃত্বের পূর্ণ প্রকাশ অসহযোগের প্রকাশ্য গণবিদ্রোহে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্বের পালাবদলের যে সূচনা হয় তার আরও দুটি ধারা ছিল। এর একটি হল শিল্পায়ন এবং অপরটি যুদ্ধ। আমাদের আপাত-আলোচনা শিল্পায়নকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল তার বিষয়ে।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাবুরাম ঘোষকে আয়নার কারখানা করার লাইসেন্স দেওয়া হয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে টম ফাট সালকিয়ায় ডিস্টিলারি করেন। ১৮১০-১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন কাগজের কলে এঞ্জিন ব্যবহার করে। কিন্তু এসব ঘটনাকে যথার্থ শিল্পায়নের সূচনা বলা যায় না। এমনকি কলকাতায় প্রথম কলের জাহাজ ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে এলেও তাকে ঠিক শিল্পায়নের সূত্রপাত বলা যায় না। পূর্বোক্ত কলগুলির মত প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজও বড় বেশী হলে বাঙালীর মনে সাহেবদের কল সম্পর্কে একটা সম্ভ্রম-মিশ্রিত কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। কলকাতাসহ বঙ্গদেশে তখনও জমিদার-ব্রাহ্মণদেরই সামাজিক নেতৃত্ব চলছে।

কলকাতার কাছে বাউড়িয়ায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হল। প্রথম পাটকল গড়ে উঠল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রিষড়ায়। প্রথম রেলগাড়ি চলল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত। পরের বছর ৩রা ফেব্রুয়ারী রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইনের দুই পাশের বহুদূর পর্যন্ত গ্রামবাসী দেখল "রেল কম ঝমাঝম্।" সিপাহী বিদ্রোহের বছর ৬ই জুলাই তারিখ থেকে কলকাতায় গ্যাসের বাতি জলতে শুরু করেছে। তারপর একে একে আরও বহু কলকারখানা ভাগীরথীর দুই কূলে লৌহমস্তক সগৌরবে তুলে ধরে

আকাশ কালিমালিপ্ত করা আরম্ভ করেছে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হয়ে শিল্পায়নের গতি জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে দিয়েছে।

শিল্পায়ন বাঙলার প্রাকৃতিক চেহারাতেই পরিবর্তন আনেনি, তার চেয়েও বড় পরিবর্তন এনেছে বাঙলার সমাজ-জীবনের কাঠামোতে। বলা বাহুল্য এই একই কারণে বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্বেও পরিবর্তন ঘটেছে।

শিল্পায়নের প্রথম পূর্বশর্ত হল কলকারখানার যথাসম্ভব কাছে তার কর্মীদের নিবাস। স্বভাবতই এক্ষেত্রে বামুন-কায়েতপাড়া অথবা মুচি-মেথরের পাড়ার কোন অবকাশ নেই। কারখানা-শহরের বাসিন্দাদের পল্লী নির্ধারণ হয় বেতন অথবা পদমর্যাদা অনুসারে। আর প্রতিবেশী হিসাবে থাকতে থাকতে ক্রমশ গড়ে ওঠে সমাজ এবং নূতন সামাজিক নেতৃত্বও। একটা কথা, কল-কারখানা এসে প্রথমেই সনাতন জাতিগত পেশার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান কুলগত বৃত্তি ছেড়ে মসীজীবী এবং এমনকি অব্রাহ্মণের পদধারণ করে চর্মপাদুকার বিক্রেতা হয়েছে—এ কেবল শিল্পায়নেরই পরিণাম।

প্রথমদিকে যদিও বা কলকারখানার কর্মী বাঙালীদের গ্রামের সঙ্গে এবং সেই কারণে সনাতন সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল, ক্রমশ প্রাকৃতিক কারণেই তা ছিন্ন হয়ে গেল। তখন কারখানা-শহরের সমাজই একমাত্র সমাজ হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া কারখানা-শহরের সমাজও স্থাণু হয়ে রইল না। শিল্পায়নের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলকে আক্রমণ করে প্রভাবিত করল। আজকে তাই পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ-সমাজ একেবারেই কোণঠাসা। কলকাতা, আসানসোল-দুর্গাপুর এবং খড়্গপুরের শিল্পকেন্দ্রের সমাজ বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে পশ্চিম রাঢ় পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলকে পরিচালিত ও প্রভাবিত করছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান সমাজ বহু পূর্বেই গ্রাম-বাঙলার সমাজের সঙ্গে অসম্পৃক্ত দ্বীপের মত ছিল, বর্তমানে ক্রমবর্ধমান শিলিগুড়ির সমাজ উত্তরবঙ্গের বকেয়া গ্রাম-সমাজের কাছে অপ্রতিরোধ্য চ্যালেঞ্জস্বরূপ মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

এবার এই কারখানা-সমাজের (বলা বাহুল্য চা-বাগান প্রমুখ শিল্পকেন্দ্র-সমাজও এর মধ্যে পড়ে) স্তর-বিন্যাস লক্ষ্য করা যাক।

এর শিখরদেশে অবস্থান পুঁজির বিনিয়োগকারী মালিকগোষ্ঠীর, স্বভাবতই সংখ্যায় যাঁরা স্বল্প। আর এর ভিত্তি-ভূমিতে অবস্থান শ্রমিকবর্গের, যাঁরা সংখ্যাগুরু। আর দুই-এর মাঝামাঝি রয়েছেন বড়বাবু, টেকনোক্রাট ও বুরোক্রাট সম্প্রদায়—যাঁদের উপর ব্যবস্থাপনার ভার। ইদানীং সরকারী

শিল্প-ব্যবসায়ের প্রবর্তন হওয়ায় পৃথকভাবে মালিকগোষ্ঠীকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এর বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হওয়ায় ক্ষমতা নিছক পুঁজিনিয়োগকারী মালিকদের বদলে টেকনোক্রাট-বুরোক্রাটদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। তাছাড়া পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী গড়ে সাধারণ মানুষের টাকায় কলকারখানা চালানোর প্রথা শুরু হওয়ায় ঐজাতীয় প্রতিষ্ঠানেও শেয়ারহোল্ডাররূপী মালিকরা গৌণ হয়ে ম্যানেজিং এজেন্ট এবং বোর্ড অফ ডাইরেক্টারের সদস্যরূপী একদল আর্থিক ক্ষেত্রের ম্যানেজারদের হাতে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব চলে গিয়েছিল।

যাই হোক, বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে যদিও কারখানা-শহরসমূহের সমাজ পূর্বোক্ত ত্রিস্তরে বিন্যস্ত ছিল, বর্তমানে অন্তত সামাজিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে পুঁজির বিনিয়োগকারীদের প্রভাব সেইসব জায়গাতেই মাত্র রয়েছে, যেখানে মালিকেরা টেকনোক্রাট ও বুরোক্রাটদের বিদ্যা এবং কর্মও আয়ত্ত করেছেন। সুতরাং বর্তমান কারখানা-শহরসমূহের সমাজ প্রধানত দুই স্তরে বিভক্ত বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

প্রথমদিকে (মালিকদের অবস্থার অবক্ষয়ের পর) কারখানা-শহরসমূহের সমাজের মধ্যমণি ছিলেন টেকনোক্রাট-বুরোক্রাটরূপী এইসব ম্যানেজারেরা। এঁরাই ছিলেন নূতন জনপদের জমিদার ও ব্রাহ্মণ। বলা বাহুল্য সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের (বিশেষ করে পুলিশ) সমর্থনও এঁদের পিছনে থাকায় এঁরা প্রায় সর্বেসর্বা ছিলেন। প্রতিদানে অবশ্য এঁরাও সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের ম্যানেজারদের (মার্কসবাদী উভয়ের শ্রেণীচরিত্রের অভিন্নতা আবিষ্কার করতে পারেন) সহায়তা করতেন।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে মৃদুভাবে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রবলভাবে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন কারখানা-শহরের সমাজের এই নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাল। মাথা-পিছু ভোটের শক্তিতে গঠিত ও স্বাধীনতা-উত্তর সরকারকে স্বভাবতই শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তিকে স্বীকার করে নিতে হল এবং বামপন্থী অভিধাযুক্ত পরিচিত সরকারসমূহ প্রয়োজনে আরও দু-এক পা অগ্রসর হয়ে শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনকে জঙ্গী করে তুলে অধিকতর মর্যাদা দিলেন। সুতরাং কলকারখানা পরিচালনের ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনসমূহের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কারখানা-শহরসমূহের সমাজে শ্রমিক নেতাদের নেতৃত্বের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

তবে শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক নেতারা কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য এলাকার মত পশ্চিমবঙ্গেও কোন স্বয়ম্ভু সত্তা নন। প্রথমাবধি তাঁরা রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় পুষ্ট। আর বর্তমানে তো তাবৎ রাজনৈতিক দলের পৃথক পৃথক শ্রমিক ফ্রন্ট বা সংগঠন আছে এবং আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন যতটা না নিছক ট্রেড ইউনিয়ন (অর্থাৎ শ্রমিকদের আর্থিক) স্বার্থে চালিত হয়, তার চেয়ে বেশী চলে রাজনৈতিক দলের মুখ চেয়ে। একই শ্রমিক সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ ও কার্যপদ্ধতিতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মাঝে মাঝে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তার মূলে থাকে আর কিছু নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন।

স্নতরাং অর্থব্যবস্থার (উৎপাদন-ব্যবস্থার) পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনের কারণ হয়ে শেষ অবধি সামাজিক নেতৃত্ব তুলে দেয় রাজনৈতিক দলের হাতে।

এই পরিবর্তন কেবল কারখানা (অথবা চা-বাগান) শহরটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, গোটা পশ্চিমবঙ্গই আজ প্রায় একটি বড় কারখানা-শহর অথবা তার শহরতলী। স্নতরাং সামাজিক নেতৃত্বের এই পালাবদল-পর্ব শহরতলীস্বরূপ গ্রামগুলিকেও প্রভাবিত করে।

কারখানা শহরসমূহ ও তার উপকণ্ঠের সামাজিক পরিস্থিতির একটু গভীর বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে তার ভিত্তি গড়ে ওঠে বিত্তকৌলীন্যের উপর। এমনিতে অবশ্য পুঁজিবাদের স্বধর্মই এই এবং পুঁজিবাদকে আশ্রয় করেই কলকারখানার সৃষ্টি। কিন্তু কলকারখানাসমূহের জাতীয়করণ অথবা তার পরিচালনায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পূর্ণ বা আংশিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানগুলির—অন্তত সামাজিক ক্ষেত্রে এই পুঁজিবাদী চারিত্রধর্মের অবক্ষয়ের কোন সূচনা দেখা দিচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে এক-আধজন শ্রমিকনেতা ও কর্মীর জীবনচর্যায় এর ব্যতিক্রম দেখা দিলেও তাঁদের আশেপাশে অথবা এমনকি তাঁদের পরিবারেই সমাজবাদী অথবা কাঞ্চনকৌলীন্যের অতিরিক্ত অপর কোন সংস্কৃতি অথবা মূল্যবোধের সৃষ্টি হচ্ছে না। হয়ত বা সমাজের আমূল পরিবর্তন ছাড়া বিত্তকৌলীন্যের সমাজে পূর্বোক্ত ধরণে দু-চারটি নূতন মূল্যবোধের দ্বীপ সৃষ্টি করা যায় না।

তবে সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়।

কথা হচ্ছিল বিত্তকৌলীন্য অথবা অর্থনির্ভর সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে। এর বৈশিষ্ট্য হল—জাতি (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি) অথবা বয়স এমনকি চরিত্রের

গুণপনার বদলে সামাজিক নেতৃত্বের জন্য কেবল বিত্তের পরিমাণই মানদণ্ড হওয়া। পূর্বেও জমিদার মহাশয় গ্রামের অনুষ্ঠানাদির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে নেতৃত্ব ছিল প্রধানত শোভাবর্ধনের জন্য। এখনকার সামাজিক নেতাদের মত তাঁদের নেতৃত্ব এমনভাবে (একটা রাজনৈতিক শব্দ ব্যবহার করার প্রলোভন হচ্ছে) সর্বাত্মক ছিল না। আজকের ক্লাব-সঙ্ঘের এইসব সামাজিক নেতারাই স্থির করেন যে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কোন্ সাহিত্যিককে, 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে' কোন্ আর্টিস্টকে এবং পূজার উদ্বোধন করতে কোন্ নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখি এইসব ক্লাব-সঙ্ঘে যেসব করিৎকর্মা তরুণদের দেখা যায় এগুলির সামাজিক নেতা বলতে তাদের থেকে ভিন্ন, অধিকাংশ সময়ে অন্তরালবর্তী আরও প্রবীণ কাঞ্চনমূল্যে নৈকষ্যকুলীন নেতাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এইসব দৃষ্টিগোচর তরুণদের দল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিছিলের জনতা, নেতার নির্দেশে যেসব স্লোগান দিচ্ছেন, তার অধিকাংশের অর্থও জানেন না।

অর্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্বন্ধ কুক্কুট ও তার ডিমের মত। একটি থেকে অপরটির শুধু সৃষ্টি নয়—কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে ন্যায়শাস্ত্রের এ তর্কও মীমাংসার অতীত। তাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিত্তকৌলীন্য রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। এই কারণেই তো লাখ টাকার কালীপূজার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের দেখা পাওয়া এত সহজ।

শিল্পায়ন ব্যাপক হবার ফলে সনাতন ঘরগৃহস্থালির চেহারাও পাল্টে গেল। অবশ্য সামাজিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের দিক থেকে এর যে অংশ সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ, তা হল—নারীদের কেবল ঘরগৃহস্থালি ও সন্তানপালনের বদলে কল-কারখানা ও অফিস-আদালতে যোগদান। শিল্পায়নের ফলে এমনটা হয়নি, শিল্পায়ন আথিক সমস্যায় পীড়িত বাঙালী সমাজের নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার সুযোগ করে দিয়েছে—এমন অভিমতও ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু তাতেও মূল অবস্থার পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ শিল্পায়নের পর কেবল ঘরকন্নাই বাঙালী মেয়েদের জীবনে একমেব হয়ে রইল না। চাকুরির মাধ্যমে তাঁরা আর্থিক স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ায় পারিবারিক এবং সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও পুনর্বিন্যাস ঘটল। আর এর পরিণাম সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও পড়তে বাধ্য। কিন্তু বঙ্গললনার আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য স্বয়ং এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনার বিষয় বলে এখানে কেবল তার প্রতি ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হতে হবে।

বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্ব—আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতি

•বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্বের পালাবদলের মূলে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষবাহিত রাজনীতি, শ্রমশিল্পের প্রসার ও তজ্জনিত নাগরিক জীবন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর এবং দেশবিভাগের ফলস্বরূপ উদ্বাস্তু সমস্যা প্রমুখ অনেক কারণ। তবে এর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী হল রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা ও প্রশাসনের যুগ্ম সহায়তায় যা আজ বাঙালীসমাজে অদ্বিতীয় বলশালী শক্তিরূপে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

আরও একটি কারণে রাজনীতি আজকে পশ্চিমবঙ্গে—সমগ্র ভারতবর্ষসহ আধুনিক বিশ্বের সর্বত্র—সর্বশক্তিমান রূপ ধারণ করতে চলেছে। এ হল কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা।

রাষ্ট্ররূপী যন্ত্রের সূত্রপাত কেমন করে হল এ সম্বন্ধে কোন সর্বজনস্বীকৃত তথ্য এখনও আমাদের জানা না থাকলেও একথা মোটামুটি বিশ্বাস করা যায় এটা দানা বেঁধে ওঠে "দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের" জন্যই। অর্থাৎ যাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বলা হয়, প্রধানত তারই জন্য। কিন্তু নানাধরণের সমাজবাদী রাষ্ট্রদর্শন ও আন্দোলন এসে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে এই দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাল। সমাজবাদী নানা মুনির নানা মত সত্ত্বেও একথা বলা অন্যায় হবে না যে তাঁদের সামনে লক্ষ্য ছিল দরিদ্র নিপীড়িত নিগৃহীত অর্থাৎ এক কথায় সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য কিছু করা, 'লিজা ফেয়ার' নীতি গ্রহণ করে কেবল রেফারীর ভূমিকা অবলম্বন করা নয়। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক রাষ্ট্র তা সে সমাজবাদী হোক অথবা গণতন্ত্রী কিংবা পুঁজিবাদী নামে খ্যাত হোক, দেশের অনগ্রসর অংশের জন্য কোন না কোন রকমের কল্যাণমূলক কাজে তাকে নামতেই হবে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষ-সহ পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ সর্বাত্মক রাষ্ট্রের জয়জয়কার।

আজকে সরকারের হাতে তাই শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে আরম্ভ করে ব্যাঙ্ক, ব্যবসা, কারখানা ইত্যাদি জন্ম থেকে মৃত্যু (একেবারে শব্দার্থে, কারণ ভূমিষ্ঠ হবার হাসপাতাল থেকে নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হবার শ্মশানঘাট) পর্যন্ত যাবতীয়

ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব। আর সরকারের উপর কর্তৃত্বের চাবিকাঠি রাজনীতির কাছে। রূপকথার রাজপুত্র রাক্ষসদের প্রাণ যে ভোমরার মধ্যে ছিল তাকে করতলগত করে তা-বড় তা-বড় রাক্ষসদের শায়েস্তা করেছিল। আর আজকের রাজনীতি ধুরন্ধরেরাও রাষ্ট্রযন্ত্রটির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে জনজীবনের সবকিছুর হর্তা কর্তা বিধাতা হয়ে বসেছেন। আজকের পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়।

অথচ গণতন্ত্র কেবল প্রাপ্তবয়স্ক ভোটের আধারে নির্বাচিত অথবা লোকসভা-বিধানসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা নয়। এর মূল কথা হল স্বাধীনতা—সর্বস্তরে ব্যাপ্ত স্বাধীনতা। অবশ্য জনসাধারণের এই স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারের অনুমতি নয়, একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং কেবল অর্থব্যবস্থা, কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অথবা ব্যাঙ্ক-বীমাই নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজসেবা এবং এমনকি মন্দির ও তীর্থ-স্থানগুলির উপরেও সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আদৌ সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার নিদর্শন নয়। সমাজের তাবৎ কার্যকলাপের নেতৃত্ব ও পরিচালন-ব্যবস্থা থাকবে সরকারের (অর্থাৎ মুষ্টিমেয় রাজনীতিবিদ্ ও আমলাদের) হাতে এবং সে সমাজকে গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন আখ্যা দেওয়া যাবে—এমন কোন অসম্ভব কল্পনা যেন আমরা মনে ঠাঁই না দিই। সমাজের নেতৃত্ব ও তার কর্তৃত্ব এর ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়লে, সে সমাজ স্বাধীন বা গণতান্ত্রিক হতে পারে না অর্থাৎ যা চাই তা হল আজকের মত এককেন্দ্রিক সমাজ নয়, বহুকেন্দ্রিক সামাজিক নেতৃত্ব—আধুনিক রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে প্লুরালিস্ট সমাজ বলেন।

আর আজকের এই যে এক অর্থাৎ রাজনীতিকেন্দ্রিক সমাজ, এর নেতা কারা? স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে রাজনীতি দেশসেবারূপে পরিচিত ছিল এবং দেশের নেতারাও মোটামুটি সে ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের চারিত্রধর্মেও গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক নেতৃত্ব মোটামুটি কেরিয়ারিজম ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কোন দপ্তরের নিম্নপদের কর্মচারী হন ভবিষ্যতে বড়বাবুর আসন অলঙ্কৃত করার জন্য, রাজনৈতিক দলেও কর্মীরা আসে ধাপে ধাপে সম্পাদক-সভাপতি এবং তারপর বিধানসভা-লোকসভার সদস্য ও মন্ত্রী হবার জন্য। আয়ারাম-গয়ারামদের ভূমিকার কথা বাদ দিলে এই কেরিয়ারিজমকে দোষও দেওয়া যায় না। যে-কোন কাজেই মানুষ স্বীকৃতি ও উন্নতি তো চাইবেই।

কয়জন আর গীতায় উক্ত অনাসক্ত কর্মে সন্তুষ্ট থাকতে পারে ?

বলা বাহুল্য রাজনীতির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত স্বীকৃতি ও উন্নতির অর্থ হল আরও টাকা এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। রাজনীতি থেকে তাই দেশসেবার মানসিকতা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে টাকা ও ক্ষমতার মানসিকতা এসেছে। এই কারণে রাজনীতি থেকে ভদ্র-মধ্যবিত্তদের নেতৃত্ব চলে গিয়ে অ্যাডভেঞ্চারিস্টদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, টাকা ও ক্ষমতালোভের অন্যতম কারণ এই মানসিক পরিবর্তন।

বিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে এইভাবে রাজনৈতিক দলসমূহে যাঁরা স্বেচ্ছাসেবক-রূপে যোগদান করেছিলেন সিনিয়রিটির নিয়মানুযায়ী তাঁরা এখন রাজনৈতিক নেতৃত্বে কাঠামোর মধ্যভাগে তো বটেই, কেউ কেউ শিখরদেশেও পৌঁছে গেছেন। শীঘ্রই 'সব লাল হো জায়েগা'।

সুতরাং এই রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে সামাজিক নেতৃত্বও চলে যাওয়া আদৌ প্রগতি নয়, বরং অধোগতি—একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এখনই এই সামাজিক নেতৃত্বের পালাবদলের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ালে অদূর ভবিষ্যতে বোধহয় আর সে সুযোগ পাওয়াও যাবে না। হিটলারের 'কালো শার্ট' মস্তানদের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়িয়ে সংস্কৃতিগর্বী জার্মান জাতি যে মহা ভুল করেছিল, তার উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে—বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

সমাজের প্রাণভোমরা রাজনীতি-ধুরন্ধরদের হাতে প্রায় চলেই গেছে। তবু এরই মধ্যে যাঁরা রাজনীতির এই সর্বগ্রাসী এবং সর্বনাশী ভূমিকার বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করতে পারেন, তাঁরা হলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এঁদের মধ্যেও ঘুণ ধরেছে। ভয় এবং লোভের কারণে এঁদের মধ্যে অনেকেরই 'সেই একটি প্রতিভা নষ্ট' (মিল্টনের On His Blindness স্মরণ করুন)। তবু গোষ্ঠী হিসাবে এঁরাই পারেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাত থেকে সমাজজীবনকে মুক্ত করে এক বহুমুখী সামাজিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জনমানসকে প্রস্তুত করতে।

আর কিছু না হোক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা-সমাজসেবা প্রভৃতি রাজনীতি বহির্ভূত বিষয়ে ফতোয়া জারী করতে না দেওয়া হয়। ফতোয়া অবশ্য তাঁরা জারী করবেন, যতদিন সেই ফতোয়ায় কান দেবার মত মানুষ থাকবে। প্রয়োজন সেইসব ফতোয়াকে উপেক্ষা করে তাঁদের ফতোয়া জারী করার মানসিকতার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটতে দেওয়া। প্রয়োজন

এইসব ক্ষেত্রের কর্মীদের উপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ছড়ি ঘোরাবার প্রবণতাকে বন্ধ করা।

এর অন্যতম বাস্তব পন্থা হল রাজনীতিবিদদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা সমাজসেবাসহ বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শন-ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ের অনুষ্ঠান এবং সভা-সমিতিতে মধ্যমণির স্থান না দেওয়া এবং তাঁদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বিতরণের সুযোগ বন্ধ করা। পূর্বোক্ত রাজনীতির সম্বন্ধবর্জিত বিষয়ের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা সাধারণত কিঞ্চিৎ আর্থিক লোভে অথবা সংবাদপত্রে নাম প্রচারিত হবার মোহে রাজনৈতিক অর্থাৎ সরকারী নেতাদের দ্বারস্থ হন। এই সামান্য দুর্বলতার জন্য সমাজ এবং সমগ্র সামাজিক কাঠামোর কী প্রচণ্ড ক্ষতি তাঁরা করছেন সেকথা তাঁরা বিস্মৃত হন।

বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম সাংবাদিকদেরও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদপত্রে রাজনীতি-ধুরন্ধরদের এত প্রাধান্য দেবারও কারণ নেই। রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের আবোল-তাবোল ছাপার জন্য সংবাদপত্রে স্থান থাকে কিন্তু সমাজ-সেবার অজস্র নিদর্শন, মানবীয় গুণাবলীর আদর্শ প্রকাশ—পরার্থে আত্মত্যাগের ঘটনার কথা প্রকাশিত করে আর সবাইকে উদ্বুদ্ধ করার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে তাঁদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। এ ব্যাপারের মূলে মালিকদের নীতি অথবা হস্তক্ষেপের বদলে সাংবাদিকদের অভ্যাসের দাসত্ব ও চিন্তার জড়তাই অধিকতর ক্রিয়াশীল বলে আশঙ্কা হয়।

বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্বের এক যুগসন্ধিক্ষণ বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধ। বাঙালী বুদ্ধিজীবী এসময়ে কি ভূমিকা নেন তার উপরই আগামী শতাব্দীর বাঙালীর সামাজিক নেতৃত্ব এবং সেই কারণে সামাজিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আজকের পশ্চিমবঙ্গ ও আগামীকালের ভাবনা

আজকের অর্থাৎ ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা কি—এই প্রশ্ন উঠলে সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমরা বোধহয় এখনই জবাব দেব এবং তা হল মূল্যবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা। প্রথমটি নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব না কারণ এটি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। তবে সামান্যভাবে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত করব—কেননা দ্বিতীয় সমস্যাটির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। যে-কোন উন্নয়নশীল দেশে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের ক্রয়শক্তির একাংশকে বর্তমান ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা থেকে নিরস্ত রাখতেই হয় এবং তার জন্য কিছুটা মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য। কিন্তু ভারতের মূল্যবৃদ্ধি অভাবনীয় এবং তার মূলে রয়েছে একটানা ঘাটতি বাজেট, কোটি কোটি টাকার সরকারী ব্যয়, কালো টাকার দোর্দণ্ড প্রতাপ ইত্যাদি। এ সমস্যার প্রতিবিধানের ক্ষমতা একা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

তবে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে একথা খাটে না, কারণ এর সমাধানের আত্যন্ত দায়িত্ব এই রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সঠিক সংখ্যা কত এ সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও এই সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের কাছাকাছি বললে সত্যের অপলাপ হবে না এবং এর ভিতর আট থেকে দশ লক্ষ হল শিক্ষিত বেকার।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় বেকার ভাতা দেবার কথা উঠেছিল এবং বর্তমান সরকার চাকরি দেবার কথা বহুবার ঘোষণা করেছেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থায় (এবং সম্ভব-অসম্ভব যত কেন্দ্রীয় সাহায্যই পাওয়া যাক না কেন) সব বেকারকে দৈনিক ৫০ পয়সা বেকার ভাতা দেওয়াও এক অসম্ভব কল্পনা। তাই এ প্রস্তাবকে রাজনৈতিক স্টাণ্টের বেশী গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। সব বেকারকে ভাতা দেবার প্রবক্তা নূতন সরকার প্রশাসনযন্ত্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব পাবার পর কত জনকে চাকুরী দিয়েছেন—এ এক সঙ্গত প্রশ্ন হলেও তা এখনকার মত মুলতুবী রেখে দেখা যাক আরও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ বাঞ্ছনীয় কিনা। সরকারী কর্মচারীদের মাইনে ও ভাতা দিতে হয় জনসাধারণ প্রদত্ত রাজস্ব

থেকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীর বেতন-ভাতার জন্য আদায়ীকৃত রাজস্বের বেশ মোটা একটা অংশ (সম্ভবত অর্ধেকেরও বেশী) খরচ হয়ে যায়। আরও সরকারী কর্মচারী নিয়োগের অর্থ আরও ব্যয়, তার অর্থ উন্নয়নমূলক কাজ বাদ দিয়ে অথবা নূতন করে চাপিয়ে এই অর্থের সংস্থান। অর্থাৎ আরও মূল্যবৃদ্ধি। আর সরকারী দপ্তরের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে তাঁরা জানেন যে এমনিতেই সব দপ্তরে কতটুকু কাজ হয় এবং কী পরিমাণ বাড়তি কর্মচারী রয়েছেন। সরকারী দপ্তরগুলিতে আরও কর্মচারী নিয়োগ করলে পার্কিনসনের বিখ্যাত ল' অনুসারে কাজ কমবে ছাড়া বাড়বে না।

অতএব পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে উৎপাদনমূলক কর্মের সংস্থান করতে হবে। উৎপাদনমূলক অর্থাৎ যে কাজ করে মূলধনী (Capital) অথবা ভোগ্য (Consumer) পণ্য উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে তাই স্বভাবতই কলকারখানার কথা এসে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের অন্যতম শিল্পোন্নত রাজ্য। কিন্তু এখানকার সব কল-কারখানায় নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে আট লক্ষের (এর ৬০% আবার অবাঙালী) বেশী নয়। এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে বিগত কয়েক বৎসর এই সংখ্যা বিশেষ বাড়েনি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও ও আধুনিকীকরণ, শ্রমিক-মালিক বিবাদ, বিনিয়োগের আবহাওয়া তৈরী ইত্যাদি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে (ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়) তবুও বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা এ রাজ্যে প্রতি বছর যে নূতন ছয় লক্ষ হারে কর্মপ্রার্থীর সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সবার কর্মসংস্থান হওয়া অসম্ভব।

এই অবস্থায় কৃষির কর্মসংস্থানের ক্ষমতার কথা বিচার করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিযোগ্য জমি গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ভাগ করলে ৩৬ শতকের বেশী কারও ভাগে জুটবে না। এ জমি খুবই কম হলেও সেচ এবং উন্নত ধরণের বীজ ও সার ইত্যাদির ব্যবস্থা করলে কৃষিই গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য বেকারকে কাজ দিতে পারে। এছাড়া সেচের ব্যবস্থা করা, পাম্প উৎপাদন ও মেরামত, সার ও উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদন, বিক্রী ও তার পরিবহণ এবং কৃষিজাত পণ্য বিপণনের দ্বারাও অনেকের অন্নসংস্থান হতে পারে। কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর আর একটি লাভ আছে। বর্তমানে খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে ডাল, তৈলবীজ এবং এমনকি ভাতে খাবার লেবু কলা বা ডিমের মত জিনিসেও এ

রাজ্য স্বয়ম্ভর নয়। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়লে চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুসারে এসবের দাম কিছুটা কমার সম্ভাবনা।

তবে কৃষির উন্নতি দীর্ঘমেয়াদী ও যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গে সেচের ব্যবস্থা আছে মাত্র শতকরা দশ ভাগ জমিতে, যার এক ক্ষুদ্রাংশে (৩%) আছে দোফসলী চাষের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ শতকরা আট দশ ভাগের বেশী গ্রামে যায়নি এবং বিদ্যুতের স্থায়ী অভাবের ফলে শিল্পাঞ্চলেই যখন উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে তখন দীর্ঘ দিনের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে সেচ বা যন্ত্রশিল্পের জন্য খুব বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। এমত অবস্থায় অবিলম্বে গ্রামের বেকার ও আংশিক বেকারদের কাজ দিতে হলে কুটিরশিল্প ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্তমান অবস্থাতেই নয়, এখনও দীর্ঘকাল কৃষিকর্মের পর গ্রামবাসীদের যে বাধ্যতামূলক অবকাশ থাকে সেই সময়ে কিছু উৎপাদনমূলক কর্মসংস্থানের জন্য কুটিরশিল্পই একমাত্র ভরসাস্বরূপ থাকবে। কুটিরশিল্পের নীতি হবে গ্রামের কাঁচামালকে গ্রামবাসীর বাধ্যতামূলক বেকারত্বের সময়কে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর প্রয়োজনীয় ভোগ্য উপকরণ উৎপাদন করা। এই নীতিকে সামনে রেখে যে-কোন ধরণের প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্র কুটিরশিল্পে প্রবর্তন করা যেতে পারে। এবং প্রয়োজনে ডিজেল বা বিদ্যুৎ শক্তিরও সহায়তা নেওয়া হবে তবে সরকারকে একটি বিষয়ে সংরক্ষণ দিতে হবে এবং তা হল এই যে জাতীয় স্বার্থে যে যে পণ্য কুটিরশিল্পে উৎপাদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাদের বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে উৎপাদন করতে দেওয়া হবে না। কারণ মানুষের পেশী অথবা ছোটখাট যন্ত্রের পক্ষে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয় এবং এজাতীয় প্রতিযোগিতায় নেমে দেশের সীমিত সম্পদের (resource) অপচয় করাও অযৌক্তিক।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বেকার, আংশিক বেকার ও যাঁরা লাভজনকভাবে কর্মে নিযুক্ত নন তাঁদের জন্য কুটিরশিল্পের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দারিদ্র্য যে কি ভয়ঙ্কর তা এ রাজ্যের শতকরা সত্তর ভাগ অধিবাসী দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে (অর্থাৎ মাসে যারা কুড়ি টাকা নিজের জন্য ব্যয় করতে পারেন না) বললেও স্পষ্ট বোঝা যাবে না। এ পরিসংখ্যান অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। যাঁরা চোখ মেলে আমাদের চারপাশের কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থা, ফেরিওয়ালা, মুটে, ছোট দোকানী অথবা ধোপা-নাপিতের মত বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের হাঁড়ির হালচাল জানতে আগ্রহী, তাঁরা

জানেন যে চৌরঙ্গী, গড়িয়াহাট, নিউ-আলিপুর অথবা আসানসোল-দুর্গাপুরই পশ্চিমবাঙলা নয়। শহর কলকাতায় শুধু রেজিস্টার্ড বস্তির সংখ্যা তিন হাজার যেখানে পনের লক্ষ নরনারী শিশু (কলকাতায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০%) পশুর জীবন যাপন করেন এবং যেখানে বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাকে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেবার জন্য বিপ্লবের বারুদ তিলে তিলে সংগৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রুর (Ruhr) নিওন আলোয় ঝলমল দুর্গাপুরের মাত্র দশ মাইলের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার শহরজোড়া, হাট-আশুরিয়ার মত গ্রামের ক্ষেতমজুররা বছরে ১৩৫·৬০ টাকার বেশী রোজগার করতে পারেন না (তদানীন্তন শ্রম কমিশনার শ্রীদেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন, জুন ১৯৭২। তাঁর মতে এরা যে টিঁকে আছে সেটাই এক পরমাশ্চর্য ঘটনা)। বাঁকুড়া জেলার সতেরোটি মৌজায় আর একটি সমীক্ষা অনুসারে (শ্রম দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার ডঃ পারুল চক্রবর্তী) এঁদের বাৎসরিক আয় ১১৯·৯৬ টাকা মাত্র। (দৈনিক যুগান্তর, সম্পাদকীয়, ১১-৭-১৯৭৩)। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামবাসীদের জন্য অধিকতর কর্মসংস্থান করে আমরা যদি তাদের গ্রামেই ধরে রাখতে না পারি তবে পঙ্গপালের মত ঐ বুভুক্ষু ও অর্ধউলঙ্গ নর-নারীরা এসে ১৩৫০ সনের মত কলকাতা ও দুর্গাপুর-আসানসোলের মত নগরীর পথঘাট ছেয়ে ফেলবে। চৌরঙ্গী ও গড়িয়াহাটের মত সমৃদ্ধ এলাকায় এখনই গ্রাম থেকে আগত এই জাতীয় মানুষদের দেখা যায়। চিরকাল এরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে করুণ কণ্ঠে ভিক্ষা চাইবে না। এই জনস্রোত যে শুধু সি. এম. ডি এ.-র নগর-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বানচাল করে কলকাতাকে বসবাসের অযোগ্য করে দেবে তাই নয়, এরাই হবে নগর সভ্যতাকে ধ্বংস করার বিপ্লব স্ফুলিঙ্গ। বর্বর হুনেদের আক্রমণে সমৃদ্ধ রোমান সভ্যতা বিধ্বস্ত হয়েছিল—এ তো ইতিহাসেরই সাক্ষ্য।

॥ ২ ॥

কিন্তু এ পর্যন্ত যা বলা হল তা আসলে মূল বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র। কারণ পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলা হয়নি। বঙ্গদেশ খণ্ডিত হবার পূর্ব থেকেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে একালের শ্রীযুক্ত পান্নালাল দাশগুপ্তের মত বাঙালীর কল্যাণকামী অনেকেই বাঙালীর এই রোগ

নির্ণয় করেছেন। সমস্যা হল রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে। সংক্ষেপে বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা বা নেতৃত্বের সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য একটা ছোট উদাহরণই যথেষ্ট। উৎপাদনমূলক শ্রমের মাধ্যমে বাঙালীর বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থাকেও উৎপাদনমূলক করা উচিত—এটা বুঝতে খুব একটা যুক্তিজাল বিস্তার করতে হয় না। কারণ বর্তমানে যখন পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরের শতকরা হার ত্রিশ জনের মত তখনই প্রতি বৎসর উচ্চতর মাধ্যমিক ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেয় বছরে প্রায় আড়াই লক্ষ ছাত্রছাত্রী। যদি এর শতকরা চল্লিশ ভাগও উত্তীর্ণ হয় (অনুত্তীর্ণের হার এরূপ হওয়া আবার শিক্ষাব্যবস্থার দেউলিয়া অবস্থা এবং জাতীয় সম্পদ ও যুবশক্তির প্রবল অপচয়ের নিদর্শন) এবং তার অর্ধেক যদি আবার উচ্চতর শিক্ষা বা প্রযুক্তিবিদ্যা শেখার জন্য যায় অথবা মেয়েরা বিয়ে করে সংসারী হয় তাহলে কেবল স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বছরে হয় ৫০ হাজার জন। এছাড়া গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এ রাজ্যে বছরে কোন্ না হাজার পনেরো জন হবেন? এবং এই ৬৫ হাজার জন কর্মপ্রার্থী প্রচলিত শিক্ষার জন্য পাকা ছাদের তলায় পাখার নীচে বসে হোয়াইট কলার জব বা বাবুদের কাজ ছাড়া অপর কিছু করার পক্ষে অনুপযুক্ত। দীর্ঘ দিন রোদে-জলে চাষের কাজ করার অভ্যাস না থাকায় এবং কল-কারখানায় প্রয়োজনীয় কঠিন পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত না হওয়ায় এঁরা আর কোন ধরণের কাজের পক্ষে উপযুক্ত নন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী, সমাজবাদী অথবা প্রচণ্ডতম সাম্যবাদী যাই হোক না কেন বছরে এতগুলি বাবুদের কাজ সৃষ্টি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। আর এ রাজ্যের সব শিশুর জন্য যখন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে (এটা অবশ্যই করা উচিত। কারণ অশিক্ষা ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না) তখন আরও কত গুণ বেশী যুবক-যুবতী বাবুদের কাজ চাইবেন! অতএব শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টে সবাইকে শিক্ষিত চাষী বা মজুর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই সহজ সরল কথাটা মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত কত নেতাই তো বললেন, কত কমিটি-কমিশনের সুপারিশ পাওয়া গেল এর সপক্ষে। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থের প্রবল চাপে ঐ অচলায়তনে কোন চিড় পর্যন্ত ধরল না।

এমনকি বাঘা বাঘা বিপ্লবী নামে আত্মপরিচয়দানকারীরাও এক্ষেত্রে

শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। এঁদের কোনজন বললেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বিনা ব্যয়ে দেওয়া হোক। অর্থাৎ এই বিকৃত শিক্ষাই চলুক। কেউবা স্কুল কলেজের লাইব্রেরী পোড়ালেন, পাখা-চেয়ার ভাঙলেন ও বোমা ফাটিয়ে দুই-একবার পরীক্ষা ভণ্ডুল করলেন। কিন্তু এঁরা কেউই বিকল্প কোন শিক্ষাব্যবস্থা যাকে তাঁরা আদর্শ মনে করেন তার নিদর্শন পেশ করলেন না। নিজেদের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের অনুগামী বলে যাঁরা দাবি করেন, তাঁরা বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক সূত্রটুকু খেয়াল রাখলেন না যে, প্রকৃতিতে শূন্যতার স্থান নেই—বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে না তুললে প্রচলিত ব্যবস্থাই চলবে, তৃষ্ণার্ত মানুষ পরিষ্কার জল না পেলে ঘোলা জলই খাবে। অপর কেউ কেউ শিক্ষার জাতীয়করণ চাইছেন। অর্থাৎ গালভরা বুলির আড়ালে বড় বেশী হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের ও কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার কোন্ নেতৃত্বের কথা হচ্ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রচলিত সরকারের শুধু পাশাপাশিই নয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি সমান্তরাল নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দ্বারা। এর মূল ছিল জনসাধারণের মধ্যে হাটে, মাঠে, গঞ্জে, কলকারখানায়। সুতরাং তা ছিল সার্থক গণনেতৃত্ব যার ভিত্তি ছিল জনশক্তি। স্বাধীনতার পর এই নেতৃত্বের চারিত্রধর্মে পরিবর্তন ঘটল। এর ভিত্তি হল সরকার—আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র বা আমলারা। পাঁচ বছরে একবার জনসাধারণের ম্যাণ্ডেট নিতে যাওয়া হয় বটে কিন্তু প্রশাসনযন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে ভোট যোগাড় করার সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের নেতৃত্ব জনসাধারণের মধ্যে থেকে আগুয়ান স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও ভূমিকম্পের মত সাময়িক দুর্বিপাক থেকে শুরু করে জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান অথবা পথ চলার জন্য রাস্তাঘাট করার যেসব কাজ করতেন তা বন্ধ হয়ে গেল। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের নেতৃত্ব জনশক্তি সংগঠন করে গঠনমূলক কাজ করার যে সিঁড়ি বেয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করতলগত করলেন, স্বাধীনতার পর সর্বাগ্রে তাকেই পদানত করে দূরে সরিয়ে দিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের স্লোগান হল—সরকার সব কিছু করে দেবে। সাধারণ মানুষ কেবল মুখ বুঁজে ট্যাক্স দিয়ে যাবে। সরকার সব করে দেবেন অর্থাৎ স্থায়ী আমলাদের দিয়ে করিয়ে দেবেন। কংগ্রেস, সমাজবাদী, কমিউনিস্ট, জনসঙ্ঘ ইত্যাদি সব দলের কর্মপদ্ধতিই এই। এমনকি নকশালপন্থী নামে পরিচিত যাঁরা বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার তীব্রতম সমালোচক, দেশনির্মাণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে

তাঁদেরও এই মত। তাঁদের মতভেদ শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পদ্ধতি সম্বন্ধে—ব্যালটের সহায়তায় নয়, বুলেটের সাহায্যে প্রশাসনযন্ত্রকে করায়ত্ত করতে হবে।

দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের বুদ্ধি, কর্মশক্তি, উদ্যম ও উৎসাহ বাদে কেবল কিছু সংখ্যক আমলাকে দিয়ে এ রাজ্যের অন্ন-সমস্যারূপী জীবনমরণ প্রশ্নের সমাধান করা যাবে এ এক দিবাস্বপ্ন মাত্র। হয়ত যুক্তির দিক দিয়ে বর্তমান নেতৃত্বের কেউ কেউ একথা বোঝেন। কিন্তু কার্যত তাঁরা কেউই স্বাধীনতার পরবর্তী এই ছাব্বিশ বছরের ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয় না। কেবল আমলাতন্ত্রের দ্বারা সমস্যার সমাধান অসম্ভব, চোখের সামনে এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস দল মুখে আমলাদের নিন্দাবাদ করেই কর্তব্য শেষ করছেন। আমলাদের পরিবর্তে জনশক্তির উদ্বোধন বা গণ-নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোন প্রত্যক্ষ কর্মসূচি নেই। অথচ যুক্তফ্রণ্টের আমলের সেই অন্ধকার দিনগুলির বদলে এইরকম কিছু একটা হবে এই আশাতেই সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে যুবশক্তি বন্যাস্রোতের মত কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু কোন মতে ভোটে জেতা এবং তারপর গদির লড়াই-এর হত-ভাগ্য হাতিয়ার হওয়া ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ এই যুবশক্তির কোন সদ্ব্যবহার হল না। বামপন্থী দলগুলি যেমন ১৯৬৭ সালে তাঁদের প্রতি প্রবল জনসমর্থনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি, তারপর এই এতগুলি বছরের শিক্ষাও তাঁরা গ্রহণ করেননি। আজও তাঁদের কর্মসূচি সেই আদ্যিকালের শোভাযাত্রা 'চলবে না চলবে না' বলে বদ্ধমুষ্টি আস্ফালন, আর বড় বেশী হলে নিষ্ফলা হরতাল বা বন্‌ধ্। এইসব কর্মসূচি যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যার সমাধানে আদৌ সহায়ক নয়—একথা তাঁদের কে বোঝাবে।

পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এখন কিছু হোম ট্রুথ বা স্পষ্ট কথা শোনানো প্রয়োজন, তা খুব শ্রুতিসুখকর না হলেও। উন্নয়নের কোন শর্টকাট নেই। ক্ষেতখামার কলকারখানায় মাথাপিছু উৎপাদন বাড়াতে হবে, ভবিষ্যতে লগ্নী করে মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় আরও বাড়াবার জন্য বর্তমানের রোজগারের একাংশ সঞ্চয় করতে হবে। লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগাতে হবে। আর এ কাজ শুধু আমলাদের দিয়ে হবে না। রাজনৈতিক দলগুলির মুষ্টিমেয় দাদাদেরও সাধ্য নেই একা এ কাজ করেন। এর জন্য জনশক্তির সংগঠন ও গণনেতৃত্ব চাই। সমস্যার ব্যাপকতা যেমন প্রবল, তাতে কোন একক দল, বা ফ্রণ্টের—তা সে ডান অথবা বাম যে ধরণেরই হোক না কেন—ক্ষমতা নেই

তার মোকাবিলা করে। জনশক্তির উদ্বোধনের জন্য হয়ত এ রাজ্যে জাতীয় সরকার গঠন করা দরকার, যে সরকার শুধু সব রাজনৈতিক দল নয় এমনকি তার বাইরেও যোগ্য ব্যক্তি থাকলে তাঁর কর্মপ্রতিভাকে পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে লাগাবে। নচেৎ রাজনীতির প্রচলিত ধারার কারণে কোন বিশেষ দল ভালো কথা বললেও পেশাদার বিরোধীরা তার বিরোধিতা করবেন। রাজনৈতিক উচ্চাশাবর্জিত নেতৃত্ব কর্ণধার না হলে সাহস করে স্পষ্ট কথা বলা যাবে না এবং উচিত পথে চলাও সম্ভবপর হবে না। গত ছাব্বিশ বছরের ক্ষমতার রাজনীতি এবং বিশেষ করে ১৯৬৭ সাল থেকে এই ছয়-সাত বছরের ইতিহাস বাঙালীর মনে যে সন্দেহবাদ ও বিশ্বাসের সঙ্কট সৃষ্টি করেছে তাতে সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধারলাভের আর আশা নেই।

আর একটি কথা। সাময়িকভাবে সরকারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাকেই মোক্ষজ্ঞান করলে চলবে না। সরকারের ভিত্তি হল রাজনৈতিক দল ও আমলা গোষ্ঠী। এই দুইয়ের সীমাবদ্ধতার কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কাজের জন্য চাই স্থানীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গে শীঘ্র দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র, নেতাজী বা শ্যামাপ্রসাদের মত নেতার আবির্ভাব হবে না, যাঁরা দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীকে নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাদের কর্মশক্তিকে সংহত করে গড়ার কাজে লাগাতে পারেন। ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কলকাতা বা অপর কোন বড় শহর থেকে আসবে আশা করাও ভুল। একে বিকেন্দ্রিত হতে হবে। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ব্যাধি নিরসনের জন্য গড়ার কাজের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবেন, আর কে কি করে বা না করে তার অপেক্ষায় না থেকে, নিজেদের সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী ছোটবড় গঠনকর্মে হাত দিতে হবে তাঁদেরই।

ভাঙা নয়, পশ্চিমবঙ্গকে এখন গড়ার কাজে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে হবে। এখন দল-মতের কথা ভুলে সম্মিলিতভাবে কাজ করার দিন যাতে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলা বাঁচে। এ রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের সুপ্ত কর্মপ্রতিভা ও নেতৃত্ব-শক্তিকে জাগরিত করে জনশক্তির অধিষ্ঠান করবার সময় এখন। নেতিবাদ নয়, পজিটিভ চিন্তা, কথা ও কাজের লগ্ন এখন। ভাঙার জবাব গড়া—গড়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাঙালীর সবচেয়ে বড় সমস্যা

বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙালীর সব চেয়ে বড় সমস্যা কি বল তো?

ভাববার জন্য বিন্দুমাত্র সময় না নিয়েই আমি বললাম, কেন—বেকারত্ব, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সহানুভূতির অভাব, কেন্দ্রের অবিচার…।

আরও অনেক কিছু বলার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু বন্ধুর দিকে চোখ পড়াতে থেমে যেতে হল। দেখলাম বন্ধু ঈষৎ মাথা নাড়ছেন অসহমতির ভঙ্গীতে এবং তাঁর চোখে মুখে প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাসের হাসি।

আক্রমণোদ্যত ভঙ্গীতে আমি তাই প্রশ্ন করলাম, কেন, বাঙলা ও বাঙালী কি এসব ব্যাধির শিকার নয়?

বন্ধু প্রসন্ন ভঙ্গীতে উত্তর দিলেন, এগুলি বড় বেশী হলে ব্যাধির উপসর্গ বা বাহ্য লক্ষণ। মূল ব্যাধি এর কোনটিই নয়।

কি তবে?

বন্ধু বললেন, আমাকে তো প্রাচীনপন্থী বল। তাই বলছি আমার মত প্রাচীনপন্থীর কথা মনে ধরবে কিনা জানি না। তবে আমার মতে বাঙালীর সব চেয়ে বড় সমস্যা হল ভক্তির অভাব।

কী আবোল-তাবোল বকছ তুমি, ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললাম। বাঙালী জ্বলছে তার জীবন-মরণ সমস্যায়, আর তুমি কিনা এখন তাকে "ভজ গোবিন্দম্" মার্কা ভক্তির কথা শোনাতে এলে!

দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধু বললেন, তুমি যাকে "ভজ গোবিন্দম্" মার্কা ভক্তি নাম দিয়েছ, আদৌ আমি তার কথা বলছি না।

অধীরভাবে আমি বললাম, রাখ তোমার হেঁয়ালী, সহজ কথায় বলত ভক্তি বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?

মৃদু হেসে বন্ধু বললেন, বলছি ভাই—ধৈর্য ধর। ভক্তির অর্থ আমার কাছে শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও শ্রমনিষ্ঠার সমন্বয়।

বিহ্বলভাবে আমি বললাম, এক হেঁয়ালীর বদলে তিন হেঁয়ালী এবার।

কোথায় বাঙালীর হরেক রকম জ্বলন্ত সমস্যা আর কোথায় তোমার যতরাজ্যের নৈর্ব্যক্তিক নিদান—শ্রদ্ধা আর কিসের কিসের অভাব।

আবেগমন্দ্র স্বরে বন্ধু বললেন, হ্যাঁ, এই তিনটির এবং বিশেষ করে শ্রদ্ধার অভাবের জন্যই বাঙালী আজকে শতবিধ সমস্যার আঘাতে জর্জরিত। শ্রদ্ধার অভাব আমাদের সর্বপ্রথম সমস্যা।

শ্রদ্ধার অভাব! আমার কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধু বললেন, হ্যাঁ, শ্রদ্ধার অভাব। তবে দ্বিবিধ অর্থে আমি শ্রদ্ধা শব্দটির প্রয়োগ করছি। তারপর একটু থেমে যোগ করলেন, এর প্রচলিত অর্থ নিশ্চয় জান—শ্রদ্ধা অর্থাৎ সম্মান।

কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তের মত আমি প্রশ্ন করলাম, কার আবার অসম্মান করলাম আমরা? তুমি কি অতীতে এক শ্রেণীর বাঙালী, প্রতিবেশী প্রদেশের অধিবাসীদের প্রতি যেসব অসম্মানকর উক্তি করতেন তার প্রতি ইঙ্গিত করছ? কিন্তু সেসব তো বিদেশী শাসকদের অনুবর্তী মুষ্টিমেয়—মাত্র মুষ্টিমেয় বাঙালীর কথা, যাঁরা নিজেদের ডেপুটি ইংরেজ ভেবে স্বদেশবাসীর প্রতি ঐজাতীয় অশ্রদ্ধাজনক উক্তি করতেন ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুদে দোসর হয়ে। কিন্তু ঐ জনকতক মতিচ্ছন্ন বাঙালীর অন্যায়ের মাশুল কি সমগ্র বাঙলাদেশ ও বাঙালী কম দিয়েছে? তবে কেন এখনও সেই পুরাতন কথা তুলে আজকের বাঙালীদের খোঁটা দিচ্ছ? বিশেষ করে সেদিনকার ঐ মিথ্যা অহমিকা আজকের এই বিভক্ত বাঙলার হৃতশ্রী বাঙালীর মধ্যে নেই বললেই চলে। আর কত প্রায়শ্চিত্ত করাতে চাও বাঙালীদের দিয়ে বলতে পার সেকথা? আবেগভরা কণ্ঠে আমি অনুযোগ করলাম।

সান্ত্বনার সুরে বন্ধু বললেন, এবিষয়ে আমিও তোমার সঙ্গে সহমত ভাই—ঊনবিংশ কি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কিছু বাঙালীর অপরাধে অথবা তারই যৎসামান্য অবশিষ্ট অসুস্থ মানসিকতায় পীড়িত খুচরো দুই-পাঁচ জন বাঙালীকে দেখে আজকের সমস্ত বাঙালী জাতটাকে দোষ দেওয়া অযৌক্তিক। আমি কিন্তু ঐ অশ্রদ্ধার কথা বলছি না, যদিও মনে হয় আজকের বাঙালী যে অশ্রদ্ধার ব্যাধিতে পীড়িত সম্ভবত তার মূলে সেকালের ছোট-সাহেব বাঙালীর মানসিকতার প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকালাম।

বন্ধু বলতে লাগলেন, আজকের বাঙলার ভিতর যে অশ্রদ্ধার ব্যাধি, একটু

চোখকান মেলে তাকালেই তা তোমার নজরে পড়বে। ভাগচাষীর জমির মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, কলকারখানার শ্রমিকের শুধু মালিক নয় ম্যানেজার, একজিকিউটিভ বা ব্যবস্থাপকদের উপর শ্রদ্ধা নেই। এ অশ্রদ্ধা reciprocal অর্থাৎ মালিকদেরও তার শ্রমিক বা কর্মচারীদের উপর শ্রদ্ধা নেই।

অধীরভাবে বাধা দিয়ে শ্লেষের সঙ্গে আমি বললাম, বুঝেছি তোমার ঐ বস্তাপচা শ্রদ্ধাতত্ত্ব। তুমি কি চাও রুটি-রুজির লড়াই তীব্র হবার পূর্বে শ্রমিক-সমাজ যেমন দাস্যসুখে শোষক মালিক-শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত থাকত, আবার তোমার সেই প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বর্ণযুগ ফিরে আসুক? বিংশ শতাব্দীর এই সপ্তম দশকেও তুমি যে এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জয়গান গাইছ এ দেখে দুঃখ হচ্ছে। একটু থেমে তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে আমি বললাম, তোমার কি চোখে পড়ছে না যে আজকের বাঙলাদেশে শ্রমিকসমাজ জাগ্রত এবং শ্রেণীসংগ্রাম তাই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে এদেশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে?

বিন্দুমাত্র আহত অথবা উত্তেজিত না হয়ে বন্ধু দেখি মিটিমিটি হাসছেন। আমি দম নেবার জন্য থামতেই বন্ধু ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, অশ্রদ্ধার সম্পর্ক যদি কেবল মালিক-মজুরের মধ্যে হত তা হলে নাহয় তোমার শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব মেনে নিতাম, যদিও তুমি ভালোভাবেই জান যে ঐ তত্ত্বের সার্বভৌমতায় আমার বিশ্বাস নেই এবং এও মানি না যে এর দ্বারা মানবসমাজের চূড়ান্ত কোন মঙ্গল হবে।

কেন, কোথায় শ্রেণীসংগ্রামে অবিশ্বাস করার মত কি দেখলে? আমি চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলাম।

বন্ধু তেমনি অনুত্তেজিত ভঙ্গীতে বললেন, বাঙলাদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ভিতর শিক্ষক-অধ্যাপকদের সম্বন্ধে যে অশ্রদ্ধার ভাব তাকে তোমার শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করবে কিভাবে? শিক্ষকরা কি বুর্জোয়া 'হ্যাভদের' দলে পড়েন যাঁরা ছাত্রদের শোষণ করে মার্কসীয় পরিভাষা অনুযায়ী কোন 'সারপ্লাস ভ্যালু' হাতিয়ে নিচ্ছেন?

না—না, ঠিক তা নয়, আমি একটু কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বললাম। আসলে কি জান—অনেকে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটাই বুর্জোয়া ব্যাপার মনে করেন। তাই সম্ভবত সেই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার ধারক শিক্ষক-অধ্যাপকের সঙ্গে বিপ্লবী ছাত্রদের এটা ঠিক শ্রেণীসংগ্রাম না হলেও…

চমৎকার। চমৎকার তোমার ব্যাখ্যা! বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বন্ধু বললেন। তারপর স্বর পাল্টে বললেন, থাকগে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বুর্জোয়া কিনা এবং হলেও তাকে পাল্টে প্রলিটারিয়েটদের স্থানে কোন্ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করব—সেকথার আলোচনা এখন না হয় মুলতুবী রাখলাম। সর্বহারাদের জন্য প্রাণপাত করছি বলে যেসব রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একই ফ্রন্টের আওতাভুক্ত হয়েও পরস্পরের মাথায় লাঠি মারছেন তাঁদের কথাও না-হয় বাদ দিলাম। কিন্তু ছাত্রতে ছাত্রতে যে অশ্রদ্ধার ভাব—এক রাজনৈতিক দলের ছাত্র-সংগঠন অন্য দলের ছাত্রদের যে চরিত্র-হনন করছে, একই কারখানার শ্রমিক যাদের আর্থিক স্বার্থ একই, তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক-সংগঠনের সদস্য হয়ে 'শ্রেণী-শত্রু' মালিকদের নয়, পরস্পরের বুকে ছুরি মারছে এটা কোন্ দেশী 'শ্রেণীসংগ্রাম'? একটু থেমে বন্ধু বললেন, আজকের বাঙলাদেশে বাসযাত্রী বা রেলযাত্রী—যাঁরা আবার অধিকাংশই শ্রমিক-কর্মচারী বা ছাত্র অর্থাৎ প্রলিটারিয়েট শ্রেণীর, তাঁদের সঙ্গে বাস বা রেলের শ্রমিক-কর্মচারীর যে মারামারি হয় অথবা রোগী কিংবা তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্সদের যে সংঘর্ষের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তাতে বা কোন্ পক্ষ সর্বহারা আর কোন্ পক্ষই বা শোষণকারী বুর্জোয়া? আর এইসব তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রামের ফলে কি ধরণের সমাজবাদী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয় বলতে পার?

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, স্বীকার করছি ভাই এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাত তোমার ভাষায় যা শ্রদ্ধার অভাবের নিদর্শন—শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে এর কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা আমার ঠিক জানা নেই। তবে কেউ কেউ বলেন এসব পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য নিদর্শন এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এসব লোপ পাবে।

বন্ধু এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসির মধ্যেই বললেন, আমার এক বন্ধু ডাক্তার। সেদিন তিনি বলছিলেন যে, যে-রোগ তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা ধরতে পারেন না এবং তুমি জান যেসব ব্যাধির কারণ বোঝার মত জ্ঞান চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনও আবিষ্কার হয়নি—তার নাম তাঁরা দিয়ে দেন অ্যালার্জি। রোগের একটা নাম না জানলে রোগী খুশী হয় না এবং সম্ভবত ডাক্তারেরও অহমিকা ক্ষুন্ন হয়। তাই এই অ্যালার্জি প্রয়োজনে সবার মুখরক্ষা করে। কণ্ঠস্বর পাল্টে বন্ধু বললেন, কিছু মনে কোরো না ভাই, সমাজবাদী বিপ্লব

মূর্ত হলে সব ঠিক হয়ে যাবে, এও তেমনি এক মেকি সবজান্তা ডায়গনোসিস্। স্বাধীনতার আন্দোলনের সময় আমরা এক দফা ভুল করেছিলাম—দেশের সমস্যাগুলির মূলে না গিয়ে বলেছি ইংরেজ চলে গেলেই দেশের লোক দুধ-ঘিয়ের সমুদ্রে সাঁতার কাটবে, হিন্দু-মুসলমান গলা জড়াজড়ি করে ঘুরে বেড়াবে। এখন আর এক দফা সমাজবাদী বিপ্লবের ধুয়ো তুলে বাস্তব সমস্যাগুলি এড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

কি বলতে চাও তুমি, আমি এবার বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি করে বলতে চাই যে অশ্রদ্ধা করে কোন মানুষ বা জাতি বেঁচে থাকতে পারে না বা বড় হতে পারে না। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞানলাভ করে এবং জ্ঞানই উন্নতির সোপান। এমনকি চোর-ডাকাতদের দল বা সমাজও টিকে থাকতে পারে না পারস্পরিক শ্রদ্ধা না থাকলে। সুতরাং সভ্য ভদ্র সমাজে শ্রদ্ধার স্থান কী গুরুত্বপূর্ণ সহজেই তা অনুমান করতে পার।

কিন্তু তোমার পরামর্শ বড় বেশী অ্যাবস্ট্রাক্ট বা অমূর্ত হয়ে যাচ্ছে না কি? বাস্তবের দৈনন্দিন জীবনে এই শ্রদ্ধার অনুশীলনের উপায় কি বলবে তো?

বন্ধু জবাব দিলেন, এর সেরা পন্থা হল অপর পক্ষের সততায় অবিশ্বাস না করা। তোমার থেকে কোন বিষয়ে কেউ ভিন্নমত পোষণ করলে অমনি তার পিছনে কোন বুর্জোয়া পুঁজিবাদী অথবা অপর কোন স্বার্থ আছে ধরে না নিয়ে তাকে honest difference of opinion বা একটা সুস্থ মতপার্থক্য মনে করে তার বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা করা। আর একটু সহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া, কারণ শেষ সত্য আমি জানি না—কেউ কোন দিনও জানতে পারে না।

আমি বললাম, তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সর্বদাই আমার ধ্যান-ধারণা ভুল এবং অপর পক্ষের বক্তব্যই সত্য?

বন্ধু বললেন, তা কেন? আজকে এই মুহূর্তে যুক্তিতর্ক ও উপলব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে আমার যা উচিত মনে হচ্ছে আমি তাই বলব ও তদনুযায়ী চলব। তবে অন্যেরও অনুরূপভাবে বলার ও চলার অধিকার আছে, আমাকে তা মেনে নিতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যদি দেখা যায় যে অপরের বক্তব্য আমার থেকে ভিন্ন তবে নম্র ও দৃঢ়ভাবে আমার যুক্তি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করব এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনের দরজায়ও ছিটকিনি দিয়ে রাখব না—তার যুক্তিতে কোন সত্য থাকলে তাও গ্রহণ করব। এইভাবে বিজ্ঞানীরা যাকে trial and

error অথবা প্রায়োগিক পদ্ধতি বলেন কিংবা দার্শনিকদের মতে যা dialectic বা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া তার সহায়তায় আমরা এক সত্য থেকে অপর সত্যে উত্তরণ করব।

মাথা নেড়ে আমি বললাম, হ্যাঁ—শ্রদ্ধার পাঠ নিতে হলে সহিষ্ণুতার এবং হয়ত বা বিশ্বাসেরও এই পদ্ধতি ছাড়া গত্যন্তর নেই মানছি।

বন্ধু বললেন, ঠিক ধরেছ তুমি—ব্যাপারটা বিশ্বাসের এলাকায়ই পড়ে। তবে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসার পূর্বে আর একটি কথা বলে নিই। একটু আগেই তুমি অভিযোগ করছিলে যে মালিক-মজুরের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে বা রুটি-রুজির লড়াই শুরু হলে শোষিত পক্ষকে আমি দাস্যসুখে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেব। আশা করি বুঝতে পেরেছ যে আদৌ আমি সেই কথা বলিনি। স্বার্থ-বিরোধ সমাজে অবশ্যই দেখা দিতে পারে এবং যে পক্ষ নিজেদের শোষিত ও বঞ্চিত মনে করছেন তাঁরা অবশ্যই শোষক ও বঞ্চনাকারীর বিরুদ্ধে লড়বেন। কিন্তু সে লড়াই অশ্রদ্ধাযুক্ত হতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

শ্রদ্ধাযুক্ত লড়াই! আমার কণ্ঠে বিস্ময়। এ তো এক মহাভারতের যুগেই হয়েছে বলে শোনা গেছে, ক্ষীণকণ্ঠে আমি বললাম।

দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধু বললেন, শুধু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেই নয়—সব যুগে এবং প্রায় সব দেশেই এই সৌম্য যুদ্ধের নিদর্শন রয়েছে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচার না করেও চরিত্রহননে প্রবৃত্ত না হয়েও যে জীবন-মরণ লড়াই করা যায় একালের ভারতে মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবন তার নিদর্শন। আর গান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৌম্য যুদ্ধের প্রক্রিয়ার অবসান ঘটেনি। আমাদের দেশে তো বটেই ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকাতে তার অনুশীলন চলছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বন্ধুর বক্তব্য পরিপাক করার চেষ্টা করলাম আমি। তারপর বললাম, শ্রদ্ধার আর একটি কি যেন অর্থের কথা বলছিলে তুমি!

বন্ধু বললেন, বাঙলা ভাষাতে বহুলপ্রচলিত না হলেও শ্রদ্ধার অপর একটি অর্থ হল বিশ্বাস, প্রত্যয় ও নিষ্ঠা। ব্যক্তির মত জাতির জীবনেও এর স্থান অপরিহার্য।

বাঙালীর জীবনে কোথায় এর অভাব দেখলে তুমি, আমি প্রশ্ন করলাম।

শ্রদ্ধার অভাব প্রসঙ্গে বলার সময় তা বলেছি। পারস্পরিক বিশ্বাস থাকলে শ্রদ্ধার অভাব হয় না, বন্ধু বললেন। তারপর কণ্ঠস্বর পাল্টে বললেন, তোমায় একটা উল্টো প্রশ্ন করছি। বল তো কিসের থেকে বাঙালীর মনে অবিশ্বাস—

সব কিছুতে নাস্তি বা নেতির মনোভাব জেগেছে? বন্ধু আমার দিকে জলজলে দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন।

আমি কিছুক্ষণ ভাবলাম, তারপর কিছুটা ইতস্তত করে বললাম, দেখ আমার মনে হয় হয়ত বা নিজেদের উপরই বিশ্বাস হারিয়েছি আমরা। তাই হয়ত চতুর্দিকে এই অবিশ্বাস আর হতাশার প্রবল প্রবাহ।

সোৎসাহে বন্ধু বললেন, পাক্কা কথা বলেছ বন্ধু—খাঁটি সত্য। আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকেই এই অপরের প্রতি বিশ্বাসহীনতা বা অশ্রদ্ধার জন্ম। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে নেবার ক্ষমতা আমার কাছে—এই মনোবল থাকলে, কেন্দ্র অমুক দিল না অথবা প্রতিবেশী প্রদেশগুলি অবিচার করল—এসব বলে আমরা দিবারাত্র অনুযোগ করতাম না।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু বাঙলার বিশেষ সমস্যা—দেশবিভাগ ও ও উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে আর্থিক অবস্থার বিপর্যয় ইত্যাদির গুরুত্ব কি তুমি স্বীকার কর না? এবং তোমার কি মনে হয় যে কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রদেশ এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য বাঙলার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছে?

গাঢ় স্বরে বন্ধু বললেন, আমায় ভুল বুঝো না ভাই। বাঙলাদেশের সমস্যাগুলি ষোলো আনা খাঁটি এবং কেন্দ্র ও প্রতিবেশী প্রদেশগুলি যতটা সহানুভূতি দেখানো উচিত ছিল তা দেখাননি। কিন্তু অপরের প্রতি অভিযোগ-অনুযোগ করে সমস্ত দিন কাটিয়ে দিলেই কি আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে? আত্মবিশ্বাস সহকারে এ সমস্যাগুলির সমাধানে লেগে পড়তে হবে না—যা হাতিয়ার বা রসদ আছে তাই নিয়ে? কোন ভালো সৈনিক কি যুদ্ধের সময়ে এই বলে লড়াই করা থেকে বিরত থাকে যে আরও বেশী হাতিয়ার তার নেই!

আমি বললাম, তোমার যুক্তিতে জোর আছে স্বীকার করছি।

বন্ধু যেন আমার কথা শুনতেই পাননি এইভাবে বলে চললেন, দেখ ছিন্নমূলেরা আমাদের মাথাব্যথা আর ইজরাইলের তাঁরা সম্পদ। দূরের কথা বাদ দিই। আমাদের স্বদেশ ভারতে পঞ্জাবীদের আমাদেরই মত দুরবস্থা হয়েছিল—সিন্ধীদের তো তার থেকেও বেশী। কিন্তু তাঁরা উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান অনেক দিন করে ফেলেছেন। ফেলে আসা সম্পত্তির জন্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে টাকা পেয়েছেন তাকেই নিশ্চয় তুমি তাঁদের সমস্যার সমাধানের একমাত্র কারণ বলবে না। কারণ টাকার অঙ্কে যদি হিসাব কর, পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের

জন্যও ভারত সরকার কম টাকা খরচ করেননি—গত বছরের শেষ পর্যন্ত এই অঙ্ক ছিল ৩২২ কোটি টাকা। জার্মানী জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আমাদের থেকে অনেক বেশী বিধ্বস্ত হয়েছিল। অথচ আমরা এখনও আঘাতের বেদনায় জর্জর আর ঐসব দেশ কবে আঘাত ভুলে পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলির অন্যতম। এ কেবল টাকায় হয় না ভাই।

আমি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললাম, ঠিক। চাই এর সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও কঠিন পরিশ্রম। বাঙালীও এর পরিচয় দিতে পারত, কিন্তু সম্ভবত আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি আর খবরের কাগজ···

মাঝপথে বাধা দিয়ে অধীরভাবে বন্ধু বললেন, রেহাই দাও ভাই এইসব রাজনৈতিক দল আর খবরের কাগজের হাত থেকে, দেশের দুর্দশাই যাদের ফলাও ব্যবসার বড় পুঁজি। তারপর কণ্ঠস্বর পাল্টে অনুযোগের ভঙ্গীতে তিনি বললেন, কিন্তু জেনেশুনে বাঙালী কেন রাজনৈতিক দল ও খবরের কাগজের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে নিজের সর্বনাশ করবে তা বলতে পার? আমার তো মনে হয় এ দুইটি বাঙালীর জীবনে প্রায় একটা অবসেসনের রূপ নিচ্ছে। রাজনীতিকেই পরমব্রহ্ম ও খবরের কাগজের বক্তব্যকে বেদবাক্য বলে মনে করা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। রাজনীতি সমাজের বহুবিধ কৃত্যের একটির বেশী নয়—তাই যে-কোন প্রগতিশীল সমাজে এর স্থান অনন্য নয়, বহুর মধ্যে একটিমাত্র। মানুষ ও সমাজের জীবনে লোককল্যাণ, ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির অনুশীলন, শরীরচর্চা এমনকি নিছক কৌতুক ও রঙ্গরসেরও যথোচিত স্থান আছে। সব ভুলে কেবল রাজনীতি নিয়ে হৈ চৈ করা একাঙ্গী এবং সেইজন্য তা অসুস্থ বিকাশের লক্ষণ।

আমি বললাম, বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু এর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ কি বলতে পার?

বন্ধু বললেন, বলছি সেকথা। তবে তার আগে আর একটি কথা বলে নিই। কেন্দ্র আমাদের প্রতি উদাসীন—এই যে কথাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিছু দিন যাবৎ আমাদের দেশে চালু করার খুব চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যার ফলে বাঙালীর আত্মবিশ্বাসকে কুণ্ঠিত রেখে তার আত্মশক্তির উদ্বোধন-পর্বকে আরও বিলম্বিত করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আর একটি কথা বলব। অন্যান্য প্রদেশগুলির কথা যদি ছেড়েও দিই—১৯৬৭ সন থেকেই তামিলনাড়ু, কেরল ও আমাদের প্রতিবেশী ওড়িষ্যায়, কেন্দ্রে যে রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব তার প্রতিদ্বন্দ্বী

দলগুলির সরকার। আর কংগ্রেস ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর কর্ণাটক ও গুজরাতের ঐ একই অবস্থা। পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে থেকে থেকে সরকার বদল হয়েছে বলে সেইসব প্রদেশের উদাহরণ না হয় নাই দিলাম। কিন্তু হিসাব নিয়ে দেখা যাবে তামিলনাড়ু, কেরল, ওড়িষ্যা এবং গুজরাত ও কর্ণাটকে গত তিন বছরের উন্নয়নের হার বাঙলার থেকে বেশী হবে। আর উন্নয়নের আধুনিক মান—সেচ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, কলকারখানার প্রসার দ্বারা শহরের বেকার সমস্যার সমাধান এবং কুটির ও মাঝারি শিল্পের দ্বারা গ্রামের কর্মসংস্থান প্রয়াসের প্রগতি ইত্যাদির দিক থেকে এঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুধু এগিয়েই নেই, এইসব ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগতির বর্তমান হারও আমাদের তুলনায় বেশী। সুতরাং একথা নিশ্চয় মানবে যে কেবল কেন্দ্র বিরূপ বলে শোরগোল করা বাঙলাদেশের সমস্যার সমাধানের পথ নয়। পথ হল যে-কোন এক বা একাধিক সমস্যা নিয়ে তার সমাধানের জন্য কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়া।

বন্ধুর কথাগুলি আমার কানে অনুরণন সৃষ্টি করছিল। আমি তাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, তোমার কথা স্বীকার করা ছাড়া আমার কিছু বলার নেই ভাই। তারপর বন্ধুকে আবার মনে করিয়ে দিলাম, কিন্তু—কিন্তু এর থেকে পরিত্রাণের পথ কি বলতে পার ?

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বন্ধু বললেন, বিশ্বাস বা আত্মবিশ্বাস যা-ই জাগানোর কথা বল না কেন, এর উপায় হল বিশ্বাস—দৃঢ় বিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস জাগানো যায় না। অবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ কারণ না ঘটা পর্যন্ত অপর সকলের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছায় বিশ্বাস করতে হবে এবং বাঙালীও শুধু বাঁচবে নয়, সুস্থ শরীরে সানন্দ চিত্তে বাঁচবে—এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। বাঙলাদেশে আজকে এই যে ভাঙনের জোয়ার লেগেছে তার একমাত্র জবাব হল গড়া—দেশ ও জাতিকে গড়া। এছাড়া নান্য পন্থা।

কিন্তু কোন্ পন্থায় কাজ করবে সেইটেই তো প্রশ্ন। বিব্রতভাবে আমি বললাম।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে বন্ধু জবাব দিলেন, পন্থাটা আদৌ বড় প্রশ্ন নয়। আজকের পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা হল যাঁর উপর পশ্চিমবঙ্গকে গড়ার যে কাজের দায়িত্বই পড়ুক—তা তিনি এ রাজ্যের খাদ্য জোগান দেবার কৃষক, অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের শ্রমিক অথবা বাঙালীর ভবিষ্যৎ গড়ার কারিগর শিক্ষক কিংবা

বাঙলার ভবিষ্যৎ—ছাত্র, যাই হোন না কেন—প্রবল নিষ্ঠা ও প্রভূত পরিশ্রমে তাঁকে নিজের নিজের কাজ করতে হবে। কাজ করতে হবে এই বিশ্বাস ও উদ্দীপনা নিয়ে যে আমার উপর বাঙলাকে গড়ার এই দায়িত্ব পড়েছে এবং আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই দায়িত্ব পালন করব।

কিন্তু···

আমাকে মাঝপথে বাধা দিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বন্ধু বললেন, তুমি হয়ত সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের কথা বলবে। তা তোমার সে আন্দোলন চলুক—সৌম্যভাবে চললে আমিও তোমার সে আন্দোলনের শরিক হব। কিন্তু তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ সৃষ্টির কাজে বিন্দুমাত্র বাধা পড়ে না যেন। কারণ আরও অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে কি বণ্টন করবে? ভারতের সমগ্র জাতীয় আয় সমানভাবে বণ্টন করলে টাকার অঙ্কে আজ বছরে চার-পাঁচশ টাকার বেশী কারও ভাগে পড়বে না। কেবল পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান নিলে হয়ত আরও কয়েক টাকা বাড়বে। তা দিয়ে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে কোন্ সমাজবাদী সাম্যবাদী রাজী হবেন? আর খেয়াল রেখো এটা গড় আয়—দেশের অধিকাংশ লোকের বাৎসরিক আয় এর থেকে অনেক কম। সুতরাং নিছক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কোমর বেঁধে পরিশ্রম করা ছাড়া অপর কোন পথ নেই। রুশ-চীন-ভিয়েতনামের সব সাম্যবাদী অথবা আমেরিকা-জাপান-পশ্চিমজার্মানীর মত পুঁজিবাদী দেশ—সবার উন্নতির গোপন রহস্যই হল এই কঠিন মেহনত। এর কথা খেয়াল না রেখে কেবল উৎপাদন-ব্যবস্থার লেবেল পালটালে খুব বেশী দূর এগনো যায় না।

একটু থেমে বন্ধু যোগ করলেন, তোমাদের ভাষায় আমি তো প্রাচীনপন্থী। তাই জনৈক প্রাচীন কিন্তু চিরকালের মনীষীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলি—চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না।

আমি এতক্ষণ তন্ময়ভাবে বন্ধুর কথা শুনছিলাম। বন্ধু থামতে অর্ধ স্বগতোক্তির মত বললাম, তাহলে সমাধান হল অপরকে শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস আর শ্রমনিষ্ঠা···।

সোৎসাহে বন্ধু বললেন, হ্যাঁ, এরই মিলিত নাম দিয়েছি আমি ভক্তি। বাঙালীর উন্নতির পথে বাধক বাইরের কোন মেকি শত্রুর প্রতি ইঙ্গিত করলে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে আস্ফালন করে গগনভেদী স্লোগান দেওয়া অনেক অনুগামী হয়ত আমি পেতাম। তবে তা দিয়ে আমার বা আমার দলের

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হলেও বাঙলা ও বাঙালী যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকত বলে আমি সস্তা জনপ্রিয়তার কথা খেয়াল না করে আমাদের ভিতরকার এই মূল সমস্যা—ভক্তির অভাবের কথা বলছি।

ভক্তি! জোর দিয়ে আমি কথাটি উচ্চারণ করি।

হ্যাঁ, ভক্তি। বন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বন্ধুর কণ্ঠে ঈষৎ বিরতি। চেয়ে দেখি বন্ধু তাঁর বইয়ের তাক থেকে একটি বাঁধানো বই বার করেছেন। কয়েক মুহূর্ত লাগল তাঁর পাতা ওলটাতে। তারপর এক জায়গায় পৌঁছে তাঁর আঙুল নিরস্ত হল। আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন এবার বন্ধু। আবেগ-উদ্বেল দৃষ্টি সন্ধানী আলোর মত আমার মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ রেখে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে বন্ধু বললেন, বাঙলাদেশের ইতিহাসের এইরকম এক-সংক্রান্তি-কালে মাৎস্যন্যায় যখন আজকেরই মত প্রবল, বাঙলার উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী সাধকদের কাছে কোন্ পথ নির্দেশিত হয়েছিল এই বাঙলাদেশের এক মহান্ মনীষী সাহিত্যিকের আর্ষদৃষ্টির প্রসাদে, তাঁরই অনুপম ভাষায় তোমায় তা শোনাই। শোন:

'…সেই অন্তঃশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতা মধ্যে শব্দ হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, "আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তর বলিল, "পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি"।

বিহার বাঙলা আকাডেমি প্রকাশনা

১। কেদার রচনাবলী প্রথম ভাগ ৫০ টাকা
(কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
২। ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৬০ ”
৩। ঐ (যন্ত্রস্থ) তৃতীয় ভাগ ৬০ ”
৪। আশালতা সিংহ রচনাবলী ৬০ ”
৫। রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয় সংহতি ১০ ”
৬। বিহারে বাঙলা সাহিত্য—নন্দদুলাল রায় ৩০ ”
৭। বাঙলা ও বাঙালী—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ”
৮। বাঙলা ও সাঁওতালী—বাস্তা সরেন (যন্ত্রস্থ)
৯। রাঢ় এবং ঝাড়খণ্ড : সংস্কৃতি-সমন্বয়—কল্যাণী মণ্ডল (যন্ত্রস্থ)
১০। বিহারের কবিতা সংকলন-- (যন্ত্রস্থ)
১১। রবীন্দ্রপ্রবাহ— রামবহাল তেওয়ারী (যন্ত্রস্থ)